‘মানবস্থ কি ?’

‘মানবত্ব কি ?’

   *”

মূল্য— দেড় টাকা

প্রকাশক—
শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, এম-এ,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারায় মুদ্রিত

মুখবন্ধ

চল্‌তি প্রথা অনুযায়ী প্রকাশকের ভূমিকায় মুখবন্ধে আমার যা হয় কিছু লেখা দরকার তবে সাধারণতঃ যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুখবন্ধ লেখা হয় আমার লেখার তার সঙ্গে বিশেষ রকমে গরমিল হচ্ছে। সে লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক পাঠিকাদের কাছে ভুলভ্রান্তির জন্য ত্রুটী স্বীকার করে তাদের "মুখবন্ধ" করা, কিন্তু আমি চাই পাঠক পাঠিকাদের মুখ খুলতে, তা সে ভাল, মন্দ, শত্রু, মিত্র যে ভাবেই হোক না কেন। অবশ্য ভাষার ত্রুটী বিচ্যুতি যে যথেষ্টই (প্রায় ছত্রে ছত্রেই) থেকে গেল, শুধু সেই ত্রুটীর ফাঁকটুকুর জন্যই আমার এ আহ্বান নয়, এ আহ্বান মানুষে মানুষে পরস্পরের ভাব বিনিময়ের আহ্বান, যাতে অপামর সাধারণের মধ্যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারি, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের একটা শৃঙ্খলা আনা যেতে পারে এ তারই উপক্রমণিকা বল্লেও চলে।

শত্রু মিত্রের মধ্যেও একটা ভাব বিনিময়ের শৃঙ্খলা বজায় থাকে যার জন্য তা থেকেও একটা কিছু বিকাশের অবকাশ পায় কিন্তু, আজ আমাদের যা অবস্থা তাতে আমরা কেহই কাহাকেও চিনি না, কেহই কাহাকেও জানি না, কেহই কাহাকেও বুঝি না, ফলে তার প্রতিক্রিয়াও সেই রকম হচ্ছে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, আত্মঘাতী এবং পরস্পর পরস্পরে অবিশ্বাসী, বস্তুত! সকলেই প্রায় "আপন হারায়ে দিশেহারা।"

তাই তাঁদের মুখ খোলার জন্যই এই আহ্বান তাঁরা যেন আর চুপ করে না থাকেন।

১১ই আশ্বিন ১৩৪০ প্রকাশক

"মানবত্ব কি ?"

সূচনা

মা সন্ধ্যারাণী, প্রিয় শৈলেশ, প্রিয় পূর্ণেন্দু ও অপরাপর বন্ধুগণ, যে বিষয়টী নিয়ে আজ প্রায় পাঁচ সাত বৎসর কাল তোমরা অবিচ্ছেদে কতবার, কত রকমভাবে, কত শত উদাহরণ প্রয়োগাদি দ্বারা আলোচনা সমালোচনা ক'রেছ ;—সে গুলিকে আবার সব ঠিক্ ঠিক্ ভাবে পুনরাবৃত্তি করা যে সম্ভবপর ব্যাপার নয়, তা তোমরাও জান ও বোঝ ;—কারণ দেশ-কাল ও পাত্র হিসাবে, বিষয়গুলি তখন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌তো তোমাদের প্রাণের পরশ পেয়ে ; আর এখন এটা যে একটা নীরস প্রবন্ধ মাত্রে পরিণত হবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাই না আজ কত শত মহাগ্রন্থ অতুল সম্পদের বার্ত্তা বুকে নিয়েও মাত্র অতীতের সাক্ষ্য দিতে আর ভাব বিলাসীদের ভাবের পোষকতা কর্ত্তে, পুঁথীতে পরিণত হ'য়েছে।

এর নামকরণ নিয়ে যে একটু আধটু মতের পার্থক্য ছিল, অথচ সেটা মেনে না লওয়ার কারণ কি, তা আজ এখানে খুলে ব'লছি আর বলাও দরকার ব'লে মনে হ'চ্ছে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, এর পূর্ব্ব ইতিহাসের সঙ্গে, তোমাদের পরিচিত বিষয়টীর আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান থাকা

সত্ত্বেও মূলের অবমাননা করা যুক্তি যুক্ত নয় বোধে, নামের রদ বদল না ক'রে, পূর্ব্ব নামই বাহাল রাখতে হ'য়েছে।

এর আদি জন্মকোষ্ঠি অন্ধকারে থাকাই ভাল কারণ সে এক অন্ধকার ঘরের কথা * * * তার পরের কথা বলি।

এমনি আমরা কথায় কথায় কোন এক জন্তু বিশেষের নাম আরোপ ক'রে বলে থাকি যে সে বা তারা কথা কয়না ট্যাক্স দেওয়ার ভয়ে, তা হ'লে ধরে নিতে হবে, এ কথা বলার সাধারণ অর্থ হ'চ্ছে যে "কথা কইলেই তার ট্যাক্স দিতে হয়" এ ক্ষেত্রেও তাই ; তবে কখন, কি ভাবে আর কে যে আদায় করে নেয় তার একটা ধারাবাহিক কোন কিছু লেখা জোখা থাকে না বলেই হঠাৎ কিছু হ'ল বলে মনে হয়। এ তত্ত্বটীকে আমরা যতই হাল্কা করে ধরি না কেন, সত্যিই ঐ বলা কথা কিন্তু তার পাওনা গণ্ডা, সুদে আসলে আদায় না ক'রে নিয়ে কাউকেই রেহাই দেয় না। এই প্রবন্ধটাকেই তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ ধরা যেতে পারে ;—কেন ? —তাই বলছি।

সে আজ অনেকদিনের কথা,—কোন এক ক্লাবের বিচার বৈঠকে একদিন তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল "মানবত্ব কি ?" তাই নিয়ে সে-দিনকার সে সভাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ হ'লো,—বিচার সমালোচনা বাগ-বিতণ্ডাদি হ'লো,—হাসি তামাসারও অভাব ছিল না,—আরও কত কি !! সভার কার্য্য প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, মাত্র তখন ভাঙ্গা আসরে সভার শৃঙ্খলা নিগড় থেকে রেহাই পেয়ে সভ্যেরা এক সঙ্গে যে যার বাঁধনহীন অভিমত ব্যক্ত ক'রতে সবে সুরু ক'রেছে, এমন সময় হঠাৎ সভাপতি মহাশয় ব'লে উঠ্‌লেন "আপনি একটু কিছু বলুন"—ঠিক 'বেঁড়ে' ধরার মতই ব্যাপারটা ঘুরে দাঁড়াল।

সভাপতি মহাশয় ত বলে খালাস, কিন্তু যে পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে কোন দিন কিছু বলার 'কসরত্' করেনি, তার যে সে ক্ষেত্রে কি অবস্থা দাঁড়ায়,—ব্যথার ব্যথী ছাড়া কে তা বুঝবে। কেউই তা বুঝ্‌লে না —বরং এককালীন সকলের কৌতুহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে প'ড়লো একের পানে,—তার ও অর্থ "বলই না"! কেউ বা স্পষ্টই তা ব'লে ফেল্‌লে।

যাই হোক, যে বিষয় নিয়ে ছিল তাদের বৈঠক, তা তারা সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে ব'লে ক'য়ে শেষ ক'রে ফেলেছিল, এমন কি তর্ক যুক্তি দিয়ে তার একটা 'কাঠামো'ও খাড়া করা হয়ে গেছে, অথচ এ ভাঙ্গা আসরে ফিরে-ফিরৃতি গাজন গাইবার আদেশে সকলেই যেন একটু "অপরংবা-কিম্ ভবিষ্যতি" দেখবার জন্যে আবার একবার নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সলো। হায়রে,—আগে থাকতে এঁদের সমালোচনায় যোগ দেওয়া যে ছিল ভাল। ক্রমশঃ অনুযোগ উপরোধ বেড়েই চল্‌লো যে, আপনি অন্ততঃ যা হয় কিছু একটু বলুন; তখন নিজেরও কতকটা ভয় ভেঙ্গে এসেছিল, মনে হ'চ্ছিল "এইবার ডাকিলেই খাইব"—যে কারণই হোক্—সাধারণের চাহিদার দিক থেকেই হোক্ আর প্রলোভনে পড়েই হোক্, জয় হ'ল সেই "কিছু বলার"। তা ছাড়া যাদের কিছু সংস্থান আছে, তাদেরই "পেটে খিদে মুখে লাজ" শোভা পায়, আমাদের দাঁড়িয়েছে "পেট বড় বালাই" কাজেই "যথা লাভ"টাই মেনে নিতে হয় বাধ্য হ'য়ে।

প্রথমতঃ একটু বিনয় দেখান গেল যে,—"আমি আর কি বলবো।" অর্থাৎ এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌ছিল; সে ভয় ভাবনাকে ছাপিয়েও মনের কোণে অনুক্ষণ জেগে উঠছিলো—কিছু একটু বল্লেও মন্দ হ'ত না, যেন একটু কিছু বলাও

দরকার—তারি মধ্যে দ্বন্দ্ব-বুদ্ধি এসে বল্লে "তারই বা আবশ্যকতা কি ?—যার জন্যে—যে সমস্যা সমাধানের জন্যে যুগ-যুগান্তকাল ধ'রে ছুটে চলেছে মানুষের সর্ব্বতোমুখী সাধনা, যাকে লক্ষ্য ক'রে কত মনিষী কত রকমে কতভাবে তার সমালোচনা ক'রে এসেছেন, তার পুনরাবৃত্তির দরকার আর কি থাকতে পারে ?" নিজের মনেই উত্তর জেগে উঠল—এ সেই স্বভাব,—যে স্বভাবে ছেলে বেলায় ঠাকুরমা বুড়ীর গল্পের ঝুড়ি শেষ না হ'তে হ'তেই অর্থাৎ "আমার কথাটী ফুরালো" বলা শেষ না হ'তেই আবার একটা নতুনের ফরমায়েস করা হত—তাও যা হয়ত' ইতিপূর্ব্বে আরো কতবার শোনা হ'য়েছে ঐ আয়ী বুড়ীর কাছে। এখন আমরা বড় হয়েছি ঠাকুরমা বুড়ী হয়ত কারো-কারো, স্বর্গে চলে গেছেন,—না হয় বয়স হিসাবে আর সেটা শোভা পায়না ব'লে তার পাষাণ ভেঙ্গে নিতে হয় নভেলিষ্ট ভায়াদের দ্বার ধ'রে, অর্থাৎ যার মাল মশলা সবগুলির এক হ'লেও একটু রকম-ফের ক'রে দেওয়াতে মন্দ লাগে না,—সময়টাকে হত্যা করবার বেশ একটু সহজ সুবিধা ও সুযোগ পাওয়া যায়। (অবশ্য সাহিত্য হিসাবে যাঁরা লেখেন তাঁদের কথা ব'লছি না) সঙ্গীত ক্ষেত্রেও আমাদের সেই ছেলেবেলার অভ্যাস বেশ একটু রূপ ব'দ্‌লে অনুসরণ ক'রে চলেছে পাছে পাছে ! তবে কি এটা সেই চির পুরাতনকে নিত্য নূতন ক'রে দেখার ভাব প্রসূত না বুভুক্ষা !

যাই হোক্ মনের সঙ্গে চাতুরীটা ভাল নয়। যেমন পাঁচ জনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইতে একটু ভয় ভাবনা র'য়েছে, তেমনি তার পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মারছিল প্রলোভন বাবাজীবন, নিজেকে জাহির করবার অভিপ্রায়ে ;—এই দোটানায় প'ড়ে মূক হ'ল বাচাল অর্থাৎ বোবারও কথা ফুট্‌লো। কতক পেটে, কতক মুখে কতকটা বা "উদোর

পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে” চাপিয়ে তখনকার মত বলা শেষ ক’রে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। তবে তাতে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়নি তা আর কোন্ মুখে বলি।

তাতেও নিস্তার নেই; শেষে প্রত্যাদেশ হ’ল যে, ঐ মুখে বলা বিষয়টা কাগজে কলমে লিখে দিতে হবে,—তাদের “সঙ্ঘস্মৃতি” নামক হাতে লেখা মাসিক পত্রিকায় বার করবার জন্য। তখন স্বীকার ক’রে নিলাম বটে যে তাই হবে—কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই সেই লিখে দেওয়ার পালা এলো —সেই “তথাস্তু”র জের টান্‌তে—কাগজে আঁচড় দিতে যতটুকু কালির দরকার ছিল তার বেশীটাই লেগে গেছে হাতে মুখে, সেই “হাতে কালি মুখে কালি” মেখে কোন রকমে একটা কাঠামো খাড়া ক’রে দিয়ে, ভাবা গিয়েছিল যে একটা দায় উদ্ধার হওয়া গেল;—হায়রে অদৃষ্ট! তখন কে জানতো যে সব জিনিষেরই জের চলে।

সে আজ কত কালের কথা, এখনও তার জের চ’লেছে;—এবার তোমাদের কেন্দ্র ক’রে। তবে যে ভাব-ভঙ্গীতে “মানবত্ব কি?” ‘সঙ্ঘ-স্মৃতি’তে বার হ’য়েছিল এখানে তার মূল সূত্রটী ছাড়া অনেক কিছুরই রদ-বদল হ’য়েছে, ফলে তার যেমন কলেবর বেড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে রূপও অনেকটা ব’দলে গেছে সত্যি; তা হ’লেও ডাক নামটা পাল্‌টে দেওয়া যুক্তি যুক্ত ব’লে মনে হয় না, তা সে স্মৃতি পূজার জন্যও বটে আবার ভদ্রতার খাতিরে চুরির দায় এড়াতেও বটে। তারপর তোমাদের অভিরুচি। তোমরা চাও একে বাজারে বার কর্ত্তে,—তার মত করেই লেখা হ’লো।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, যাঁরা অনেক কিছু জেনেও স্বার্থপরের মত বা সময়ের অপেক্ষায় ব’সে রয়েছেন আসরে এখনও নামতে

চাইছেন না, তাঁদের সেই আসর-ভীতি ভঙ্গ করা। তারপর বিশ্বনাট্যে নবযুগোপযোগী ছন্দ-বন্দনা কালোপযোগী সুর-তাল-লয় সংযোগে সেই চির-পুরাতনকে আবার নূতন সাজে সাজিয়ে চির সুন্দরের উপাসকদের মধ্যে যে সংযোগ আনা দরকার এ তারই এক অধ্যায় বা পূর্ব্বরাগ।

মানবের অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারে নিহিত, অনন্ত রূপের উপাসনা মাত্র কয়েকটী পংক্তিতে ফুটিয়ে তোলার মত ভাষা জ্ঞান আমার নেই,—কারো আছে কি না জানিনা, কাজেই ত্রুটি স্বীকার ক'রে বিনয় দেখানর কোন আবশ্যকতা আছে বলেও মনে হয় না ; আর সবার উপর ভরসা অনুযোগ-অভিযোগের দায় পোহাতে যখন রইলে তোমরা। নয় কি ?

"মানবত্ব কি ?"

আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "মানবত্ব কি ?" প্রশ্নের মধ্যে ঐ "কি" টুকু না থাকলে বিষয়টী এত জটীল হ'ত না, যে যার ইচ্ছামত হেঁয়ালীপূর্ণ কথার যোজনা ক'রেই হোক, কিম্বা ভাব-সাগরকে টেনে এনে তার ক্ষীর-সর দিয়ে পূর্ণ করেই হোক্, অথবা, থোড়, বড়ি, খাড়ার জায়গায় খাড়া, বড়ি, থোড় লিখে যেমন আত্মপ্রসাদকে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেত, তেমনি কারও অভিযোগ অনুযোগেরও কিছু থাক্‌তো না ; কারণ ওটা একটা আলু বিশেষ পদার্থ ; যে যার ইচ্ছামত ঝোলে, ঝালে বা অম্বলে চালিয়ে নিতে পারতো। বিপদ ক'রেছে ঐ "কি ?"—যার জন্য বিষয়টা হ'য়ে প'ড়েছে বিচারাধীন।

সত্যই যদি বিষয়টাকে বিচার ক'রে দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, এলোমেলো ভাবে তা নিয়ে শুধু খোস আলোচনা না ক'রে যতটা সম্ভব, একটা শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে বিচার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে এগিয়ে দেখাই ভাল—তা সে ক্ষমতায় যতটুকু কুলায়।

বহু পুরাকাল থেকেই, বিচার করবার একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে কোন কিছুর জন্যই হোক্—কোন বিষয়ের ঠিক্ ঠিক্ বিচার মীমাংসার দরকার হ'লে, সে ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে 'দেশ', 'কাল' ও 'পাত্র' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা অর্থাৎ দেশের প্রকৃতি, কালের অনুশাসন আর পাত্রের সম্যক্ অবস্থা উপলব্ধি করা।

এই তিনের যে কোন একটীর অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে বিচার ক'র্ত্তে গেলে, তার মধ্যে অনেকখানি গলদ্‌ই বর্ত্তমান থেকে যায়, যার পূরণ অন্য কোন কিছু দিয়ে করা চলে না।

এখন তা হ'লে আমাদের দরকার, আগে দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে প্রত্যেকটীর পৃথক পৃথক আলোচনা ক'রে তদ্‌তদ্‌ বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করা; তারপর সাক্ষ্যসাবুদ প্রমুখাত বিচারে কি দাঁড়ায় দেখা যাবে। তবে একটা কথা এখানে বলে রাখি যে, আজ আর এ বিচার বৈঠকে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহাশয়কে পাবার কোন উপায় নেই (যাঁর আহ্বানে বিষয়টীর প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল), আর বিচারস্থলে সে আসনে বস্‌তে হবে তোমাদেরি—একজনকে নয় তিনজনকেই, বা অন্য যে কোন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে যাত্রা সুরু ক'র্ব্বে। অন্য কাকেও আহ্বান করার মত সাহস নেই, কারণ এর সওয়াল জবাব শুনে বিচার ক'রে দেখবার মত সময়ের অবকাশ আজকালকার দিনে অনেকেরই থাকে না। পড়া-বিলাসীদের এই জন্যে পৃথক ক'রে আহ্বান করা হ'ল না যে, তাঁরা জনা-যুথী—এক একজন বিশ্বকোষ, সেখানে স্থানাভাব কাহারও হয়নি, এরও হবে না।

তবে তারি মধ্যে যদি কারো বিচার ক'রে দেখবার একটা ইচ্ছাও থাকে, তাঁকে এইটুকু্‌ আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে যে আমাদের এটা হচ্ছে 'বহ্বারম্ভে লঘু্‌ ক্রিয়া' অর্থাৎ এই বিচার অভিনয় খুব মোটামুটিভাবে অতি অল্পের মধ্যে শেষ ক'র্ত্তে বিন্দুমাত্রও গাফিলতি হবে না, তার আরো একটা কারণ যে, যে বিষয়ের বিচার আমরা ক'র্ত্তে যাচ্চি তার পরিধি হ'চ্চে, আজ পর্য্যন্ত মানব, যতরকমের যা কিছু জেনেছে সেই সমগ্র জানা-ব্যাপারকে নিয়ে; অতএব এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কোথায়?

দেশ

ইতিপূর্ব্বেই প্রসঙ্গটাকে সহজ করবার জন্যে যে পদ্ধতিকে আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, সেই অনুপাতে প্রথমেই তাহ'লে এসে পড়ে "দেশ"।

এখানে 'দেশ' বলতে ভৌগোলিকের মাপা-জোঁকা, ট্যাঁরা বাঁকা ক'রে লাইন টেনে ভাগ বাঁটোয়ারা করা—তোমার কি আমার ছোট্ট দেশটী ধ'রলে চল্‌বে না, যখন, বুঝে হ'ক্ না বুঝে হ'ক্ মনুষ্যত্বের বিচার কর্ত্তে ব'সেছি।

'মানবত্ব' বস্তুটা কোন একটী বিশিষ্ট দেশ, জাতি বা সমাজের নিজস্ব সম্পত্তি নয়; উহা সমগ্র মানব গোষ্ঠির সাধারণ সম্পত্তি! সে হিসাবে দেশ বল্‌তে,—এখানে আমাদের ধ'রে নিতে হবে সাগর, নদ, নদী, বন, উপবন, পাহাড়-পর্ব্বতাদি সমেত সমগ্র পৃথিবীটাকে;—তার জীব-জন্তু, পোকা-মাকড় ও মানব প্রভৃতি সকলকে নিয়ে।

হাসবার কথা বটে যে, এক টুক্‌রা দেশের কথা লিখ্‌তে হ'লে তার জন্যে কত গবেষণা, কত পরিশ্রম, কত রকমের না উপকরণ সংগ্রহ ক'রে লিখতে-কর্ত্তে কত সময় কেটে যায়! আর আমরা কিনা, সমগ্র পৃথিবীটাকে টেনে আন্‌চি তার জীব-জন্তু সমেত বিচার আলোচনার মধ্যে! তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই! কারণ, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিকদের পৃথিবীকে এ বিচার সভায় টেনে এনে উপস্থিত ক'রে

কোন লাভ নেই, বরং সেটা অনধিকার চর্চ্চার মতই হবে। কারণ, সে বিদ্যাও যেমন নেই, তেমনি আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেও এক্ষেত্রে বিপদ যে রাস্তায় কম, সেই পথেই চলা-ফেরা ভাল,—আর সেটা রামের পক্ষেই সাজে অপরের পক্ষে লাঠি বাজে। আর, আমরা যেভাবে আলোচনা সুরু কর্ত্তে চাই, তাতে মাত্র আমাদের জানা দরকার,—পৃথিবীর ধাতুগত গুণাগুণ আর মৌলিক প্রকৃতি, আর?—আর আর যা কিছু, প্রসঙ্গ ক্রমে এসে জোটে! তবে আর একটু জানতে পার্‌লে মন্দ হ'ত না যে, আমাদের এই চিরপরিচিত (?) জগতটা কবে, কার খেয়ালে, আর কেনই বা ভেসে উঠেছিল এই অনন্তের কোলে!! হায় মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি কার আত্মজা? সে কি এতই দীন যে, তোমার একখানা জন্মকোষ্ঠিও তৈরী ক'রে যেতে পারে নি!—না উইয়ে কেটেছে? আর, হায় 'অতীত কাল'? তুমিই বা কেমন রেকর্ড-কিপার যে, সব পুরাতন নথীপত্র আবশ্যক মত দাখিল কর্ত্তে পারো না?—মানুষ আর কতকাল তার যথা সর্ব্বস্ব পুঁজি ব্যবহারিক—বুদ্ধি খরচ ক'রে পুরাবৃত্ত সংগ্রহ ক'রে বেড়াবে? তোমার কি উচিৎ নয় তাদের অন্ততঃ একটু আধটু হদিস্ বাত্‌লে সাহায্য করা। যাক্, যা হ'য়ে গেছে তার জন্য অনুশোচনা বৃথা :—মায়েও মেরেছে, ঘরেও ভাত নেই। বরং যে যে উপকরণ আমাদের হাতের সাম্‌নে পাওয়া যাচ্চে, তাই নিয়েই খুসী হ'য়ে বিচার অভিনয় সুরু করা যাক।

এই যে আমাদের দেশ, এর নাম পৃথিবী,—কে নামকরণ ক'রেছিল তা জানা যায় না, পিতার নামও অজ্ঞাত। জাতিতে গ্রহ, নিবাস অনন্তধাম, আর আকারে উনি নাকি কমলালেবুর মত;—পা নেই অথচ অনন্তের বাজারে ঘুরে বেড়ায়। খান কি? 'নাদ' কেমন! ইত্যাদি,

আর কোন কুলুজি এখনও মানব বুদ্ধির বেড়াজালে ধরা পড়েনি। তবে যখন ফাঁদ পাতা র'য়েছে তখন একদিন না একদিন ধরা প'ড়তেই হবে, সে বিশ্বাস আছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের বা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ভিতর থেকে যে, কিছু মালমশলা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে নিজেদের গবেষণার কিছু সহজ সুবিধে ক'রে নোবো,—তাও যে বিদ্যেয় কুলায় না; তবে আশা করি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সেই সেই পরিত্যক্ত অংশগুলি পূরণ ক'রে নেবে, যেখানে যেটী খাপ খায়। আমার ভাগে মাত্র সেইটুকুই রইল আর তাই নিয়েই আলোচনা ক'র্ব্বো, যা নাকি মোটা চোখ দিয়ে দেখতে পাই আর মোটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি।

শোনা যায় যে, পৃথিবীর মধ্যে বা কেন্দ্রে নাকি খানিকটা অগ্নিপিণ্ড বর্ত্তমান আছে, (তা হ'লে সেখানে বায়ু আছে ব'লতে হবে) তারপর সেই গলিত ধাতুস্তর ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে হতে এমন একটা স্তর গ'ড়ে উঠ্‌লো যাকে আমরা মানুষরা ব্যবহারিক বুদ্ধিতে পাথর বলি; সেই পাথরকে আশ্রয় ক'রে জলের বেষ্টনি বিরাজিত হ'লো,—তা থেকে হ'লো মাটী যেটাকে আমরা আশ্রয় ক'রে রয়েছি। এইখানেই, আমাদের এই স্তরটাই পৃথিবী-শরীরের শেষ স্তর নয় (এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, যেখানে ক্রিয়াশীল কিছু দেখা যায় সেখানে বায়ু বর্ত্তমান আছে ধরে নিতে হবে; কারণ ক্রিয়াশীলতা বায়ুর কার্য্য।) কারণ যে, ঊনপঞ্চাশটী বায়ু পৃথিবীকে ক্রিয়াশীল ক'রে রেখেছে, অগ্নিপিণ্ড থেকে মাটিস্তর অবধি কতকগুলি, তারপর মাটির উপর থেকে আরও কতকগুলি বায়ুস্তর বর্ত্তমান; সে কতগুলি তা এখন তার সঠিক কেউ বলতে পারে না, তবে যেটী সর্ব্বশেষ স্তর বা পৃথিবীর বহিরাবরণ

তার নাম নাকি ইন্দ্রবায়ু বা বজ্রগর্ভ স্তর। অন্য গ্রহ থেকে যারা পৃথিবীকে দেখ্‌বে তারা সেই স্তরটাকেই দেখতে পায়। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে তা হ'লে আমরা এখান থেকে অপরাপর গ্রহ নক্ষত্রাদি কি ক'রে দেখ্‌তে পাই? তার উত্তরে বলা যেতে পারে—মাছেরা যেমন ক'রে জলের উপরের বস্তু সকল দেখতে পায়।

আচ্ছা, ও রকম ক'রে না ব'লে, ভারতীয়েরা পৃথিবীর উপাদানতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রণালীতে বিচার-আলোচনা ক'রেছিলেন, সেই রাস্তায় আগে যাওয়া যাক্—অন্ততঃ আমাদের পক্ষে সেটাই সমিচীন ব'লে মনে হয়; কারণ, যা আমরা সকলেই বিনা যন্ত্রপাতি সাহায্যেই অল্প-বিস্তর কিছু না কিছু বুঝতে পারবো। তা'ছাড়া আরো একটা কথা, আমরা মুখে যতই বড় বড় কথা বলি না কেন, যে আবহাওয়ার মধ্যে জন্মেছি, তার ছাপটা যে অন্তরে-বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়ে রয়েছে, তার প্রভাবও যে এর একটা মূল কারণ—তা একেবারে অস্বীকার করা ত চলে না।

সেকালের দার্শনিকদের মতে, আমাদের এই সর্ব্বংসহা পৃথিবী হ'চ্চে পঞ্চভুতাত্মক বা পাঁচটী উপাদান দিয়ে তৈরী, অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, হাওয়া আর খানিকটা আকাশ বা অবকাশ;—এই হ'চ্চে আমাদের আশ্রয়ভূমি পৃথিবী-সতীর মোটামুটি উপাদান বা ঐশ্বর্য্য।

তাঁরা বলেন যে, উক্ত উপাদান কয়টা নাকি, অনুলোম হিসাবে একটী অপরটীর লয়ের স্থান আর বিলোম হিসাবে জন্মস্থান। অর্থাৎ, অনুলোম প্রক্রিয়ায় মাটি জলে লীন হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে লীন হ'য়ে যায়। তেমনি, বিলোম প্রক্রিয়ার সময় আকাশ থেকে বাতাস, বাতাস থেকে তেজ, তেজ থেকে জল ও জল থেকে মাটি উৎপন্ন হয়।

এই পঞ্চ দেবতাকে নিয়েই মানব সভ্যতার সূত্রপাত বা বৈদিক যুগ* আরম্ভ। তারপর দর্শনের জনক কপিল এসে সেই পঞ্চভূতের উপর অধিষ্ঠান ক'রে আরও পাঁচটী তন্মাত্রের, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, মন বুদ্ধি, অহংকারাদি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতিদ্বয়ের বিশ্লেষণ ক'রে মানব-সমাজে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়ে, কর্ম্মের দিকে ভাটা ধরিয়ে দিয়ে যান। তারপরে আবার দেখা যায় যে, কে এক কেষ্ট ঠাকুর এসে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করে দিয়ে যান; তারপরেই দেখা যায় মানুষ, ও উভয়টাই ছেড়ে দিয়েছিল—অকেজো জিনিষ বোধেই হোক্ আর যে জন্মই হ'ক। অনেকে হয়ত' বল্‌বেন, না, ছাড়া হয়নি, তখনও না—আজও না। আমিও ঠিক তাই বল্‌বো। ছাড়িনি আমরা কোন কিছু কোন কালেই, কেবল সেগুলি স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হ'য়েছিল—যেমন বৈজ্ঞানিকদের মাথার ঘাম-পায়ে-ফেলা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আজ আত্মহত্যায় নিয়োজিত করা হ'য়েছে; কেমন নয় কি?

যাক্, এ আবার আমাদের "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" এসে প'ড়ছে। কথা হ'চ্ছিল উপাদান নিয়ে। ঐ উপাদান পাঁচটী গুণ ও শক্তি ব্যাপারেও নাকি ঠিক তাই, যেটী যা থেকে উৎপন্ন তার গুণ ও শক্তি ত' তার মধ্যে থাকেই, উপরন্তু তার একটী নিজস্ব স্বভাবও ফুটে ওঠে, যার জন্যে আমরা প্রত্যেকটীকে আলাদা আলাদা ক'রে বেছে নিতে পারি।

দার্শনিকরা যা বলেন তার নমুনা হ'চ্ছে এই,

১। উপাদান হিসাবে আকাশটা হ'চ্ছে মূল উপাদান। তার গুণ হ'চে "শব্দ",—শক্তি হ'চে সৃষ্ট বস্তু ধারণ উপযোগী আশ্রয় বা "অবকাশ"।

২। তা' থেকে যখন বায়ু জন্মগ্রহণ ক'রলেন,—তিনি তাঁর পিতা,

আকাশের যা গুণ ও শক্তি, যথাক্রমে শব্দ ও অবকাশ ত' পৈতৃক-সম্পত্তি হিসাবে পেলেনই, তা ছাড়া তাঁর নিজস্ব স্বোপার্জ্জিত যে গুণ লাভ হ'ল, সেই গুণের নাম হ'ল "স্পর্শ", আর সেই সঙ্গে যে শক্তি লাভ হ'ল সেই শক্তির নাম হ'ল "ক্রিয়া" (কেউ বা গতিও বলে)।

৩। তেমনি বায়ু থেকে যখন 'তেজ' উৎপন্ন হ'লেন, তিনি তাঁর পিতৃপিতামহের গুণ ও শক্তিগুলির অধিকারী ত' হলেনই, তাছাড়া তাঁর নিজস্ব ক'রে যে গুণ ও শক্তি লাভ হ'ল যথাক্রমে সেই গুণের নাম হ'ল 'রূপ' আর শক্তির নাম 'দাহিকা'।

৪। এই ভাবে তেজ থেকে উৎপন্ন হ'ল স্বেদ 'জল', তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ সঞ্চিত গুণাবলী ও শক্তিগুলির উত্তরাধিকারী ত' হলেনই, উপরন্তু যে গুণ আর শক্তি তাঁর নিজের ক'রে পেলেন, যথাক্রমে সেই গুণের নাম হ'ল 'রস' আর শক্তির নাম 'শৈত্য'।

৫। এই প্রথায় যখন পঞ্চম উপাদান আমাদের ক্ষিতি জাল থেকে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন—অর্থাৎ জন্মালেন, তিনিও বংশানুক্রমিক প্রথায় উত্তরাধিকার-সূত্রে উর্দ্ধতন পুরুষদের তাবৎ সম্পত্তির মালেকান সত্ব ত লাভ করলেনই, তা ছাড়া তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হিসাবে গুণের দিক থেকে পেলেন 'গন্ধ' আর যে শক্তি তাঁর অঙ্কশায়িনী হ'ল, সে শক্তির নাম হ'ল 'ধৈর্য্য'। অর্থাৎ ক্ষিতির মোটমাট যে সম্পত্তি লাভ হ'ল, গুণের দিক থেকে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আর শক্তি হিসাবে যথাক্রমে অবকাশ, গতি, দহন, শৈত্য ও ধৈর্য্য। এই হ'ল প্রাচীনদের উপাদান তত্ত্ব, বিলোমজ প্রক্রিয়ার সময়।

তারপরে, অনুলোমে যাওয়ার সময় ঐ সব ভূতগুলি যে যার নিজস্ব গুণ ও শক্তিকে বিসর্জ্জন দেয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয় যে যার উর্দ্ধতন সত্ত্বার

পাদমূলে ; যথাক্রমে মাটি—জলে, জল—তেজে, তেজ—বায়ুতে এবং বায়ু—আকাশে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

মোটের উপর, আমাদের জানা হ'লো যে, পৃথিবীর উপাদান হ'চ্চে মাটি, জল, তেজ, বাতাস ও আকাশ: অতএব ঐ উপাদানগুলির সম্মিলিত গুণ-কর্ম্মগুলিও তা হ'লে পৃথিবীতে বর্ত্তমান ও তার নিজস্ব সম্পত্তি। আর, ঐ পাঁচটীর ইতর-বিশেষে বা সংযোগ-বিয়োগের ফলে এই বৈচিত্রময় জগতটার সৃষ্টি।

প্রাচীন জড়বিজ্ঞানের এখন এই অবধিই শেষ করা যাক্, দরকার পড়ে, তখন না হয় মূলের সন্ধান ক'রে দেখা যাবে।

এইবার আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি কি মাল মশলা দিতে পারে, যা আমরা সহজ ও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ কর্ত্তে পারি, তাই দেখা যাক্।

আধুনিক বিজ্ঞানের অতশতর মধ্যে "পৃথিবীর চুম্বকত্ব" প্রসঙ্গটাই আমাদের সহজ-বোধ্য হবে ব'লে মনে হয়, আর সাক্ষ্য প্রমাণের দিক্ দিয়ে এর বেশ একটা মৌলিকত্বও আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়টীর দিক দিয়ে আরো এমন অনেক কিছুই বৈজ্ঞানিকের ভাণ্ডারে খুঁজে পাওয়া যায় সত্য, যার সাহায্য নিলে হয়ত' পরিশ্রমের অনেকখানি লাঘব হ'তে পারে, কিন্তু সেটা হয়ত' আমাদের সহজ আলোচনার পরিপন্থি হ'য়ে প'ড়্‌বে, অর্থাৎ আমাদের যে সহজিয়া ব্যবহারিক বুদ্ধি রয়েছে তা দিয়ে ঠিক্ ঠিক্ নিতে পারবো না ;—নিলেও হয়ত' বুদ্ধির বিলাসেই তার পরিসমাপ্তি হবে, কোন কাজে তাকে লাগান চ'ল্‌বে না।

চুম্বক বা তাড়িৎ ব'লতে যে কি বোঝায়, তা বোধ হয় এ যুগে আর কারো অবিদিত নেই ; তা হলেও আমাদের কর্ত্তব্য হ'চ্চে, সে সম্বন্ধে

যা কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ, সমস্তই নথীভুক্ত ক'রে বিচারকদের সাম্‌নে ধরে দেওয়া, তা না দিলে সে সব সাক্ষ্য প্রমাণ আদৌ গ্রাহ্যনীয় হবে না, এই নাকি আজকালকার দিনের নিয়ম। বিচারকরা নাকি যে যার নিজ নিজ চক্ষু কর্ণকেও অবিশ্বাস ক'রতে পারেন, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ প্রয়োগের জোরে অলীক ও মৌলিক হ য়ে যায়। তবে এটাও ঠিক্, তাড়িৎ ব'লতে আমরা, জনসাধারণ যা বুঝি. তা না বোঝারই সামিল; কারণ শক্তি-মাত্রেই অদৃশ্য বস্তু, আমাদের সাধারণ চর্ম্ম চক্ষু ছাড়াও আর একটা চোখ বৈজ্ঞানিকের থাকে, যা দিয়ে এই অদৃশ্য শক্তিগুলিকে দেখা যায়। আর আমরা যা দেখি সে অবস্থাটা হ'চ্চে, শক্তির বাহ্য স্ফুরণ মাত্র যখন একটা বস্তুকে আশ্রয় ক'রে ক্রিয়াশীল রয়েছে; যেমন ধরা যেতে পারে তোমার কি আমার শক্তি; আমার শক্তি ব'ল্‌তে আমার দেহটাকে বোঝায় না. বা তোমার শক্তি ব'লতে তোমার দেহটাও নয়—সেটার স্ফুরণ দেখা যায় কোন একটা কর্ম্মের ভিতর দিয়ে। অতএব আমাকে দেখেই যেমন আমার শক্তিকে দেখেছ বল না, সেটা একটা আধার বটে, তেমনি, তাড়িৎ ব'লতে আমরা যা বুঝি সে ঐ কোন একটা আধারে তাড়িতের ক্রিয়মান অবস্থাটা। অতএব, তাড়িৎ ব'ল্‌তে তার সঠিক্ খোঁজ যে আমরা সকলেই রাখি, তা ব'লে মনে হয় না। অবশ্য এটাও ঠিক্, যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আজ বঙ্কিমবাবুর বাঁশের মত মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সবটাতেই আজ অধিকার বিস্তার ক'রে ব'সেছে, তার স্বরূপের বিশদ ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, জায়গাও নেই। তাছাড়া, সবটুকু বলার দরকারও যে বিশেষ আছে ব'লে মনে হয় না, তবুও যদি কোন কিছু অভাব ব'লে মনে হয়, যে যার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটুকু পূরণ ক'রে নিও।

এখন, বৈজ্ঞানিকেরা চুম্বক সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার মধ্যেও আমাদের যেটুকু নিয়ে দরকার, তা আর অপর কিছুই নয়, মাত্র কয়েকটী প্রাকৃত আইন,—যে নিয়ম মেনে তিনি চলা-ফেরা করেন। যথা :—

১। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, উহার মাধ্যাকর্ষণ নামে একটী শক্তি আছে, যার সাহায্যে উনি নাকি সমগুণ সম্পন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে নিজের বক্ষে টেনে নেন, ও সেই সেই অংশগুলিকে স্বভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলেন।

২। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এক আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, উনি সর্ব্বদাই দুটী বিভিন্ন প্রকৃতির 'প্রান্ত' ও একটী মুক্ত কেন্দ্র সমন্বিত হ'য়ে থাকেন, তার ফলে কি জল, কি স্থল, কি অন্তরীক্ষ, সর্ব্বত্রই পথ-ভ্রান্ত দিক্‌হারা পথিকের পথের সন্ধান ব'লে দেন!

৩। আর একটী মজার ব্যাপার যে, ঐ চুম্বকের বিভিন্ন প্রকৃতির যে দুটি প্রান্ত আমরা দেখ্‌তে পাই, অপর কোন একটী পৃথক চুম্বকের ঠিক সেই সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট কোন একটী প্রান্ত সান্নিধ্যে এলে পর পরস্পর পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়, কিন্তু আবার সেই চুম্বকেরই ভিন্ন প্রকৃতির প্রান্তটিকে সাগ্রহে সান্নিধ্যে টেনে নেয়।

৪। আরো দেখা যায় যে, চুম্বকের উভয় প্রান্তই সমানভাবে ভার ধারণক্ষম, সে বিষয়ে কোন প্রান্তই কেউ কারো চেয়ে ১৯।২০ (উনিশ বিশ) নয়। সে দিক্ থেকে বিচার ক'রে কোনটীকেই ইতর বিশেষ করা চলে না। তারপর ঐ ভার ধারণ ব্যাপারে একটু তারতম্য আছে; চুম্বকের প্রান্তদ্বয় যে পরিমাণ ভার ধারণে সক্ষম, ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে দেখা যায় যে, প্রান্ত অপেক্ষা ভার ধারণ ক্ষমতা ক্রমশ কম, আরো এগিয়ে আরো কম, অবশেষে কেন্দ্রে

গিয়ে দেখা যায় যে সেখানে অনুপ্রমাণ ভারও ধারণ করে না।—কেন্দ্রটী মুক্ত।

৫। আর কি দেখি? দেখা যায় যে, একটী চুম্বককে যত ভাগেই বিভক্ত করি না কেন, এমন কি অনুপ্রমাণ ক'রে ফেল্‌লেও ঐ ঐ অনু-গুলিতে চুম্বকত্বের পরিচায়ক কোন গুণ বা প্রকৃতির বিন্দুমাত্রও বিচ্যুতি ঘটে না;—সেই তার দুটী প্রান্ত, একটী কেন্দ্র, সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, সেই পথ নির্দ্দেশক স্বভাব, সেই সে অতটুকুর মধ্যেই ফুটে থাকে।

চুম্বক সম্বন্ধে আর একটু জানবার আছে, সেটা হচ্ছে চুম্বকের জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারটা। প্রথমেই ব'লে রেখেছি যে, শক্তি মাত্রেই একটা অদৃশ্য বস্তু; কোন একটা ভূতকে আশ্রয় ক'রে তবে শক্তিবিকাশ প্রতীয়মান হয়। চুম্বক শক্তিও তেমনি কোন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ভূতকে আশ্রয় ক'রেই আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে, যদিচ ঐ শক্তি তাবৎ ভূতগণের প্রাণশক্তি অর্থাৎ সমস্ত ভূতেই বর্ত্তমান, যার অভাবে দৃশ্যমান জগতের পরিকল্পনা করাও চলে না; তা হ'লেও ঐ সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত ক'রে তুলতে হ'লে, তৎতৎ ভূতগণকে কয়েকটী প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন একটীর মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করা দরকার হয়। যেমন—

(১) কোনস্থলে সুপ্ত চুম্বকের 'অনু' সমষ্টি জীবিত চুম্বকের সান্নিধ্যে স্থাপন করার ফলে উজ্জীবিত হয়।

(২) কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র সংঘর্ষণেই ফল পাওয়া যায়।

(৩) আবার কোথাও বা অগ্নিসংস্কার ব্যতিরেকে উজ্জীবিত করা সম্ভবপর হয় না।

(৪) আবার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অনু থাকে, যেগুলি উক্ত শক্তির আশ্রয়রূপেই যেন পরিকল্পিত হ'য়ে সৃষ্ট হ'য়েছে বলে মনে হয়।

তারপর চুম্বকের মৃত্যু ;—অর্থাৎ কি ক'রে চুম্বকের চুম্বকত্ব সুপ্ত হয়। এখানে স্বতঃসিদ্ধ চুম্বকের কথা খাটে না, কেবল যেগুলি কোন একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে উজ্জীবিত, তাদেরই সময় সময় মৃত্যুগ্রস্ত বা সুপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌তে দেখা যায়।

যখন কোন চুম্বক কিছুদিন যাবৎ ক্রিয়াহীন অবস্থায় প'ড়ে থাকে, আর সেই জন্য কেন্দ্রস্থ চুম্বকানুগুলি প্রান্তস্থ চুম্বকানুগুলির তেজ (Energy) নিয়ে নিজেদের উজ্জীবিত রাখতে চেষ্টা করে তখন প্রান্ত-দ্বয়স্থিত অনুগুলি বিদ্রোহোন্মুখ হ'য়ে উঠে ক্রমশ তারা কেন্দ্রাপসারী দৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে আত্ম কলহে পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে প্রতিহত করবার চেষ্টায় উঠে প'ড়ে লেগে যায়। ফলে, সমষ্টি শরীরে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয় ও তখনি অনুগুলি ক্রমশ একে একে মূর্চ্ছিত হ'তে থাকে ; ঐ মূর্চ্ছিত অবস্থাকেই চুম্বকের মৃত্যু বলা হয়।

এখন কথা হচ্ছে, প্রথমত 'দেশ' ব'ল্‌তে আমরা যে পৃথিবীকে টেনে এনেছি আমাদের এই বিচার অভিনয়ে তার সঙ্গে চুম্বক প্রসঙ্গের সম্বন্ধ কি হ'তে পারে? এ বোধ হয় আজকালকার দিনের কাউকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিতে হবে না যে, আমাদের এই বসুন্ধরা একটা প্রকাণ্ড চুম্বক বই আর কিছুই নয়। অতএব তার গুণাগুণ, বিচার স্থলে, আমাদের অনেক কাজে লাগবে ব'লেই মনে হয়, তাই এই বিজ্ঞান সম্মত পৃথিবীর পরিচয় দিয়ে রাখতে হ'ল।

মোটের উপর 'দেশ' সম্বন্ধে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের যতটুকু মতামত নিলে আমাদের কার্য্যোদ্ধার হবে ততটুকুই নেওয়া রইল, বাকি যা থাক্‌ল সেটা রইল তাঁদের ভাগে যাঁরা লোকাচার্য্য।

আমাদের দেশ এইটুকুই।

কাল

কালকে নিয়ে বিষম জ্বালা, সে শুধু যে আজ আমাদের ভাগ্যে, তা নয়, প্রাচীন পণ্ডিতমহলকেও তার অনেক হিড়িক্ পোয়াতে হ'য়েছে। যাঁরা প্রথম কালকে বিভক্ত ক'র্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁরা কালের নাগাল ধর্‌বার জন্যে দণ্ড, পল, ক্ষণ, মুহূর্ত্তাদির কল্পনা ক'রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফাঁসের ব্যবস্থা ক'রে দেখেছিলেন যে, তাঁকে ফাঁদে ফেলা যায় কি না? শেষে কিন্তু কে যে ফাঁদে প'ড়লো বোঝা গেল না; বরং দেখা গেল যে, কাল তার মনোমত শিকারগুলিকে মুখে পুরে, সেই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফাঁসের ফাঁক দিয়ে দরজা রাস্তা বানিয়ে, তার যাওয়া আসার মত যথেষ্ট অবকাশ ক'রে নিয়েছে। এম্নি ক'রে যুগ-যুগান্তর সৃষ্টি হ'ল, তাতেও কালের হাঁ যে ক্ষণিকের অবকাশ নিয়েছে, তাও বোঝা গেল না। অথচ এদিকে নিকামাইএর কালকে সামাই না দিলেও নয়, উপায় একটা চাইই চাই, কারণ তা না হ'লে মানুষের যা কিছু গর্ব্ব করবার মত,—সবই যে ঐ নষ্ট কালের ছোঁয়াচ লেগে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। আমরা, কৃষ্ণের জীব মানুষরা—যা কিছু খেটেখুটে গ'ড়বো পিট্‌বো, ঐ নষ্ট কাল কিনা,—কথাবার্ত্তা নেই, সেগুলি সবই গালে পুরে ব'সে থাক্‌বেন, এমন কি ওগ্‌রাবার নামটী পর্য্যন্ত কর্‌বেন না।—কালের এহেন নষ্টামি, ভণ্ডামিতে, মানুষের তথা পুরুষের রাগ না হ'য়েই পারে না। কাজেই এবার তাঁরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বেড়া দিয়ে, 'কাল'কে ত্রিধা বিভক্ত ক'রে ফেল্‌লেন্ (?) তাতে মোটা-বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধিকে কোন

রকমে ঠেকা দেওয়া গেলেও, ফলে নাকি সেই হ'ল—বলে "হাতী ঘোঁড়া গেল তল. মশা বলে কত জল!" অর্থাৎ দেখা গেল, ভূত ও ভবিষ্যৎ যখন তাদের স্রষ্টার অনুশাসনে বর্ত্তমানকে খাড়া ক'রে কালের জরীপ ক'র্‌বে ব'লে মনস্থ ক'রেছিল ও তদভিপ্রায়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কালের তল যেখানে বর্ত্তমানের খোঁটা গাড়তে পারে, সে ত হলই না; শেষে তারা বর্ত্তমানকে মধ্যে রেখে, হাত ধরাধরি ক'রে তুজনে তুদিকে যখন পাড়ি দিলে—কালের আদি-অন্ত সীমানা নির্দ্দেশ করবার জন্য, তখন বর্ত্তমান বেচারা কেঁদে ফুরুতে পারে না, অর্থাৎ কখন বা তাকে ঢলে পড়তে হয় ভবিষ্যতের দিকে আবার কখন বা ভূতের হেঁচ্‌কা টানে তার তিমির অঙ্গে; মুহূর্ত্তের জন্যও তার স্বরূপ অবস্থা কল্পনাতেও প্রতিষ্ঠিত হ'ল না, অবশেষে দোটানায় প'ড়ে বর্ত্তমান যখন মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ল, আর বর্ত্তমান বিহনে ভবিষ্যৎ ও ভূত যখন কালপ্রবাহে ভাসতে লাগ্‌ল অকূল পাথারে, তখন তারা অভিসম্পাত ক'রলে তাদের স্রষ্টা ও তদবংশধরদের উদ্দেশে যে, তোমরা নির্ব্বোধের মত আমাদের যে অকূলে ভাসালে, তার প্রতিফল-স্বরূপ তোমরা কখনও আর কালের-স্বরূপ চিন্তে পারবে না, বর্ত্তমানের প্রেতাত্মাকে কোলে নিয়ে আমরা উভয়ে তোমাদের দৃষ্টি পথ রোধ ক'রে থাক্‌বো, যাতে তোমরা ইহকালে মহিমোজ্জ্বল কালের অকালত্বের সন্ধান আর না পাও। হায় রে অদৃষ্ট!!

কালের ব্যাপারটা সত্যিই একটু গণ্ডগোলের ব্যাপার। নিজেদের বিদ্যে-বুদ্ধি দিয়ে তাকে ঠিক্ ঠিক্ ফুটিয়ে তোলা বা বুঝিয়ে বলা সব সময় মোটেই সম্ভবপর নয়। কাজেই, এ সম্বন্ধে আমাদের উপস্থিত দরকার হ'চ্ছে প্রাচীন দার্শনিকদের চোখটা খানিকক্ষণের জন্যে ধার নেওয়া আর তাদের একটা গল্প—দূরবীন্ ক'সে যা তারা দেখেছিল।

আখ্যানটা হ'চ্ছে যোগবাশিষ্ঠের ; আখ্যানের নায়ক-নায়িকার নাম-ধাম ভুলে গেছি, ঝালিয়ে নেওয়ার বিশেষ কোন দরকার দেখি না, আর তাতে বস্তুত আমাদের কোন ক্ষতি হবে বলেও মনে হয় না, কেবল রাজা রাণী ব'লে ধরে নিলেও চ'লবে।

কোন এক রাজত্বের রাজা ও রাণী উভয়েই, বিশিষ্ট রকমের সুশিক্ষিত ছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যায় রাণী ছিলেন রাজার চেয়ে এক কাটি সরেশ। একদিন রাণী কোন উপায়ে জানতে পারেন যে, আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর বৈধব্য দশা উপস্থিত হবে। তাই জেনে, তিনি ইতিমধ্যে একদিন যথাপ্রক্রিয়া প্রজ্ঞাদেবীকে আবাহন করেন। উদ্দেশ্য জানিয়ে নানা প্রশ্নোত্তরের পর তাঁর কাছে এই বর প্রার্থনা করেন যে, যেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীর আত্মা, তাঁর ঐ গৃহাকাশের মধ্যেই অবস্থিত থাকেন। প্রজ্ঞাদেবীও মৃদুহাস্যে "তথাস্তু" ব'লে সেইখানেই অন্তর্হিত হ'লেন।

ক্রমশ রাণীর বৈধব্যের দিন সন্নিকট হ'য়ে এলো। যথাসময়ে একদিন রাজা অন্তিম শয্যায় চিরনিদ্রাকে আলিঙ্গন ক'রে ইহধামের খেলা সাঙ্গ ক'রলেন। প্রজ্ঞাদেবীর নির্দ্দেশমত রাণী, রাজার মৃতদেহকে পুষ্পাস্তরণে আবৃত রেখে, পুনরায় যথাবিহিত প্রজ্ঞাদেবীকে সেই গৃহে আহ্বান ক'রলেন, উদ্দেশ্য তাঁর গৃহাকাশের মধ্যে তাঁরই স্বামীর আত্মা, কিরূপে ও কি অবস্থায় অবস্থিত রয়েছেন তাই দেখা।

রাণীর আহ্বানে চিদাকাশে প্রজ্ঞাদেবীর আবির্ভাব হ'লে পর, রাণী তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রলেন প্রজ্ঞাদেবীর কাছে। দেবীও তখন রাণীকে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া যোগে জড় শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে তাঁর অনুসরণ কর্ত্তে বল্লেন।

রাণীও যথারীতি স্বীয় জড় শরীর থেকে নিষ্ক্রাসিত হ'য়ে প্রজ্ঞাদেবীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হ'লেন। তখন তিনি দেখেন যে, তাঁর অধ্যাত্মশরীর এক মহাশূন্যকে আশ্রয় ক'রে ভাসমান, দিকে দিকে জ্যোতিষ্মান্ অতিকায় গ্রহ উপগ্রহগণ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, আরও কত বিস্ময়কর নৈসর্গিক ব্যাপার দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই সে ব্রহ্মাণ্ড কটাই উত্তীর্ণ হ'য়ে, অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে উপনীত হ'লেন। এইরূপে আরো কত শত রকমের ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের দৃষ্টিপথে প'ড়্‌লো,—কোন ব্রহ্মাণ্ড পাষাণান্তবর্ত্তী, কোনটী বা সলিলান্তবর্ত্তী, কোথাও বা বায়ুরূপে ভাসমান্, আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড বা কেবলি দুর্‌নিরীক্ষ্য জ্যোতিষ্কণায় সৃষ্ট, আবার কোথাও বা মসীগাঢ় তিমিরাবরণে সুপ্রকাশ হ'য়ে রয়েছে। এই সমস্ত দেখে শুনে, রাণী প্রজ্ঞাদেবীকে প্রশ্ন ক'রে বস্‌লেন যে দেবী! আপনি যে আমাকে ইতিপূর্ব্বে বর দিয়াছিলেন যে, আমার স্বামীর আত্মা আমার গৃহাকাশের মধ্যেই অবস্থিত থাক্‌বে, কিন্তু এ আমরা কোথায় চ'লেছি? দেবী মৃদুহাস্যে তখনকার মত রাণীকে নিরস্ত থাকার জন্য ইঙ্গিত ক'রে অন্য একটী ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ক'রলেন ও তন্মুহূর্ত্তেই সেই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত একটী গ্রহে অবতীর্ণ হ'লেন ও তথাকার এক রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রলেন।

সেখানে রাণী দেখলেন যে, রূপে, গুণে, বয়সে, সাজ সজ্জায় ঠিক্ তাঁর স্বামীরই অনুরূপ এক রাজা রাজসিংহাসনে সমাসীন, অন্তঃপুরে রূপে, গুণে তাঁরি অনুরূপ রাজরাণী অধিষ্ঠিতা, আরও দেখলেন যে, তাঁর স্বামী যে যে পাত্রমিত্রাদি সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য পরিচালনা কর্ত্তেন, তাঁরাও যে যার পদমর্য্যাদানুযায়ী আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে, সব সেই! এমন কি রাণীর সংশয় উপস্থিত হ'ল যে, তিনি তাঁর নিজের রাজপুরীতেই

হাজির রয়েছেন। তারপর প্রজ্ঞাদেবীর আহ্বানে তিনি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে শুনলেন যে, এই তাঁর ভূতপূর্ব্ব স্বামী। রাণী বিস্মিত হ'য়ে দেবীকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন যে, সবে ত আমার স্বামী এই কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র গত হয়েছেন; অতএব ইহারই মধ্যে, ইহজন্মে এত বেশী বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন কি ক'রে? এবারেও প্রজ্ঞাদেবী রাণীকে উপস্থিত মত নিরস্ত থাকৃতে ইঙ্গিত করায় রাণী নিরস্ত হ'লেন।

ইতিমধ্যে এখানকার রাজার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায়, এ জন্মের মত খেলাধূলা সাঙ্গ ক'রে কোন্ এক আনির্দ্দেশের পথে প্রয়াণ ক'রলেন, অন্তর্যামী প্রজ্ঞাদেবীও রাণীর অভিপ্রায় জেনে, সেই শোকসন্তপ্ত রাজ-পরিবারকে পরিত্যাগ ক'রে আবার মহাকাশে আশ্রয় নিলেন, অভিপ্রায় আমাদের রাণীর স্বামীর তৃতীয় জন্ম প্রত্যক্ষ করা।

রাণীর অভিপ্রায় অনুযায়ী, প্রজ্ঞাদেবী আবার তাঁকে নিয়ে পূর্ব্বমত কত নতুনতর ব্রহ্মাণ্ড পারে, কোন এক গ্রহে নিয়ে গিয়ে তন্মধ্যস্থ এক প্রদেশের রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হ'লেন।

এখানে এসে বিস্ময়াভিভূতনেত্রে রাণী দেখলেন যে, সেই সব, তার কোন ত্রুটীবিচ্যুতিও নেই, ব্যতিক্রমও নেই, কেবলমাত্র রাজার যা একটু ভাবের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, অর্থাৎ তিনি ইহজন্মে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন; প্রজাবৃন্দ রাজাকে নিজ নিজ পিতার মত দেখে রাজার বিন্দুমাত্র সুখ বা দুঃখের বিবর্ত্তনকে নিজেদের সুখাসুখেরই মত অনুভব করে; রাজাও সেইরূপ প্রজাগতপ্রাণ, পুত্রাধিক স্নেহে তাদের পালন ক'রে থাকেন; এক কথায় ব'লতে গেলে ব'ল্‌তে হয় যে, সমগ্র রাজত্বটাই যেন একটী সম-সুখে-সুখী দুখে-দুখী একান্নভুক্ত পরিবার।

এহেন শান্তিপূর্ণ রাজত্বে হঠাৎ রাজলোলুপ এক ম্লেচ্ছ রাজা, সাম্রাজ্য

বিস্তারের আশায় হানা দিলে—দেশ অশান্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো। রাজার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা, প্রজাগণের আনুরক্তি, কিম্বা তাঁর অর্থাৎ রাজার ধর্ম্ম-বুদ্ধি, কোন কিছু দিয়েই সে ম্লেচ্ছ রাজাকে ঠেকান গেল না; শত্রুর নিকট পরাজিত হ'য়ে অবশেষে সেই ধার্ম্মিক রাজা বনে চলে গেলেন, শত্রুকবলিত পরিজনবর্গের সংবাদ গ্রহণের অবকাশও জুট্‌লো না।

তখন প্রজ্ঞাদেবী আমাদের রাণীকে সম্বোধন ক'রে ব'ল্লেন, বৎসে! রাজা এখন নির্ব্বাণাশ্রয়ী হ'তে গেলেন, অতএব তাঁর পরজন্ম আর নাই, এখন চল আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি, নতুবা বল, তোমার যদি আরও কিছু জান্‌বার অভিলাষ থাকে, যথাসাধ্য তার মীমাংসার চেষ্টা ক'র্‌বো।

রাণী উত্তরে বল্লেন যে. আমার যা প্রশ্ন উঠেছিল, আপনার কাছে তা'ত নিবেদন করাই আছে, আপনার ইঙ্গিতমত দ্বিতীয়বার সে সমস্ত এখানে উথাপন করার কোন দরকার দেখি না. কারণ জানি, যথোপযুক্ত সময়ে আপনি নিজেই তার মীমাংসা ক'রে দেবেন; তা ছাড়াও আরো দুটী বিষয় আমার জানবার কৌতুহল হ'চ্ছে;—একটী হ'চ্ছে যে, যে রাজা এতটা কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রজাবৎসল ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ছিলেন, তিনি কি কারণে ও কোন পাপে একজন দস্যু-স্বভাবাপন্ন নরপতির কাছে পরাজিত হ'লেন? আর দ্বিতীয়টী হ'চ্ছে যে আমার স্বামীর অর্থাৎ যাঁর আত্মাকে আমার গৃহাকাশ মধ্যে অবস্থিত থাক্‌বার বর নিয়েছিলাম, সেই তাঁর পূর্ব্বজন্ম কিরূপ ছিল? মাত্র এই দুটী বিষয় জানবার কৌতূহল স্বতই আমার মনে উদয় হ'য়েছে।

প্রজ্ঞাদেবী রাণীর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন যে, দেখ তোমার স্বামীর আত্মার তৃতীয় জন্মগত রাজা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ছিলেন সত্য, আর অভ্যস্ত সাধারণ বুদ্ধিতে তার একটা মূল্য দেওয়া হয় তাও সত্য, কিন্তু ঋজু

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির কাছে ও সব মূল্যহীন কথা ; অর্থাৎ পাপ পুণ্যের মূল্য সেখানে একই ;—যে, যে বিষয়ে দুর্ব্বল সেইটাই তার পাপ, আর সেই পাপই মানবের প্রতিষ্ঠা লাভের পরিপন্থী। অতএব তোমার স্বামীর তৃতীয় জন্ম যখন রাজনীতিকেই তাঁর কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তাঁর উচিৎ ছিল, যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে সমুচিত অভিজ্ঞতা লাভ করা, অর্থাৎ সেই বিষয়ে শক্তিলাভ করা, কিন্তু তিনি তা করেন নি ; আর সে বিষয়ে ঐ ম্লেচ্ছ নরপতি ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী, অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে সুপণ্ডিত, তাই উভয়ের মধ্যে ম্লেচ্ছ নরপতিই রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের উপযুক্তপাত্র, আর তোমার স্বামী পরাজিত হ'লেন।

আর ঐ ধার্ম্মিক রাজা যে অধ্যাত্মবিদ্যায় ঐ ম্লেচ্ছ রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাতে কোন সন্দেহই নাই, তবে এইভাবে পরাজিত হওয়াটা তোমার স্বামীর পূর্ব্ব কর্ম্মের পরিণতি ; সে ব্যাপারটা তোমার যিনি স্বামী ছিলেন, যাঁর পূর্ব্বজন্ম জানবার জন্য তোমার আগ্রহ হয়েছে, সেই সে তাঁর পূর্ব্বজন্ম দেখে এসে, তারপর এবিষয়ে মীমাংসা ক'রে দেবো। এখন চল আমরা গ্রহান্তরে গিয়ে তোমার স্বামীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জেনে আসি।

তারপর তাঁরা অভিলষিত গ্রহে উপনীত হ'য়ে এক তপোবন প্রান্তে হাজির হ'লেন, তদনন্তর এক তপস্বীর আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখেন যে, একজন তপস্বী মৃত অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর অঙ্কে মাথা রেখে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আশেপাশে পরিজনসমেত শিষ্যবৃন্দ রোরুদ্যমান ও শোকাভিভূত হ'য়ে ইতস্ততঃ ব'সে রয়েছে, তার মধ্যে রাণী এইটুকু লক্ষ্য ক'রলেন যে, ঐ যে তপস্বিনী, সে ঐ রাণীরই হুবহু প্রতিমূর্ত্তি মাত্র,—শুধু যা বসনভূষণের পার্থক্য ; আর ঐ যে তপস্বী গতাসু হ'য়ে প'ড়ে রয়েছেন, তিনিও হুবহু তাঁর স্বামীরই অনুরূপ মূর্ত্তি,—

শ্মশ্রু গুম্ফ ও পরিধেয় বস্ত্রাদির যা পার্থক্য। আর আর যে সব শিষ্যবৃন্দ ব'সে রয়েছে, তারাও যে তার স্বামীর পাত্রমিত্রগণের অনুরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এই সমস্ত দেখা হ'লে পর, প্রজ্ঞাদেবী রাণীকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, এই হ'ল তোমার স্বামীর পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার।

ইনি একজন নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন, এঁর এই যে অবস্থা দেখ্‌চি, এ অবস্থা এই সবেমাত্র সংঘটিত হ'য়েছে, তা বোধহয় তুমি অনুমানেই বুঝতে পার্‌ছো। ইনি, আজ প্রাতে রাজধানীতে ভিক্ষান্বেষণে গিয়েছিলেন, সেখানে কোথাও ভিক্ষা জুটলো না; কারণ, তখন কি এক উৎসব উপলক্ষে রাজা বেরিয়েছেন রাজধানী প্রদক্ষিণ ক'র্‌তে, প্রজারাও সকলে সেই উৎসবে মেতেছিল, কে কার কথা শোনে;— নিরাশ হ'য়ে, ভগ্নহৃদয়ে তপস্বী এক গাছের তলায় বিশ্রাম ক'রছিলেন, এমন সময় ঐ রাজ্যের রাজা তাঁর সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেল,—আর রেখে গেল তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের ছটা ঐ দরিদ্র তপস্বীর হৃদয়কন্দরে।

নিরাশ হ'য়ে আশ্রমে ফের্‌বার মুখে, এই চিন্তাই তার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো যে, হায় আমার মত দুর্ভাগ্য কে? আজ আমার অক্ষমতার জন্য, সমগ্র পরিবারকে উপবাস ক'রে থাকতে হবে। যদিচ, এই ছিল আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, অর্দ্ধাহারেই তাঁরা অভ্যস্ত, তা' হলেও ভুতাবিষ্টের মত কেবলই মনে মনে তোলাপাড়া ক'রছিলেন—নিজের ও রাজার অবস্থা পার্থক্য সম্বন্ধে। আর, সব চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল এই চিন্তা যে, হায়—যদি একদিনের তরেও তিনি ঐ অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন, তা'হ'লে মাত্র ঐ একদিনই, তিনি আশা মিটিয়ে তাঁর স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ ও পরম স্নেহাস্পদ শিষ্যবৃন্দকে পরিতোষসহকারে পান-ভোজনাদি দিয়ে, অতৃপ্ত আত্মার বহুদিনের পুঞ্জিভূত আকাঙ্ক্ষাকে

মিটিয়ে নেন!—এই সব অবান্তর বিষয় তোলাপাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে দিনের শেষে যখন তিনি আশ্রমে প্রবেশ ক'র্বেন, এমন সময় হঠাৎ এক বৃক্ষকাণ্ডে হোঁচট লেগে তপস্বী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। সে সময় তাঁর জ্ঞান-নির্ম্মল চিদাকাশ রাজৈশ্বর্য্য ও পরিজন-মোহ-রূপ বিষয়ে আত্যন্তিকতা দোষ দুষ্ট হ'য়েছিল এবং তখনি তিনি কালগ্রাসে পতিত হন; তারি ফলে ইনি পরজন্মে রাজা হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন, তুমি যে রাজার পরিণীতা স্ত্রীরূপে পরিচিতা।

তখন রাণী পুনরায় প্রশ্ন ক'রলেন যে, হ'তে পারে, আমি বা আমার স্বামীর পরিবারবর্গ কোন এক শুদ্ধাত্মার মোহ পরিকল্পনায় সৃষ্ট, তা আমি অবিশ্বাস নাই ক'র্লাম, কিন্তু বিশেষ সন্দেহের কারণ হ'চ্চে এই যে,—উপস্থিত আমরা যা দেখছি তা'তে তা মনে হ'চ্চে যে, এই তপস্বী সবেমাত্র পঞ্চত্ব লাভ ক'রেছেন, এখনও পর্য্যন্ত এঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়নি, অতএব বলুন, এই সময়টুকুর মধ্যে কিরূপে ঐ তপস্বীর তিন তিনটী জন্ম ও এক এক জন্মে এত বৎসর ক'রে রাজত্বকাল অতিবাহিত করা সম্ভবপর হ'তে পারে?

প্রজ্ঞাদেবী তখন স্নিগ্ধহাস্যে রাণীকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন যে, দেখ বৎসে, কালের পরিমাণ করবার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিধি,—বিধিও নির্দ্দেশ ক'রতে পারেননি, আর নেইও। যে যার গতি অনুযায়ী ইচ্ছামত কালের পরিমাণ ক'রে নিয়ে থাকে; কেহ মানব পরিমাণ কোন একটী মুহূর্ত্তকে বিস্তারিত ক'রে নিয়ে, সেখানে যুগযুগান্তের পরিকল্পনা ক'রে নিতে পারে, আবার কেহ বা ঐ পরিমাণ যুগযুগান্তকে ছোট ক'রে নিয়ে মুহূর্ত্তাদিতে পর্য্যবসিত ক'রতে পারে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেই কালের এই অকালত্বের ব্যাপার জানেন, তুমিও তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অচিরে যে

এসবের মর্ম্ম অবগত হবে তাতে সন্দেহ নেই। আর একটা কথা; ইতিপূর্ব্বে আমরা তোমার স্বামীর তৃতীয় জন্মে যে নির্ব্বাণাশ্রয়ী হ'তে দেখে এসেছি, সেটা হ'চ্চে—যে তপস্বীকে আমরা দেখেছি তাঁর চির-সঞ্চিত তপস্যার ফল। আর, রাজার বেশে যে দুটী জন্মকে আমরা তথাকথিত অন্যত্র দেখে এসেছি, সেটা তাঁর শুদ্ধচিত্তে—ঐকান্তিক-বিষয় চিন্তা-জাত।

আর একটী প্রশ্নের উত্তর তোমাকে এখনও বলা হয়নি, ইতিপূর্ব্বে তুমি জানতে চেয়েছ যে, আমি বর দেওয়া সত্ত্বেও তোমার স্বামীর ভূতাত্মা গৃহাকাশের বাহিরে কি ক'রে যায়? হে বৎসে, এটা ঠিক, আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম,—তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না ক'রেই তোমার গৃহাকাশের মধ্যেই ঐ সব ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ ক'রে বেড়িয়েছি। তুমি নিজেই এই সব বিষয়ের মীমাংসায় সমর্থা; অগ্রসর হও, নিজেই সব বুঝতে পারবে।

গল্পাংশে হয়ত আসলের সঙ্গে অনেক কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যাঁদের দরকার প'ড়বে সেখান থেকে তাঁরা দেখে নেবেন। আমাদের মাত্র দরকার প'ড়েছিল কালের অভিব্যক্তি নিয়ে;—দার্শনিকেরা ঐ অদ্ভুত বস্তুটীকে কি চোখে দেখেন, তার অন্ততঃ খানিকটাও জেনে নেওয়া।

কালের মুখে কালি দিয়ে,—এখন দেখা যাক 'কাল' ব'লতে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে কি বুঝি। যে কাল নিয়ে আমাদের ঘরকন্না, তার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে—আমাদের ঐ গ্রহপতি সূর্য্যকে অবলম্বন ক'রে; অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবী সুন্দরীর ঘুরপাক খাওয়া খেলার তালে কখনও সূর্য্যকে সামনে কখনও বা পেছনে করার ফলে, আমাদের কাছে ফুটে

ওঠে দিন রাত্রি ; অথচ তাঁর নিজের বেলায়, দিনের শেষ কবে হয় তা বোঝবার জো নেই, কারণ সূর্য্য আমাদের মাথার উপর থাকতে থাকতে আমরা তার দিকে যত রকম ক'রেই পিছন করি না কেন, কৈ তা'তে ত রাত্রি ঘনিয়ে আসে না ; তা হ'লে দেখা যা'চ্চে তাঁর নিজের বেলায় সে বালাই নেই—অন্তত সূর্য্যের দিক থেকে। অথচ, এই বড়র আশ্রয়ে থেকে ছোটদের দুর্ভাগ্যের পরিসীমা নেই, বিশেষ ক'রে ঐ যম যমীর আস্ফালনে।

তারপর অভাজ্য কালকে কাল্পনিক ভাজক দিয়ে ভাগ ক'রতে যাওয়ার ফলে যে ভাগফল উঠেছিল—অর্থাৎ যা আমরা ইতিপূর্ব্বেই একবার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব'লে আলোচনা ক'রে এসেছি, আর যাকে অতিক্রম ক'রে কালকে দেখার কোন কল্পনাই আমাদের আসে না, সে সম্বন্ধে আরও দু'একটা কথা প্রশ্ন হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

ধরা যাক, তুমি কি আমি কোন এক অজানা গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে, চলা আরম্ভ করেছি। এখন আমরা যে মুখে যাচ্ছি তার পিছনে, আশে-পাশে অনেক কিছু অতিক্রম ক'রে যেতে হ'চ্ছে ; যেটাকে অতিক্রম ক'রে চ'লেছি এটা হ'চ্ছে অতীত, আর যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় সামনে ফুটে উঠ্‌ছে বা উঠবে, আমার এগোনার ফলে তাই হ'ল ভবিষ্যৎ, তারি মধ্যে আমি যখন যেখানে থাকৃছি সেইটে হ'চ্চে বর্ত্তমান। কিন্তু কথা হ'চ্চে, চলার মুখে একটাকে অতিক্রম ক'রতে না ক'রতেই, ভবিষ্যতের ঘাড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছি। কোনখানে যদি গতি বন্ধ ক'রে বর্ত্তমানের খবর নিতে হয়, তাহ'লে গতি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন আর অতীত বা

ভবিষ্যতও থাকে না, থাকে মাত্র বর্ত্তমান, অথচ যার অতীত বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নেই, তার আবার বর্ত্তমানের পরিকল্পনা আসে কোথা হ'তে। তারপর আরো একটা কথা, আমরা চলার পথে ঘর-বাড়ী, নদ-নদী, যা কিছু অতিক্রম ক'রে আসি না কেন, তারা মাত্র আমার বা তোমার গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিতে অতীত বা ভবিষ্যৎ হলেও তখনও তারা সেখানে বর্ত্তমান, আবার শুধু বর্ত্তমানকে বর্ত্তমান বলার কোন মানেই হয় না। অতএব, আমাদের যে কালের আধ্যাস এ সবটাই আপেক্ষিক তোমার বা আমার গতির ক্রম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন, আমাদের কালের দেবতা সূর্য্য চিরদিনই পৃথিবীগাত্রকে রশ্মিজালে আপ্লুত ক'রে রাখলেও, পৃথিবীর গতিশীলতার জন্য আমাদের কাল নির্দ্দেশ হয়ে থাকে; কিন্তু যদি পৃথিবীর গতি না থাক্‌তো তাহ'লে 'সেকালে'র আধ্যাস কেমন হ'ত?

কাল বল্‌তে যে কি (?) তা আমরা সকলেই জানি ও বুঝি, তবুও 'কাল'কে নিয়ে এত নাড়া ঘাঁটার কারণ আর কিছুই নয়, উদ্দেশ্য আলোক চিত্রে তার আসল মূর্ত্তির ছবি তোলা। যেমন আলোক-চিত্রে গতিশীল কোন বস্তুর ছবি নিতে হ'লে, ঐ গতিশীল বস্তু অপেক্ষা আলোক চিত্রের গতিবেগকে ঢের বাড়িয়ে নেওয়া দরকার হয়, নতুবা ঐ গতিশীল বস্তুটীর স্বরূপ চিত্রপটে ধরা পড়ে না; এখানেও সেই উদ্দেশ্যে এত কথার মালা গাঁথা; অর্থাৎ আমাদের সজীব আলোক-চিত্র মনের যে সাধারণ দৃষ্টিশক্তি বা গতি রয়েছে, তার সেই সাধারণ গতি অপেক্ষা, গতিবেগকে বাড়িয়ে—অন্তত পক্ষে সমকক্ষ গতি ক'রে নেওয়া, দৃষ্টিভ্রম বশতঃ যে সব প্রমাদ, তার হাত এড়াবার জন্যে। তাছাড়া আলোকে জানতে হলে যেমন আঁধারকেও জানা

দরকার, আর তুমি জান্‌তে না চাইলেও সে যেমন আলোকের অনুগামী হয়ে আছেই,—এমন সময় যদি কখন সেই চির আলোকের লোকটীর আলোটী নিভে যায়, তখন সে আঁধার যেমন তাকে ভূতের মত গ্রাস কর্ত্তে আসে,—আমরা মানুষরা তেমনি, কালের অকালত্বকে ভুলে থাকার দরুণ কাল-কবলিত হয়ে বিভীষিকার ছায়া দেখে বেড়াচ্ছি। সেই অকালত্বের সন্ধান নিতে হ'লে, শুধু এই লিখে পড়েই কোন কিছু হবে না ;—রামচন্দ্রের মত তাকে ব'সতে হবে অকাল বোধনে, কালবেত্তা রাবণকে বধ ক'রে তার হারান সীতাকে উদ্ধার ক'র্‌তে।

আমরা মানুষরা, আমাদের 'কাল' ধর্ত্তে হবে অতীতের অন্ধকার যুগটা ছেড়ে দিয়ে, যেখান থেকে তারা পাড়ি দিয়েছে তাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তোলবার জন্যে। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত সভ্যতার মূলে মানব জাতির কত যে উত্থান-পতন, ভাঙ্গা গড়া, শান্তি-বিগ্রহাদির তাণ্ডবলীলা অভিনীত হ'য়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কালের দপ্তর খানায় অতীতের কৈফিয়তে পাওয়া যায় যে, অতীত তার কৃতি সন্তানদের,—কীর্ত্তির স্মৃতি বুকে নিয়ে বয়ে বেড়ায় ভবিষ্যৎ পুরুষকে সাক্ষ্য দিতে যে, হে বর্ত্তমানের ভবিষ্যৎ সন্তান, তোমরা বারেক আমার পানে চেয়ে দেখ,—দেখতে পাও কি—কোনো অকৃতি সন্তানের আলেখ্য আমার বুকে ?—যারা বর্ত্তমানকে আপন জেনে তারি পরিচর্য্যায় রত হ'য়েছিল ? ফলে আজ তারা আমার করাল গ্রাসে পতিত হ'য়ে চির মূর্চ্ছিত অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে আর এদিকে আমায় অতি ভীষণ কালো রূপও আজ কিসের স্পর্শে ভাস্বর হয়ে রয়েছে জান ? সেই ঐ কীর্ত্তিমান্‌দের কীর্ত্তি-মেখলা, যাঁরা সুদূর ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তুলেছিলেন নিজ নিত্য সত্ত্বা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে। আমার যা অস্তিত্ব, শুধু তাদের নিয়েই ;

নইলে কেউই আর ফিরেও চাইত না বা নামও ক'র্ত্তোনা এ কালো ভূতের।

বর্ত্তমান বলেন—সাধারন জীবের অতীত কর্ম্মের ফলপ্রসূ ভাগ্য ও ভোগের ক্ষেত্র বা বন্ধন, কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ মানবেরা আমার স্বরূপ জ্ঞাত থাকার দরুণ কুরুক্ষেত্ররূপে কল্পনা করেন অর্থাৎ ভোগের অবকাশ না রেখে ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র ব'লে ধরে নেন। যারা আমার অপরূপরূপে মোহিত হ'য়ে আত্মবিস্মৃত ও স্বার্থপর হ'য়ে উঠে, তারপরও তাদের ভোগাবসানে দুস্তর আমার শরীরকে ঋজু হ'তে ও ঋজুতর ক'রে উত্তীর্ণ হবার মত অর্থাৎ আত্মরক্ষার যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে থাকি, তাতেও যারা অসমর্থ হয় অগত্যা তারা নিজ নিজ কর্ম্মফলের অতীতের কাল গহ্বরে আশ্রয় নেয়।

ভবিষ্যতের বক্তব্য হ'চ্চে যে, তাঁর নিজস্ব কর্ত্তব্য কিছুই নেই, মাত্র সকলের উৎসর্গীকৃত ভাল মন্দ কর্ম্মের অদৃষ্টরূপে বা দৈববাদীদের দৈবরূপে বিরাজিত থেকে যথা সময়ে সেইগুলিকে উপ্ত ক'রে তোলেন।

এই ত গেল আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কৈফিয়ত, তারপর খোদ কালকে নিয়ে আরো অনেকের অনেক রকম খোদগারি যে নেই—তা নয়, তবে সে সব নজির দিতে গেলে এত বেশী অবান্তর হ'য়ে প'ড়বে যে, তাতে আমাদের আসলটাই প'ড়্বে চাপা, অতএব তা না ক'রে বরং কালকেই এখনকার মত ধামা চাপা দিয়ে আমাদের কাজের কাজ সেরে নেওয়াই ভাল।

ইতি মধ্যে এস, সকলে মিলে একবার পাত্র দেখাটা সেরে আসি।

পাত্র

পাত্র বল্‌তে আধারকে বলে,—যার আধেয় আছে, আরো বোঝায় যে উহা কোন না কোন উপাদানে সৃষ্ট, ঐ উপাদানকে 'ধাতব' বা 'তৈজস' বস্তুও বলা হয়,—'সূর্য্যবংশীয়' বল্‌লে হয়ত' লাঠালাঠি বেধে যাবে, যেমন দ্রব্যকে দ্রবণীয় বল্‌লে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

এখানে পাত্র বল্‌তে সাদা, কালো, লাল, নীল সব রকমের বর্ণের আর ছোট বড় সমগ্র মানবগোষ্ঠিকেই ধরতে হবে, যদিও আধার শব্দের সংজ্ঞা আরো বড়, যার মধ্যে জীব-জন্তু, গাছ-পাথর, গ্রহ-নক্ষত্র, কেউই বাদ পড়ে না, তা হলেও এখানে শুধু মানব পাত্রটীই হ'চ্ছে আলোচ্য বিষয়, কারণ আমাদের গোড়ার কথাই ছিল মানবত্ব কি?

তবে এখানে এখন একটা কথা যে, মানুষকে 'পাত্র' সংজ্ঞা দেবার মানে কি? এমন জলজ্যান্ত রক্তমাংসের শরীরটাকে কেন যে এমন একটা বিদঘুটে ধাতুজ আখ্যা দিয়ে অপদস্থ করা! আর কে যে দিয়েছিল এই আখ্যা তার হ'দিস পাওয়া চুলোয় যাক্‌, কোন নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত নেই! একি খেয়াল না কি? দেখা যাক, কুলুজী ঘেঁটে কোন কিছু পাওয়া যায় কি না?

এঁদের আদিম কুলুজি বিশেষ কিছু যে আছে বলে' ত' মনে হয়না, প্রত্নতাত্ত্বিকরা ত' আজ পর্য্যন্ত তার সঠিক বার্ত্তা দিতে পারেন নি, তাই মনে হয় এদের অধিষ্ঠানভূমি ধরিত্রী দেবীর মতই আদিম অবস্থা অন্ধকারে ঘেরা;—অর্থাৎ এরা এই মানুষরা কোথা থেকে এলো এই ধরিত্রীর বুকে!

এমনিই কি এরা গজিয়ে উঠেছিল, গাছপালা, পোকা-মাকড়দের মত, তার অন্যান্য প্রতিবেশী জীবজন্তুদের সঙ্গে?—না ডারউইন সাহেবের মতানুযায়ী তারা পোকা-মাকড় থেকে ক্রমবিকাশের ফলে এই পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে? না কেউ অলক্ষ্যে থেকে তাদের স্ব-স্বরূপে তৈরি ক'রে ঝুপঝাপ ক'রে ফেলে দিয়েছিল এই পৃথিবীর অঙ্গে? তারপর সেই আদিম যুগের আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের,—সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি আচার-ব্যবহারাদি কোন কিছু ছিল কি ছিল না? বা যা ছিল তাই বা কেমন? যে সম্বন্ধে এক কালের দপ্তর-খানার খাজাঞ্চি অতীতই তা ব'লতে পারে, তবে কথা হচ্ছে তার সদরে খবর নিয়ে যায় কে?

হায়রে অতীতের অন্ধকার যুগ! তোমার কাল-গর্ভে যে, আমাদের কতশত অপূর্ব্ব কাহিনীকে মণিমাণিক্যের মতই লুকিয়ে রেখেছ তার ইয়ত্বা নেই, যার একটু আধটু হ'দিস আমাদের জানিয়ে দিলে তা নিয়ে কতই না গবেষণা সমালোচনা ক'রে আজ নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে ক'রতাম (আর তার সঙ্গে সঙ্গে যে নিজেরও অবস্থার পরিবর্ত্তনাদি না হ'ত তা নয়)। যাক্, আরো এগিয়ে দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় মরে।

এমনিই ত কতকগুলি কিম্বদন্তী আছে যে, সে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা না হোক্, কতকগুলি এমন বংশ ছিল বা আছে যাঁদের পূর্ব্বপুরুষ হচ্ছে গ্রহপতি সূর্য্য—কারো বা চন্দ্র, কারো বা কাশ্যপ (এই পৃথিবীর স্থল-জল অন্তঃরীক্ষ স্থিত তাবৎ চরাচর গ্রহপতি সূর্য্য থেকে পিঁপড়েটী পর্য্যন্ত যার ঔরস জাত), এদের সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই, কারণ ওরা সব খাস্-দেবতা'র বংশধর, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য পৃথিবীতে কষ্ট করে এসেছিলেন—তার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তারপর এমনিতর কেউ

খোদ ঈশ্বরের ঔরস জাত, কেউ বা আরো কত রকম স্বর্গের বৈভবাদি ছেড়ে মানুষকে কৃতার্থ করতে এসেছিলেন, তাঁদের বা তাঁদের বংশধরদের নিয়ে কোন কিছু বলা আমার সাজেনা, কাজেই এরপর যে সব কথা-বার্ত্তা লেখা হবে যেগুলি নিছক আমাদের অর্থাৎ এই সব সাধারণ মানবদের নিয়ে; বিশেষ কারো ওজর-আপত্তি করবার থাকবেনা। তাতেও যদি কারো আঘাত লাগে, জানবো যে তিনি কোন কারণে নিজের স্বর্গীয় বংশপরিচয়টা ভুলে গেছেন, সে কথা আমরা এখনই স্বীকার করে রাখছি, অতএব আমাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হ'বার মত কোন কিছু ওজর-আপত্তি কোনদিক থেকেই রইল না।

আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানবদের সম্বন্ধে, শ্রুতি স্মৃতি, কিম্বদন্তী ইত্যাদি সব ঘেঁটে ঘুঁটে মোটমাট এইটুকু বোঝা যায় যে, আদিম যুগে মানুষের পূর্ব্বপুরুষরাও বুনো ছিল, সে কতদিন তা কে জানে। তারপর বোধ হয়, জন্তু-জানোয়ারদের উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই হউক আর সে যে কোন কারণেই হউক, তাদের দলবদ্ধ হ'য়ে থাকার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উন্মেষ হ'য়েছিল। অবশ্য অন্যান্য প্রতিবেশীদের যে সে স্বভাব নেই তা বলছিনা, বরং বেশী পরিমাণেই যে আছে, সে কথা শতেকবার স্বীকার করছি; বরং মানুষের বেলায়ই সে কথা জোর করে বল্‌তে ভরসা হয়না, কারণ দেখতেই ত পাওয়া যায় যে দায়ে না পড়লে কেউ কারো ছায়া স্পর্শ করাটাও আমাদের ধাতে বরদাস্ত হয়না।

সে যাই হোক্, না হয় ধরে নেওয়াই গেল যে স্বার্থবুদ্ধি থেকেই সেই আদিম মানবেরা একটা যে দল বেঁধেছিল একথা সত্য।

তারপর যখন যাদের ভাগ্য ফেরে,—অবশ্য সেটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ছিল তা কিছু বলছি না, কারণ আজকাল এমন কথাও উঠছে

আর শোনাও যায় যে মানুষকে তাদের আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়া দরকার! তারপর হয়ত এমন দিনও আসবে যখন নদীকে বলবো তার গিরি-কন্দরে ফিরে যেতে, কে জানে সে কেমন দিন!! যাক; সে সৌভাগ্যের জন্যই হোক আর দুর্ভাগ্যের জন্যই হোক, যে কোন কিছুর জন্যে একটা প্রচেষ্টা ব'লে জিনিষ থাকলে প্রকৃতিরাণী সাগ্রহে তাদের সেই সেই প্রচেষ্টায় রসদ যুগিয়ে যান তাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য, এইরকম একটা শুভাশুভ মুহূর্ত্তে পাড়ি জমিয়ে তারা শনৈঃ শনৈ অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন লক্ষ্যের দিকে।

ক্রমশ বুনোরা নিত্য-নূতন জিনিষের আস্বাদ পেয়ে তাদের ব্যবহারিক শৃঙ্খলাদি বজায় রাখ্‌তে দলপতি নির্ব্বাচন, বিবাহাদি প্রথার প্রচলন, ভাবের আদান প্রদানের জন্য সমাজগঠন আরো অগ্রসর হ'য়ে ক্রমশঃ রাজনীতি, প্রাকৃত্য, বিদ্যা, কলাশিল্প, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, দর্শনাদি, আরো কত কি! সেই সঙ্গে এলো ভাষা, তারপর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বেদাদি গ্রন্থের প্রণয়ন, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন, জ্যোতিষ্ক নিরূপণ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু খুঁটী নাটী গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের জীবন যাত্রাকে সহজ ও সরল করবার জন্য, তখনি তাঁরা সভ্য আখ্যাটাকেও গায়ে মেখে নিয়েছিল নিজেদের পৃথক সত্বা বজার রাখতে, যা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে কাল মুচকে হেসেছিল একবার আল আঁটনের বহর দেখে।

এইরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান উন্নতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত তখনকার সমাজের নায়করা বুঝে উঠবার তেমন অবকাশ পান নাই যে, আলোর নীচে আঁধারের মত ভালোর ছায়ায় মন্দও বেশ পরিপুষ্টি লাভ ক'রে চলেছে, দেখলেও তার বিহিত ব্যবস্থা করার হাত যে কারো নেই তাও ঠিক; যাই হোক, তারা স্বাধীন চিন্তার দ্বারা যেগুলিকে সমাজের হিতকারী

বোধে প্রয়োগ করেছিলেন পরবর্ত্তী যুগে সেইগুলিই যে আবার তাঁদের বংশধরদের বন্ধনের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে, ক্ষণিকের জন্যও তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নাই ; তা ছাড়া মানুষের মতই সমাজও যে আবার বাঁচে-মরে তার হ'দিস বোধহয় তখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তাই তাঁদেরও আর বেশী কিছু করবার ছিল না।

পরবর্ত্তী কালে ভালোকে শিখণ্ডি রেখে, সেই ভালোর ছায়ায় (পরিশোধিত ?) পরিপুষ্ট মন্দ, আস্তে আস্তে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠ্‌তে লাগলেন সমাজ শরীরে, কোথাও ধর্ম্মের আবরণে, কোথাও বা কর্ম্মের ভানে ;আর তার আশ্রয় হ'লেন তাঁরাই—যাঁরা তখনকার হর্ত্তাকর্ত্তারূপে অছিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন বংশাধিকার সূত্রে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই সেই অছিত্বের মালেকান সত্ত্ব বজায় রাখতে, অছিরা যে যার অধিকারভুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রগুলির সংস্কারের দোহাই দেখিয়ে চ'ল্লো—নানা রকমের নানা দিক দিয়ে, রীতিনীতির বাঁধন, তারপর সেই জের টানতে,—শুতে-বস্‌তে, হাঁচতে-কাশতে, নাইতে-খেতে পর্য্যন্ত বাঁধনের গাঁট দিতে স্বরু করলে, তাতে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সেখানেও সামনে দাঁড়িয়েছিল ভালোর আলো-করা রূপ ; যার ফলে এখন আমরা দেখতে পাই, কোথাও পৃথিবীর গায়ে আঁচড় টেনে কালনেমীর লঙ্কা ভাগ, যেন তাদের 'বাপ কালে' (পৈতৃক) সম্পত্তি, কর্ম্মের মধ্যে গণ্ডী দিয়ে হ'ল জাতি ভাগ, ধর্ম্মের নামে দলের গণ্ডী দিতে গিয়ে হ'ল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ; এমনিতর আরো কতশত নীতির বাঁধন, রীতির বাঁধন দিতে দিতে যখন মানব-সমাজের কণ্ঠায় এসে সেই সব ফাঁস চেপে ব'স্‌লো,—যাদের নিয়ে সমাজ তারা প'ড়লো মূর্চ্ছিত হ'য়ে, ভুলে গেল তাদের শক্তি-সামর্থ্য, সেই

অবকাশে চোরের দল যা করে, তা যথানিয়মে সম্পন্ন হ'য়ে গেল, সেই একটা যুগ গেছে যাকে আধা অন্ধকারের যুগ বলে, কারণ কিছুকাল যাবৎ সে যুগের আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়না বলে।

ওদিকে যেমন মানব-গোষ্ঠীর হিতকারী প্রথম দল অজান্তে ভালোর ছায়ায় মন্দকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিলেন, এদিকেও ঠিক তদনুপাতে মন্দকারীদের মন্দের অন্তরালে দাঁড়িয়েছিল ভালো তার আলোকরা রূপ নিয়ে, পেঁচার দল তা বুঝে উঠতে পারেনি যে ঐ মন্দের আড়ালে লুকানো আলো একদিন না আর এক দিন তাদের মায়িক তিমিরাবরণ ভেদ করে তাদের কালোরূপটাকে ধরিয়ে দেবে লোকচক্ষুর সামনে, কে জানে সেদিন আসবে কি না ?

এই ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে জগতে কতশত রকমের না ভাঙ্গাগড়া উত্থান-পতন, কত অমূল্য রত্নের সন্ধান, কত আবিষ্কার, কত সংস্কার ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঘটে গেছে, মাত্র তার কয়েকটী ছাড়া কে তার খোঁজ রাখে !

এই রকম কখন আঁধার, কখন আলোর যুগ যাওয়া-আসা করতে করতে সোণার যুগ, রূপার যুগ ও তামার যুগকে পার করে দিয়ে আজ আমরা যে যুগে এসে পৌঁছেচি, এটাকে লোহা বা কাগজের যুগ কিম্বা ঐতিহাসিক যুগ বলে ধরা যেতে পারে। আগে কি ছিল কি না ছিল কে জানে, এযুগে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সঙ্গে আমরা সকলেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও সুপরিচিত, কাজেই তাই নিয়ে বেশী কিছু সমালোচনার দরকার নেই, তবে পর্য্যালোচনা করে দেখা দরকার যে আজ আমরা কোথায় ?

এমনি সহজ দৃষ্টিতে জগতের পানে চেয়ে দেখলে দেখি যে, সত্য-

সত্যই আজ আমাদের মানব-সভ্যতা কতই না উচ্চে, বিজ্ঞান-বলে মানব আজ স্থল, জল, অন্তরীক্ষের মালিক বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, আজ সে স্থল, জল, অনল, অনিলকে বশীভুত ক'রে তাদের আজ হুকুমের চাকরে পরিণত করেছে, পৃথিবীর বুকচিরে বেপরোয়া তার ধন রত্ন (!) আহরণ করে নিয়ে আসছে ! কে কার কড়িধারে, এমনিতর ভাবে আজ তার নিতুই নুতন আবিষ্কার, রীতি নীতির সংস্কার, বিজ্ঞানের জোরে প্রায় প্রকৃতিদেবীর অধিকার বাজেয়াপ্ত, কলকব্জা যন্ত্রপাতির অভিনবত্ব, তারি সঙ্গে আত্মঘাতী হবার,—"থুড়ি" যুদ্ধজয়ের উপকরণ হিসাবে মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন, কবিদের গণ্ডীছেঁড়া নব নব ভাবের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ইত্যাদি কত আর বলবো, এমনিতর কত শত সহস্র রকম ঐশ্বর্য্যে না আমরা ঐশ্বর্য্যান্বিত !

কিন্তু তারপর ?—তারপর একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে ?"—মদগর্ব্বিত মানবের বাহিরের জাঁক-জমকের ফাঁক দিয়ে-ও-কার আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে !

এত শত পাওয়ার স্বার্থকতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আজ সভ্যতম মানব-সমাজ কিসের জন্য বিক্ষুব্ধ, কোথাথেকে আজ অসন্তোষের বিভীষণ হুহুঙ্কার রণিয়ে রণিয়ে উঠছে ? কিসের এ হট্টগোল, আজ কি ভবের হাটে বিকি-কিনির বদলে যে যার দেনা-পাওনার কৈফিয়ত দাবি ক'রে বসেছে না কি ?

যেন মানুষ আজ তাদের এত শত পাওয়ার বাহুল্যতার মাঝখানে হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব কিছু, যার অভাব সে ঠিকঠিক না বুঝলেও এটুকু বুঝেছে যে "কি যেন ছিল তা যেন নেই" যার অভাব কিছুতেই কোন কিছুর বিনিময়েও সে ভুলতে পারছে না। তারি অনুসন্ধানে

কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ সমাজ, কেউ বা অর্থনীতি, কেহ কেহ শিক্ষাদীক্ষার ভেতর—চতুর্দ্দিকেই সাড়া পড়ে গেছে ওলট-পালট করে খুঁজে দেখবার—কোথায় ?—ও কি সে আত্মবস্তু যা আজ তাদের কাছথেকে অপহৃত হয়েছে, কেই বা তাকে লুকিয়ে ফেলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, যার অভাবে আজ মানুষ দিশেহারা, তারি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত জনসঙ্ঘ আজ সংক্ষুব্ধ ও প্রতিকারোন্মুখী, যার ফলে আজ চতুর্দ্দিক থেকে এমন কি প্রত্যেক অনুপরমাণু থেকেও রণিয়ে রণিয়ে উঠছে বিশ্বধ্বংসি বিপ্লবাগ্নি ! এখন কে দেয় সামাল কার রণে ?

জনগণের ঐ রুদ্রমূর্ত্তি আর অছিদের তস্করের ন্যায় অপহরণ বৃত্তি দেখে জীবের কল্যাণকামী মহাপ্রাণ মনিষিগণ যেমন আকুল হ'য়ে উঠেছেন মানুষের ভবিষ্যত পরিণতি কল্পনা ক'রে, আর তার প্রতিবিধান-কল্পে কত ত্যাগ, কত মঙ্গল-বার্ত্তা ঘোষণা দ্বারা আসন্ন কিছুর সম্ভাবনা থেকে সকলকেই প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা ক'রছেন, তেমনি আবার অপরপ্রান্ত থেকে নেয়ে-মাঝিরা সোরগোল তুলে হল্লা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, যে সামাল মাঝি সামাল, ডোবে বুঝি তরী আজ অকূল-পাথারে, আর বুঝি তাদের মাঝিত্ব কায়েমী থাকে না, আর মাঝিত্ব ত দূরের কথা এখন প্রাণ বাঁচান দায়। না থাকারই কথা, এত দিনের যত সব জীর্ণ-শীর্ণ তরীগুলির উপস্বত্ব ভোগটাকে যারা কায়েমী কিছুর মধ্যে ধরে নিয়েছিল, জীর্ণ সংস্কার ব'লে যে একটা কথা আছে তা তাদের খেয়ালই ছিল না, ঝড়-তুফানে, তাদের তরীগুলিই যে আগে বানচাল হবে সেত জানা কথাই, জল ছেঁচে তাকে অকূলে বাঁচান চলেনা, সে চেষ্টা বৃথা-চেষ্টা, কি বল ? বরং মায়া কাটিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে তবু কতকটা জোঝবার সময় পেতে পারে এই না ?

এখন মোটের উপর দেখে শুনে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, যে সকলেই "আপন হারায়ে দিশেহারা," আর ঐ সোরগোলের মধ্যে কে কার কথা শোনে, কে কার কড়িধারে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই আত্মহত্যা-কারী, সকলেই আত্ম-প্রবঞ্চক, সকলেরই সকলের উপর অবিশ্বাস, সকলেই স্বাধীনতার নামে আত্মবিক্রীত, প্রতিভার স্থলে আত্মবিস্মৃত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে রয়েছে ব'লে মনে হয়।

এত কিছু পেয়েও কেন এমন হল তার কি কিছু কারণ নেই ? কারণ যে যথেষ্টই আছে তা অনেকেই জানে ও বোঝে ; কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্যরকম, এখন যারা জানছে ও বুঝছে তারা বেমালুম কীল চুরি করে বসে আছে পাছে তাদের কল্পনায় গড়া সৌধগুলি ভূমিসাৎ হয়ে যায়,—ফুরিয়ে যায় তাদের মালেকানি। বাহিরে থেকে যারা একটু আধটু ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝেন, তাদের মুখ রেখেছি তালাবন্ধ করে, পাছে কারো মুখ খোলা থাকলে তাদের ফুঁয়ে অছিদের ফুসের ঘর হুস করে উড়ে যায়, এই না হ'ল কথা ?

যাক্, ওসব নিয়ে বেশী কিছু বলা কওয়া ভাল নয়, বলে—"পড়লো কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে"—এখনই হয়ত কে কোথা থেকে ঘুঁসি উঁচিয়ে তেড়ে আসবে তার চেয়ে চুপই ভাল। তবে যা বলবার জন্য এতটা এগুনো গেছে অর্থাৎ আমাদের নজির বহাল রাখতে যতটুকু না বল্লে নয় সেটুকু কোন রকমে ঠারে-ঠোরেও ত বলতেই হ'বে নাচার হয়ে, আর সংক্ষেপ করা নিয়ে মাভৈঃ! সে'ত বলাই আছে।

আচ্ছা এইবার এক এক করে দু'চারটে বিষয়ের কৈফিয়ত টেনে দেখা যাক্—সেই সেই বিষয়ে এখন আমাদের অবস্থিতি কোথায় ? যেমন

প্রথমেই ধরা যাক ধর্ম্ম, যার হেঁচকা টানে ছোট বড় সকলেরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কি সে চিজ্—?

ধর্ম্ম বলতে পণ্ডিতরা যে মানে করে গেছেন তার অর্থ হচ্ছে—যে যাকে ধারণ ক'রে রাখে সেইটাই তার ধর্ম্ম; যথা—একটা বাড়ীর থামের ধর্ম্ম হচ্ছে ছাদটীকে ধরে রাখা—যাতে না ছাদটী খেয়াল মত আশ্রিতদের মাথার উপর নেমে এসে আলিস্যি রাখেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে ধর্ম্ম মানে কি? এক কথায় তার উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, যা মানবের মানবত্বকে ধারণ করে রাখে! তখন হয়ত আবার প্রশ্ন হবে, কি সে বস্তু, যা দিয়ে মানবের মানবত্বকে ধারণ করে রাখা যায়? তখন সাদা কথায় বলতে হবে যে তোমরা যে ধর্ম্মঠাকুরটীকে যার যে ভাবে ইচ্ছা সাজিয়ে নিয়ে কারবার সুরু করেছ সে কিন্তু ঠিক তা নয়; প্রকৃতির ধ্বংস ও রক্ষা করার কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম বা আইন-কানুন আছে তার মধ্যে থেকে যে যে নিয়ম বা আইন কানুন জানা থাকলে আত্মধ্বংসীতার হাত এড়ান যায়—সেই নিয়ম ক'টী পালন করাই এখানে ধর্ম্ম। আর সেটা হচ্ছে সমগ্র মানবগোষ্ঠীরই সম্পত্তি; কোন বিশিষ্ট জাতি, দেশ বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব নয়, আর সে সব আইনকানুন গুলা যে-কোন দেশ জাতি, বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়ে থাক না কেন তার উপর ওজর আপত্তি কারো থাকতেই পারেনা। কারণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এটা যে কোন দেশের, যে কোন জাতির বা যে কোন সম্প্রদায়ের লোকে আবিষ্কার করে থাকুক, তা জানবার তত দরকার হয় না—যতটা দরকার থাকে ওই জানা ও মানা নিয়ে! না জানার দোহাই দেখিয়ে হাজার হাজার স্তব-স্তুতি পাঠ করলেও প্রকৃতির কঠিন নিয়মে আগুনের বাবারও সাধ্য নেই যে

তাকে সে রেহাই দেয়, প্রতিফল তাকে হাতে হাতেই পেতে হবে। এই যে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত এড়িয়ে চলা বা বাঁচার হদিস, এটাই হচ্ছে ধর্ম্ম; তবে এ বাঁচা-মরাটা আমাদের তথা-কথিত বাঁচা-মরার থেকে একটু পৃথক ভাবে, অর্থাৎ এদের, মানুষদের এখন যে অবস্থা এ ত জ্যান্তে মরা অবস্থা—ভূতের তাণ্ডব লীলা ছাড়া এঁদের বাঁচার মত কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। তাহলে এখন আমাদের যা ধর্ম্ম তাকে ভূতের ধর্ম্ম ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

এখন আমাদের যা ধর্ম্ম দাঁড়িয়েছে তা কি সুন্দর আর মনোজ্ঞ! ঈশ্বর হ'য়েছে ঘুষখোর, কেউ একবার হাত জোড় করে, কেহ বা হাঁটু গেড়ে, কেহ বা হাত-ফেলাও ক'রে, আবার কেউ বা চোখ বুজে আকাশপানে চেয়ে খোসামদ তোবামদ করলে তার সাত খুন মাপ, সব দোষ থেকে রেহাই। তবে বেটা যেমন ঘুষখোর এদিকে আবার তদতিরিক্ত নেম্‌ক-হারাম, সিন্নিও খায় আবার ভরাও ডোবায়; তাই দেখে কতকগুলা সেয়ানা লোক ক্রমশঃ ছোট ছোট ঠাকুর দেবতাদের দোর ধরেছে, মানসিকও তাতে কম লাগে; আর হাতে নাতে কাজ পাবারও বিশেষ সম্ভাবনা।

তারপর!—তারপর হয় হাহুতোহস্মি! সে ত আছেই, তবুত মনকে প্রবোধ দেবার মত একটা কিছু চাই, না হলেই বা বেচারারা দাঁড়ায় কোথায়! দেখতে পাওনা, জন্তু-জানোয়ারগুলা ঠাকুর-দেবতা মানেনা ব'লে যমের হাত এড়াতে পারে না, বা দল বেঁধে কামড়াকামড়ি ও খেয়োখেয়ী করতে পারে না! আর সুখ দুঃখ সেত ভাগ্যের কথা, ধর্ম্মা ধর্ম্মের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে! আরো একটা কথা ধর্মের সবই ভাল, দেখতেও ভাল শুনতেও ভাল, কিন্তু তার হুট্‌কো স্বভাবটাই সবচেয়ে

মারাত্মক ব্যাপার, তাই ধার্ম্মিকরা আজ-কাল তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে, একটু চাল-বেচালেই নাকি তার জাতঃপাত হয়। দেখে শুনে মনে হয় ধর্ম্ম বেচারা যে জন্যই সৃষ্ট হয়ে থাক এখন বেচারাকে বুড়ো বয়সে অধর্ম্মের ভোগে পড়তে হয়েছে ; তারপর বুড়ো হওয়াতে অথর্ব্ব হয়ে পড়ার দরুণ, সব যায়গায় যাওয়া আসার অভাবে অনেক স্থলে ত তার কুশ-পুতুল দাহ করে তার শ্রাদ্ধ-শান্তিও ক'রে চুকেছে, বিশেষ যারা এক সময়ে তার রক্ষক ছিল সঞ্চিত অপহরণের জন্য তারা ত বহুদিন পূর্ব্বেই ধর্ম্মের কণ্ঠনালীতে হস্ত-প্রদান ক'রে তাকে কুম্ভক-যোগারূঢ় করিয়ে কি একটা কার্য্য সমাধা করে চুকেছে ; এখন কেন আর তোমার ছায়া-মূর্ত্তি নিয়ে, হে ধর্ম্ম ! তোমার অনুচর-বৃন্দকে সন্ত্রাসিত করে তুলছ ? (অনুচর এই জন্য বলছি যে তারা তোমাকে পারে রাখতে এসে তারাই তো আগে পেরিয়ে পড়েছে) এখন বলে দাও তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা,—যুক্ত-বেণীতে, না মুক্তবেণীতে, না গয়া ক্ষেত্রে ! আজকাল রেলের পথ, যেখানেই হোক, একবার খপ ক'রে গিয়ে শুধু তোমার কেন তোমার চৌদ্দপুরুষেরই ব্যবস্থা ক'রে আসবো বংশ পরম্পরায় সে অধিকার আমাদের নিশ্চয় অর্শেচে। দোহাই ধর্ম্ম ! তোমার ও প্রেত-মূর্ত্তির উপসংহার কর,—নিতান্তই এদের মায়া না ছাড়তে পার তো আবার এসে জন্মাও, তোমার কল্যাণে অষ্টাহের দিন আমাদের মিষ্টি মুখ' হ'য়ে যাক। এই হল এখনকার দিনের পাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ মাত্র উনিশ-বিশ।

তারপর (তার) সমাজ ; এ বস্তুটীর প্রথম পত্তনের মূল মন্ত্র ছিল "তোমরা পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর"—এই ছিল সমাজের ভিত্তি। তার মধ্যে যাদের হেপাজাতে ছিল শিক্ষা বা বুদ্ধির বোচকাটী তাদের ক্রমশঃ বুদ্ধির জট খুলতেই বুঝলে, বুদ্ধি জিনিষটা বাজে-

খরচ করাটা যুক্তি যুক্ত নহে, অমনি শাস্ত্রে তার বয়ান লেখ। হ'ল যে ও বস্তুটী অপাত্রে দান নিষেধ, তাতে নরক ভোগ হয়, তবে সৎপাত্রকে যে যা পারে দিয়ে যাক, তাতে সৎপাত্রেরা সন্তুষ্ট হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করলেই অপাত্রেরা সদ্য-সদ্য স্বর্গে চলে যাবে, তার বেশী তাদের আর কিছু করবার দরকার হবে না, অর্থাৎ ফলে দাঁড়াল "তুমি দিতে থাক আমি খেতে থাকি"।

স্বর্গলাভ হ'লে পর তার সপিণ্ডকরণের এক প্রথা আছে, তারও ফর্দ্দ সংস্কারের ছায়ায় বসে যথাবিধি তৈরী হ'তে থাকলো ; উদাহরণ স্বরূপ দু'-একটী ধরা যেতে পারে যেমন, আচারের বন্ধন, বিচারের মুণ্ডন, মাৎস্যন্যায়ের লুণ্ঠন, তারপর তোমাতে আমাতে আলাদা থাকবার বিধান ইত্যাকার আর কত বলবো। ঐ একই জিনিষ কোথাও উনিশ আর বিশ ভাবে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে যা দাঁড়িয়েছে তাকে হালফ্যাসানের সমাজ বলা যেতে পারে। আদান প্রদান প্রথায় পুরান অকেজো-সমাজ আর আজকের সমাজ—আকাশ পাতাল তফাৎ, তা' ছাড়া ভারতের স্বাতন্ত্র্য আরো কিছু বেশী। পুরাকালে কে-মাত্র একজন কালিদাস জন্মেছিল, যার গর্ব্বে তখনকার দিনের লোক মহা গর্ব্বিত ছিল, আর এ যুগে যে জনা-সুদ্ধীই কালীদাস হয়ে জন্মেছে অর্থাৎ তারা যে ডালে বসে থাকে সে ডাল কাটতে তাদের কোন দ্বিধাই থাকে না ; ঠিক তেমনি-তর কে একজন দাতাকর্ণ ছিল সে যুগে, যে তার নিজের ছেলের মাথা করাত দিয়ে কেটে অভুক্তকে পারণ করিয়ে নাম কিনেছিল, আর এখন যদি কেউ চক্ষুস্মান থাকেন তিনি দেখলে দেখতে পাবেন যে এরা আরো কত উচ্চে, অর্থাৎ এ যুগের এঁরা প্রত্যেকেই নিজের মাথা নিজে খান, এঁরা এখন ছিন্ন-মস্তার উপাসক কিনা ? তখনকার সভ্যতা ছিল অন্তরে লুকান, আর আমরা

তাকে টেনে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি, আর এমনি প্রকট করে তুলেছি যে, একটা ছোট ছেলেও তা অনায়াসে অনুধাবন কর্ত্তে পারে; সে যুগের আর এ যুগের পাত্রের সমাজে ঢের তফাৎ।

কারো কারো হয় ত কথাগুলি গায়ে বাজবে, অমনি তিনি উচ্চপুচ্ছে তালঠুকে তেড়ে আসবেন, যে, তুমি ও সব কি বোঝ হে বাপু, ও সবের বিশেষ বিশেষ দরকার ছিল, তা না হ'লে কোথায় তলিয়ে যেতে তার কিছু ঠিক ঠিকানা ছিল কি?

না না ঝগড়ার কথা নয়, আর দরকার যে ছিল তা নিশ্চয়ই; কারণ জগতে অকেজো কোন জিনিষই আজ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই, তা এতো কাজের লোকেরা নিজে থেকেই গড়েছিল, সে কথা নয়—তবে কিনা আজকাল সকলেরই প্রায় অরুচির মুখ, একটু আধটু অম্ল মধুর রসের সমাবেশ না থাকলে কেউ হয় ত মুখেও করবেন না। তবে আরো একটা কথা এ সব লেখায় আমাদের এখনকার সমাজের কোন লোকেরই গায়ে না লাগাই উচিত কারণ এ সবের সুত্রপাতটাই হয়েছে মানবত্ব নিয়ে, এ যুগের আমরা ত তাকে ছাড়িয়ে চলে এসেছি, অতএব ওসব আঁচ আমাদের সেধে গায়ে না মাখলেই চুকে গেল; তা ছাড়া এতদিন ধরে অনেক শক্তির পাদস্পর্শে আমাদের গায়ের চামড়া একটু কড়া হওয়াও ত' উচিত, অবশ্য গণ্ডারের মত অত শক্ত না হোক কথার আঘাতে যে কিছু হবে না তার হাত থেকে রক্ষা পাবার মত নিশ্চয়ই হয়েছে; অতএব হে সাধু, মাভৈঃ!

তারপর তার রাষ্ট্রনীতি।

এ এক এখনকার দিনে মহামারী ব্যাপার, বিশেষ করে তোমাদের বা আমাদের দেশের, ভারতের কারো বেশী কিছু বলবার যো নাই,

অর্থাৎ ঐ অদ্ভুত বস্তুটী এখন প্রায় সর্ব্বত্রই আইনের গণ্ডীতে আবদ্ধ, যদি কাহাকেও কিছু এ সম্বন্ধে বলা কওয়া করতে হয় তবে তাকে আইনের গণ্ডীর বা'র দিয়ে চলতে হবে, আমাদেরও তাই বে-টক্কর পা পিছলে যাওয়ার দরুণও যদি গণ্ডী-স্পর্শ দোষ ঘটে তা হলেও ব্রাহ্মণের চণ্ডাল-স্পর্শে জাতঃপাত হওয়ার ন্যায় জাতঃপাত ত' অবশ্যম্ভাবী —তা ছাড়াও উপরিলাভের আশা যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে। অথচ এই পিছল রাস্তাটুকু যে এক লাফে ডিঙিয়ে চলে যাবো ভগবান সে উপায়টুকুও রাখেন নাই, ক্রমবিকাশের অজুহাত দেখিয়ে সে সম্পত্তিটুকুও নাকি অনেকটা অনেকদিন বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন, আজকালকার দিনে সে যে কত কাজে লাগত' তা আর কে বুঝবে, অন্ততঃ ট্যাক্সের হাত যে এড়ান যেত তার আর কোন ভুল নেই।

এদিকে আবার এতটা এগিয়ে ফিরেই বা যাই কোথায় ? আর লোকেই বা বল্‌বে কি ?—যাই থাক কপালে, আমরা কতবড় বংশের সন্তান, কাপুরুষতা আমাদের সাজেনা। তবে, তবে কিনা,—দোহাই মা "সুবচনী"! বচনটাকে একটু সংযত রেখো মা! একবার এই সঙ্কট কোন রকমে পার হ'তে পারলে তোমাকে হয় কলা, না হয় অগত্যা জোড়া হাঁস দেবই দেব! দেখো মা—যাক্ হ'য়েছে, মা আমাদের সাক্ষাৎ অন্তর্যামী কিনা! ডাকতে না ডাকতেই মা আমার পাস কাটিয়ে যাবার একেবারে সিদে হ'দিস বাতলে দিয়েছেন। আর তোমাদের তো' এসব জানাই, তাহলেও মনে মনে যার যা আছে থাক্ তাতে নাকি দোষ নাই, যত দোষ ফুটলে হয় ; সেখানে রাজা আছে, প্রজা আছে, আইন আছে, সমাজ আছে, সকলেরই জিহ্বা তখন লকলকিয়ে উঠবে, সাধে কি আর বলছিলাম যে এযুগে লাঙ্গুল বস্তুটী থাকলে বড়ই উপকারে লাগত, সেটী

খসে যাওয়াতে পরস্পর পরস্পরের খাদ্যাখাদ্যের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক্ চল, আর এইটুকু পার হয়ে গেলেই আমরা প্রায় হেরাহেরি হয়ে পড়বো, তারপরে আর কি, ঐ প্রান্তরটা,—সে যায়গা নেহাত মন্দ লাগবে না, আর এইটে পেরিয়ে গেলেই দেখা যাবে, যেখানে নীলের গায়ে নীল ঢলে পড়েছে সোহাগীর মতই, চল একটু টেনে আর এটুকু পথ বৈত নয়। যাক্ ও সব বাজে কথা, আমাদের যা কথা হচ্ছিল, তাই সুরু করা যাক্। এমনি একটা প্রবাদ কথা চলে আসছে যে সত্য যুগের লোকেরা সকলেই নাকি ব্রাহ্মণ ছিল, অথচ সকলেই ব্রাহ্মণ থাকলে তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কথাটার ব্যবহার করার দরকার হত না। তাতে মনে হয় কি? যে এক সময় জাতি বিভাগ ছিল না, তারপর পরস্পর কাজের বিশৃঙ্খলা দুর করবার জন্য বোধ হয়, নিজেদের মধ্যে যে যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম্মগুলা ভাগ যোগ করে নিয়েছিলেন; যাঁরা তার মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ—গুণানুসারে, (ব্রহ্ম-বিদ্ ছিলেন বলে), যাঁরা রক্ষা কার্য্যে ব্রতী হলেন তারা হলেন ক্ষত্রিয়, আর যাঁরা কৃষি, শিল্প, কলা, বিনিময় ও বহির্বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করলেন তাঁরা হলেন বৈশ্য, তদতিরিক্ত সমাজ-শরীরে যে অংশটী বাদ পড়ে রহিল, ঐ তিন ঘরকে সাহায্য ও সহকার্য্যের দ্বারা নিজেদের উপযুক্ত করে নিতে পারে তাদের সহজ নাম হল শূদ্র। (যার অভিব্যক্তি সব সভ্য-সমাজেই বর্ত্তমান রয়েছে, তবে এমন করে নামকরণ করে নয়। শুধু ঐ নামকরণ করার দরুণ এ দেশের সমাজ পরে যে বিষময় ফল প্রসব করেছে, তার প্রতিফল ভারত আজ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে।)

এইরূপে যে সমাজ-শরীর গড়ে উঠেছিল, সে আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হ'লেও তবুও দ্বন্দ্বের একটা অবকাশ ফুটে উঠতো তাই যাতে রসক্ষারী

কেন্দ্রত্রয় কোন কারণে স্বার্থান্ধ হ'য়ে সমাজ-শরীরকে পরে উৎকণ্ঠিত করে না তোলে, তারই প্রতিকার কল্পনায় সমাজ-শরীরের মস্তক স্বরূপ একটী কেন্দ্র বা রাষ্ট্রনায়কের পরিকল্পনা করে নিতে হয়েছিল, তাই একটা প্রবাদ বচন আছে যে প্রথমে যিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিলেন তাঁর নামকরণ হয়েছিল পৃথি, তা থেকে আমাদের এই সসাগরা বৃহৎ দেশটীর নামকরণ হয়েছিল পৃথিবী ব'লে।

সমাজ গ'ড়ে উঠবার পর যে রাষ্ট্রীয়-শক্তির পরিকল্পনা হ'য়েছিল ;— চণ্ডীতে তার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ তার একট উপাখ্যানের মর্ম্মাংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেখান যেতে পারে। আর চণ্ডীকে এ বিষয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ এইজন্য ধরা যেতে পারে যে উহাই এতদবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তারও কারণ এই যে মানব সমাজ-সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে প্রথমে তারা দৃশ্যমান সহজবোধ্য দেবতারই উপাসনায় রত হয়, তারপর যখন দেখে এই পঞ্চ-দেবতারাও পরস্পর স্বাধীন নয় এঁদের পিছনে একটা নিয়ন্ত্রনী শক্তির খেলা রয়েছে, এই 'শক্তিই' হচ্ছে চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়। সভ্যসমাজ এই শক্তিকেই কোথাও ঈশ্বর, কোথাও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে উপাসনা ক'রে থাকে, অর্থাৎ আমাদের উপাসনাদি যা কিছু এঁরই উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, কাজেই উহা বেদান্ত দর্শনাদি সৃষ্ট হবার যে বহু পূর্ব্বকার গ্রন্থ তা নেহাতই অসংলগ্ন কথা নয়, কারণ বেদান্ত যা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, ওপর ওপর (ভাসা ভাসা) বিচারে, দুই এক স্থলে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান রয়েছে, অর্থাৎ বেদান্ত যা নিয়ে বিচার করেছে যে জ্ঞানের শেষ বার্ত্তা হচ্ছে "পূর্ণমদ পূর্ণমিদং"—ইত্যাকার ; আর—অপরটিতে পাই—তুমি পূর্ণ আমরা অপূর্ণ, অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রের সম্পর্ক, আর তা

ছাড়া বেদান্ত কথার মানেই হচ্ছে যা শেষে বলা হয়েছে। তা সে যাই হোক, আগেরই হোক আর শেষেরই হোক; তার উপাখ্যানের মধ্যে থেকে এই পাই যে,—এক সময়ে কোন এক অসুরের দ্বারা দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গপুরী আক্রান্ত হয়েছিল, দেবতারা তাই দেখে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন, তখন যে যার পৃথক্ পৃথক্ বিশ্বধ্বংসী শৌর্য্যবীর্য্য নিয়ে পালা করে অসুরকে আক্রমণ করতে গেলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতাদের পৃথক্ পৃথক্ বিশ্বধ্বংসী শক্তিকে অসুর অবলীলাক্রমে একে একে প্রশমিত বা পরাজিত করে ফিরিয়ে দিলে, স্বর্গরাজ্য অসুরের অধিকার ভুক্ত হয়ে গেল।

অসুরযুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত হয়ে দেবগণ তাঁদের অধমতারণ মন্ত্রী পিতামহের (ব্রহ্মার) শরণাপন্ন হ'য়ে স্বখেদে নিবেদন জানালেন যে, হে প্রজাপতে! হে বরদ! বৃথাই তুমি আমাদের দেবত্বের অধিকারী ক'রেছ, যে শক্তি দিয়ে তুমি বড়াই করে বলে দিয়েছিলে যে আমরা যে যার ক্ষমতা বলে বিশ্বধ্বংসে বা নিয়ন্ত্রণে সমর্থ কিন্তু এক অসুরের বিক্রমের কাছে সেই সব অপরিমেয় শক্তি আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিরর্থক। এখন বলুন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

দেবগণের অভিমান ভঙ্গ করে ব্রহ্মাঠাকুরটি তখন স্মিতহাস্যে বুঝিয়ে বলে দিলেন যে, হে বৎসগণ, তোমরা যে বিশ্বধ্বংসী শক্তির অধিকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে অসুরও নেহাৎ তাচ্ছিল্যের পাত্র নহে, তা তোমরা নিজেরাই ভাল জান। তাহলেও অসুর যাতে ধ্বংস হয় তার সুযুক্তি আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তাই তোমরা করগে, তাতে অসুর নিশ্চিত পরাজিত হবে। তোমরা সকলে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে যে যার শক্তির অংশ দিয়ে একটী কেন্দ্রীয়

শক্তির প্রতিষ্ঠা করগে, তাতে যে মহাশক্তির আবির্ভাব হবে, সেই মহাশক্তিই অসুরকে প্রশমিত করতে সমর্থ হবে, তাঁকে পরিচর্য্যার দ্বারা তুষ্ট রাখলে, বরদরূপী সেই মহাশক্তি তোমাদের সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট দান করবেন। এই হ'ল রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের পরিকল্পনা, উদাহরণ আরোও পাওয়া যায়।

ভারতের রাজনীতিক গগনে কতরকমের যে লীলা খেলা হ'য়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই, যেমন উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে "গাণপত্য" "সারোদোৎসব" "বসন্তোৎসব" ইত্যাদি আজকাল এগুলি তথাকথিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব'লে পারগণিত, কিন্তু এর মূলে অনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম নাই, আছে রাজধর্ম্ম।

সে কোন্ যুগের কথা তা হ'য়ত কেউ আমরা জানিনা, তবে এমন দিন ছিল যখন এদেশের প্রত্যেক নরনারীকে কোন শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে গণদেবের পূজা দিতে হ'ত,—এ দেশের ধাতই হচ্ছে সব জিনিষটাকে ধর্ম্মানুমোদিত ক'রে নেওয়া, তার প্রতীক দরকার; কবি তার রূপ কল্পনা ক'রলেন যে সে ঠাকুরটার মাথাটা হ'চ্ছে হাতীর মত, শুণ্ড সম্বল (শক্তির পরিচয়) ক্ষুদ্র চক্ষু (অর্থাৎ দেখে কম)—শ্বেতবর্ণ—(অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রং এর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র), দেহটা হ'চ্ছে মানুষের মত (মানুষের ঠাকুর ব'লে) আর—তার দেহের রংটা হ'চ্ছে লাল (অর্থাৎ সৃষ্টি শক্তি সম্বলিত)— তার চারটা হাত, বর, অভয়, শঙ্খ (মঙ্গল) পদ্ম (জ্ঞান); এই নিয়ে জগতকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলাবিদের তুলি নেচে উঠলো,—তুলির টানে কবির গণদেব শেষে যখন ছবিতে বেরুতে লাগলেন, তখনই যে তাঁর বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠলো, তা আজ আমরা এ যুগে ব'সেও অনুমান ক'রে নিতে পারি;

আর তার সমাধি হ'য়েছিল তখনি যখন ভক্তেরা তাকে পূজার প্রতীক ক'রে চালকলা দিয়েই তৃপ্তি হ'য়েছিল। এখন সেই গণদেবের পরিণতি দোকানি পশারীদের দোকানে ব'সে সকাল সন্ধ্যায় ধূনোর ধূমপান।

যাই হোক দেশ থেকে কবে যে গাণপত্যদের প্রভাব অন্তর্হিত হ'য়েছিল, তার কোন হদিস্ নেই। তারপর তাঁকে বাংলাদেশে এসে মায়ের আঁচল ধরে বেড়াতে দেখতে পাই. সঙ্গে আরো গুটীকয়েক ভাইবোন, একেই "শারোদোৎসব" বা "বসন্তোৎসব" বলা হ'য়েছে,—বা "শক্তিপূজা"।—

এই উৎসবের কেন্দ্রীয় মূর্তি হচ্ছেন "শক্তি" (জনপ্রকৃতি কেন্দ্রীয় শক্তি) এ প্রতীকে দেখানো হ'য়েছে যে প্রকৃতি রাণী (জনপ্রকৃতি) দশ হাতে দশ প্রহরণ ধ'রে, অসুরকে (স্বার্থ বাদীকে) দমন ক'রছেন পদতলে পশুশক্তি অসুর আক্রমণার্থে নিয়োজিত, দুই পার্শে লক্ষ্মী ও সরস্বতী (ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা) আর লক্ষ্মীর পাশে গণপতি (এখানে আর গণদেব নয়) ও সরস্বতীর পাশে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় (কীর্ত্তিকাগণ পালিত চিরকুমার)।

বাংলার জল হাওয়ায় কবে যে এই রকম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, আর কবে যে অন্তর্হিত হ'য়েছে আগেরটীর মত এরও কোন ঠিকানা নাই, যা আছে সে ওই গাণপত্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মতই তান্ত্রিকদের একটা অনুষ্ঠান মাত্র, তবে তার প্রতিমাখানি বৎসরান্তে একবার বাংলায় আসেন ভক্তদের ভণ্ডামীর উপহার নিতে।

তা ছাড়া আরো একটি মূল কারণ ছিল বোধ হয় যে,—পাছে সমাজ-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি, কোন্ দিন না ব'লে বসে যে—"আমি শুধু খেটে মরি, পেট বসে খায়"; তারই প্রতিবিধানের জন্যে,—অর্থাৎ আমার

শরীরের যে কোন একটি অংশকে যেমন, আমি ছোট বড় বলে ভাবতে পারি না—প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমার কাছে সম আদরের ও যত্নের সামগ্রী ; অতো কথা কি, শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুগুলিও অন্ন, রসাদি অভাবে যাতে শীর্ণতা প্রাপ্ত হ'য়ে সমষ্টি-শরীরকে দুর্ব্বহ ক'রে না তোলে তার দিকে স্বতই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন থাকি, ঠিক সেই মতই সমাজ-শরীরের শীর্ষে রাষ্ট্র-শক্তির পরিকল্পনা দরকারী বলে অনুভূত হয়েছিল যাতে সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুগুলি পর্য্যন্ত দৈহিক ও মানসিক খাদ্য সরবরাহে বঞ্চিত না হয়, কিম্বা কেহ স্বার্থান্ধ হ'য়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে সমাজকে ক্ষিপ্ত না করে—মোটের উপর যাদের শক্তির অংশ নিয়ে তাঁর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব, তাদের বা ব্যষ্টির মর্য্যাদা অর্থাৎ মানবত্ব কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হবার অবকাশ না থাকে এইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ননীতিই ছিল রাজনীতি।

তারপর লোক-পরম্পরায় যা হয়ে আস্‌ছে এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না অর্থাৎ অস্তিত্বের কায়েমী সর্ত্ত বজায় কর্ত্তে সমাজের অন্যান্য বিভাগ যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল তারি ছোঁয়াচ লেগে ইনিও সংক্রামিত হয়ে পড়লেন। সমাজ-শরীরের এই সংক্রামক-ব্যাধিকে "পরীক্ষিত" ব'লে একজন রাজা ধরে ফেল্লেন. সমাজ-শরীরের এই রোগের নাম ছিল 'কলি' অর্থাৎ পাপ, বা সাদা কথায় আমরা যাকে দুর্ব্বলতা বলি। রাজা পরীক্ষিত উহার উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসংকল্প হ'লে পর 'কলি' বিহ্বল-চিত্তে রাজার শরণাপন্ন হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তে লাগলো, আর তাঁকে জানালে যে, হে রাজন্! আমি কালক্রমে অর্থাৎ লোক সকলের গতির অনুপাতে তাদের কর্ম্মফল থেকে জন্ম গ্রহণ করেছি অতএব আমিও তোমার একজন শরণাগত প্রজা ; আমাকে একেবারে

ধ্বংস কর্ব্বেন না, যখন আমার জন্ম অকারণে নয় বরং আমাকে এমন কোন স্থান নির্দ্দেশ করে দিন যেখানে মানবের গতি-বিধির কোন সম্ভাবনা নেই। রাজাও তার কথাকে যুক্তিযুক্ত মনে ক'রে, স্থান নির্দ্দেশ করে দিলেন যে, তুমি অর্থ, মদ্য ও কামিনীতে অবস্থান করগে. যারা কাল-প্রেরিত হ'য়ে ঐ তিনের সেবা কর্ব্বে তারা আকারে মানব হ'লেও মানব নহে অতএব তারা আমার শাসনাধিকারের বাহিরের জীব ; তুমি তাদের অধিকার কর্ত্তে পারো।

হায়রে মানবের পরিকল্পনা ! যা নিয়ে বা যে কয়টির জন্যে এ যুগের আমাদের সব কিছু, যে কয়টি আমাদের যুগের পরমার্থ, যা নিয়ে সভ্যতা সেইগুলিকে বাদ দিয়ে সে যুগের মানব-সভ্যতা কি করে যে গড়ে উঠেছিল তা সেই অলক্ষ্যের দেবতাই জানেন ; আমাদের ধারণাতে সেটাকে বর্ব্বরজাত ছাড়া আর কি যে বলা যেতে পারে তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

এই সব দেখে শুনে মনে হয় যে তখনকার যুগের মানুষরা অন্তত এই রূপই রাজশক্তির বা কেন্দ্রীয় শক্তির পরিকল্পনা কর্ত্তো, কার্য্যত কি ছিল না ছিল তা ঠাকুরটিই জানেন।

তবে এখনকার দিনের রাজনীতিতে কি যোগ-বিয়োগ হয়েছে, সেইটুকু একটু উপর-উপর দেখে নিতে পাল্লেই আমাদের এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়ে যায়—দেখা যাক্ কি পাওয়া যায়. যা বল্‌তে কোন দোষ-ঘাট হ'য়ে পড়বে না।

আগেকার রাজারা কি ছিল না ছিল, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ যখন কিছু নেই, তখন সে যা ছিল তাই ছিল। এখনকার রাজারা যে যার রাজা হয়েছে নিজ নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করে ; অতএব তাদের

প্রজার প্রতিভূ বলা চলে না, কাজেই রাজা প্রজার সম্বন্ধ ও একসূত্রে বাঁধা নয়, তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে যে যোগ-সূত্রটা আমরা দেখ্‌ছি সেটা আকস্মিক ব্যাপার, তার উদাহরণ স্বরূপ একটা বহুদিন আগেকার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সে আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা, একদিন "বঙ্গবাসী" কাগজে "ষাঁড়ে-কুমীরে লড়াই" বলে একটা শিরোনামা দেওয়াছিল, তার ব্যাপারটা হ'চ্ছে কি—মেদিনীপুর জেলায় কোন এক জমিদারের বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ষাঁড় রূপনারায়ণের বাঁধের খোঁটায় চেন দিয়ে বাঁধা ছিল, ইতিমধ্যে জল-দেবতা কুমীর প্রভু ষাঁড়ের নধর-কান্তি দেখে বোধ হয় তার প্রেমে পড়ে যান, সেই প্রেমের টানে তিনি নিঃশব্দে ডাঙ্গার উপর উঠে ষাঁড়ের খোঁটাটি দাঁতে করে উপ্‌ড়ে নিয়ে অতি সন্তর্পণে তাকে নদীর গর্ভের ভিতর এনে ফেলে। এতক্ষণ ষাঁড় দেবতাটির কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না যে সে কোথায় চলেছে—তার লক্ষ্য ছিল ঘাস খাওয়ার উপর, সে যতক্ষণ তা পেয়েছিল, ততক্ষন তার কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তারপর যখন নদীগর্ভে গিয়ে পড়েছে সেখানে তার মুখরোচক বস্তুটির অভাব দেখে তখন তার বোধ হয় হুঁস্ হোল যে সে এ কোথায় এসে পড়েছে। ততক্ষণে জল দেবতাটি তাঁর কোটে পৌছে গিয়েই একেবারে জোর টান, তখন ষাঁড় টের পেল সে কোথায় বা কার কবলে। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে এক চোঁচা দৌড় মারলে, ফলে দাঁড়াল কি, যে খোঁটাটি জল দেবতার মুখে ছিল সেটি গেল, কুমীরের গলায় আটকে, তাই নিয়ে ষাঁড়ে-কুমীরে নাকি আধ ঘণ্টা টানা হেঁচড়ার ফলে উভয়ের যোগ সূত্র সে চেনটি সেটি গেল ছিঁড়ে তখন যে যার আস্তানায় ফিরে গেল ফলে পাঁচ-সাত দিন পরে "ষাঁড়টী ত" মারা গেল, তারই কিছুদিন

পরে আরো খবর বেরুল যে কয়েক মাইল দূরে কুমীরটা'কেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তার গলায় তখনও নাকি সেই খোঁটা-বড়শীটি আটকানো ছিল- মায় চেন সমেত। এখনকার পৃথিবীর যা রাজনৈতিক অবস্থা এ ঠিক্ ঐ "বলিবর্দ্ধ ও কুমীরের" অনুরূপ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

এ কথায় কেউ যেন না মনে করেন যে এতে রাজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করা হ'চ্ছে, সে না হয় এদেশের বেলায় খাটে, কিন্তু অন্যান্য দেশ ত তাদের নিজেদের দেশ, সেখানেও যে তাই হ'চ্চে তাহ'লে একথা বলার মানে কি? তার অর্থ হচ্ছে যে, যে দেশের রাজশক্তি যে যে গুণ বিশেষের কদর করে, জনসাধারণ বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করেই সেই সেই বিষয়গুলিকে আদর্শ ভেবে তদনুকরণেই প্রবৃত্ত হয়, সেই সেই দেশের শিক্ষা দীক্ষাও, প্রায় তদ্‌তদ্ ভাবানুমোদিত হ'য়ে থাকে। তাই আজ কাল প্রায়ই সব দেশেরই জনগণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে; ফলে সব দেশেরই অবস্থা দাঁড়িয়েছে শাঁক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখার মত, আঁস্‌টে গন্ধ তাতে যে ঢাকা থাকে না তা জানেও সকলে, তবে কিনা পাশ কাটিয়ে চলাটা আমাদের অভ্যাসের দোষ দাঁড়িয়েছে। এই যা তাই চাতুর্য্য ও ছলনার দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে খুসী রাখ্‌ত, অর্থনীতি অবলম্বনে পরস্পর পরস্পরকে ঠকাতে, তেমনি বাণিজ্যের নামে চলে শোষণ, অপহরণ আর লুণ্ঠন, ধর্ম্ম যুদ্ধের নামে খুনো-খুনি, সমাজ সংস্কারের নামে, ব্যবহারিক জগতের গতিরোধ ইত্যাদি আর প্রজারাও ঠিক শেখে তাই। কারণ রাজশক্তি বলতে জনশক্তির কেন্দ্রটিকে বোঝায় না, বোঝায় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা তার আশ্রিত দলকে। তারা মাথা হ'য়ে যখন যেমনটি শেখায় জনগণও তাই মেনে নিয়ে চলে, "যেমন বলাও তেমনি ব'ল"র মত।

তারপর কার্য্যক্ষেত্রে যদি সেই সব মন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্যেরা মন্ত্র পরীক্ষা

করবার কোন সুযোগ সহজভাবে না পায়, কাজেই তারা বোক্কোসের মত লালসার বশবর্ত্তী হ'য়ে নিজের ক্ষত নিজেই খেয়ে বসে থাকে, তাতে নিজের মন্দ হবে জেনেও নিস্তার নেই।

এত শতের মধ্যে সব চেয়ে বাহাদুরী হচ্ছে চুরি ডাকাতির, রাজনৈতিক চুরি ডাকাতি, আজ কাল সভ্যতার মুখোস প'রে বিজ্ঞানের আর হাওয়ায়, এমন মোলায়েম, এমন মনোরম ও এমন কায়দায় প্রয়োগ করা হয় যে, অতিবড় শত্রুতেও তার প্রশংসা না করে থাকৃতে পারে না ; এতই শীলতাপূর্ণ এত অমায়িক ও এতই দরদীর মত যে আমার ঘরের জিনিষ মাথায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়,—সেই তাদের বাড়ীতে, তাতেও মন খুঁত খুঁত করতে থাকে, কি জানি কোন-খানে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল কিনা ? এত ভদ্র, এত প্রবল। অনেকে হয়ত বলতে পারেন এদেশে খাটে, স্বাধীন দেশের ব্যবস্থা এ নয়। বলি ভাই সব, সাজ-গোজের চকচকানিতে ভুলো না। ও তোমার বস্তু বিশেষের এ পিট্ও যা ও পিট্ও তাই, একটু ভেবে দেখ না। আর এ দেশের দিক্ থেকে এইটুকু বলি যে যদি তা না হ'ত, তা হ'লে এদের এখনকার যা চাওয়া, সব কিছু দিয়েও ওদের হাতের পাঁচ বজায় থাকৃত। তা ছাড়াও সম্ভবতঃ ও বিজেতা জাতটা সমগ্র পৃথিবীর বুকে চিরদিনের জন্যে বিজয়-বৈজয়ন্তি প্রোথিত করে যেত। অন্য দেশের কথা পৃথক করে বলার অধিকার আমাদের নেই, তবে সবই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। অত কথা কি এ দেশও যদি এই আবহাওয়ায় এখনই স্বাধীন হয়ে যায় তাতে যে স্বদেশী সরকারের আবির্ভাব হবে, সেও যে মাস্তুতো ভায়ের দলের হবে না, তারও এমন কোন নিদর্শন এখনও এদেশের রাজনীতিবিদ্গণের গন্ধে বা আঁচে পাওয়া যায় না, "অন্যে পরে কা কথা"।

তা ছাড়া সুধু কোন একটা দেশের আবহাওয়া বদলালেই যে সব যায়গার হাওয়া বদলে যাবে তাও নয়. এর জন্যে যা দরকার তার মূল ভিত্তি হ'চ্চে মানব গোষ্ঠির চলার পথ বদলে ফেলা। তবে কথা হ'চ্চে কি? কার শ্রাদ্ধ কেবা করে 'খোলা কেটে বামুন মরে'। এই গেল এ যুগের পাত্রের রাজনীতিক অবস্থা।

অর্থনীতি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলাও, রাজনীতির মতই আপত্তিকর ব্যাপার, তা হ'লেও বিষয়টাকে একেবারে বাদ দিয়ে চলা মোটেই চলেনা; কারণ এই বস্তুটির উপর ভিত্তি করেই এ যুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, মানব সমাজে; অর্থাৎ যেটা বাদ দিলে, বলার অর্দ্ধেকখানিই বাদ প'ড়ে থাকে; কাজেই নাচার হ'য়ে অন্ততঃ গোটাকতক কথাও এখানে ব'লে রাখতেই হবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতিটা পরস্পর বিনিময়ের অজুহাতে যতই সুচিন্তিত ব্যবস্থা হোক না কেন?—মূলত উহা মানব-গোষ্ঠির আসল লক্ষ্যে পৌঁছানার গতিকে একেবারে রুদ্ধ ক'রে দেয়, ওটার ছোঁয়াচ লাগলে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি এতই প্রবল হ'য়ে উঠে, যে তাতে কেন্দ্রীয়শক্তি পরোক্ষে স্বতই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখন যে যার জন্যে যতটুকু করে, স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়েই ক'রে থাকে তাতে প্রাণশক্তির পরশ না থাকাতে যন্ত্রচালিত জড়শক্তিরই বিকাশ দেখা যায়। তার ফলে মানব-হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রসুপ্ত থেকে যায় আর চিররুদ্ধ হ'য়ে পড়ে তার স্বর্গ পথ (উন্নতি)। জড়ের এমন কোন গুণ নেই, যা দিয়ে সে প্রাণ-শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে পারে কাজেই, যারা অর্থাৎ প্রয়োগকারীরা, জড়ের সান্নিধ্যে থেকে থেকে শেষে নিজেদের গন্তব্যপথ হারিয়ে ফেলে, তখন সে এত দূরে গিয়ে পড়ে যে কোন কিছুতেই যথার্থ প্রাণের সন্ধান

পায় না, নিজেকে একান্তই নিঃসংঙ্গ ব'লে মনে করে তার যে অপর কিছু জীবনের করণীয় আছে তাও তার ধারণার অতীত হয়ে পড়ে, অগত্যা এ জীবনটার এই পরিসমাপ্তি ভেবে পুনরায় জড়কে আশ্রয় করে। আর ঐ বস্তুটীর বেশীদিন সেবার ফলে, মানুষের সাধারণ দৃষ্টিশক্তি ও তার বুদ্ধি-বৃত্তি এতই ক্ষীণ হয়ে আসে যে উহার ব্যবহার ফলে সে যে দিন দিন আত্মদ্রোহিতাই ক'রে চলেছে তার বিন্দু বিসর্গও সে বুঝতে পারে না, "অন্যে পরে কা কথা"। এক সময়ে হয়ত কুট রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই অস্ত্র প্রয়োগে বিজেতারা বিজিতদের পরস্পরকে বেমালুম বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারবে, হ'লোও তাই, উদ্দেশ্য সিদ্ধি ঠিকই হয়েছে কিন্তু কে কাকে বিচ্ছিন্ন করচে, কি লাভের আশায়, সেই সহজ ব্যবসাদারি বুদ্ধিটুকু পর্য্যন্ত একান্ত অভাব হ'য়ে পড়েছে লাভে হতে, অভিমন্যুর মত নিগম না জানায়, চারদিক্ থেকে সপ্তরথীর প্রহারে, এখন প্রাণ যায় যায়। নিগমবেত্তা বাপ অর্জ্জুনও কাছে নেই যে কোন একটা উপায় হবে, কাজেই এখন নিরুপায় হয়ে বেঘোরে বীরশয্যার প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হ'য়েছে প্রয়োগকারীকেই।

এখানকার যা বিনময়ের প্রকৃত রূপ মাৎস্যন্যায়কেও ঠেলে আরো উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়েছে জোঁকন্যায় নাম দিয়ে নতুন শব্দ ব্যবহারেও তার সমান অর্থ বোধ হয় না, কারণ জোঁক শুধু মানুষের পরিমিত রক্ত শোষণ করে নিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়, কিন্তু অধুনাতন অর্থ সমস্যা মানুষকে যা পেয়ে ব'সেছে, সে মানুষের শুধু রক্ত খেয়েই সন্তুষ্ট নয়, মেদ, মজ্জা, হাড়, পাঁজর ত খাবেই, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের অন্তরে লুকানো প্রাণশক্তিটুকুকেও বেমালুম আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে সরে পড়ে। হায়রে ন্যায়ের ফাঁকী! বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে নিয়ে তোমার আনাগোনা,—বড়ই মনোমদ, ধন্য

তোমার মহিমা, অতএব তোমাকে নমস্কার। এই হ'ল পাত্রের সাংসারিক অবস্থা যাতে পড়ে সকলে মিলে হাত-পা আছড়াচ্চে। আরে বাপু যখন প'ড়ে গেছিস্, দু' হাতে ঐ বস্তুটীকে জাপ্‌টে ধরে থাকলে উঠতে পারবি কেন, একবার ভুঁয়ে রেখে দিয়ে হাত দু'টো খালি কর্, তারপর যে মাটীর বুকে আছাড় খেয়েছিস্ তাই ধরে আগে উঠে দাঁড়া তারপর ও মাটীর মায়া কাটাতে না পেরে থাকিস্ আবার নিস্, কিন্তু মনে রাখিস্, পড়ে গেলে ওটীকে দু' হাতে জাপ্‌টে পড়ে থাকলে ওঠা চলে না, তা সে ডিগ্‌বাজীই খাও আর ষাঁড় চ্যাঁচানোই চ্যাঁচাও—"কেউ কারো নয় ত্যাখনা চেয়ে।"—

শিক্ষা, দীক্ষা ব্যাপারেও দেখা যায় যে—মানুষ যাতে আওতায় আওতায় মানুষ হ'য়ে ওঠে সেই শিক্ষার প্রণালীই আজকাল সর্ব্বত্র আদৃত, অর্থাৎ মুখস্থ কর, অনুকরণ কর, আদব-কায়দা দুরস্ত কর, যদি পূবে যেতে হয় বল পশ্চিমে যাবো, যদি নূন ভাত জোটে ত, ক্ষীর ভাত বলে বাজার গরম রাখবে, আর যদি পুরা দস্তুর সভ্য ব'লে নিজেকে জাহির কর্ত্তে চাও তাহ'লে আসল অভাবের খোঁজ না নিয়ে খুঁটিনাটীর অভাবকে বাড়িয়ে চল তাহ'লেই তুমি শীঘ্রই সভ্য নামে পরিচিত হ'তে পারবে। এই গেল শিক্ষা গ্রহীতার শিক্ষণীয়, তারপর শিক্ষাদাতাদের জেনে রাখতে হয়, পাছে কোন নবাগতের চ'ক্ষে রবির ভাস্বর মূর্ত্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে, তাই বাপ মা থেকে পর্য্যায় ক্রমে, শিক্ষক, গুরু, বন্ধু, বান্ধব, সমাজ ধর্ম্ম ইত্যাদি সকলে মিলে তাকে মেরে থাকে, আর তাদের মনগড়া ভাল, মন্দ, উচ্চ, নীচ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিলাস ব্যসন, জাতি বিজাতি, আচার ব্যবহার ও আরো কত কি সকলে মিলে পল্লবিত শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে ধ'রে থাকে যাতে সে না মাথা তুলে বাইরের আলো দেখতে পায়;

পাছে সে আওতায় বাহিরের আলোর কথা বা মুক্ত আবহাওয়ার খবর জেনে ফেলে, তা হ'লে কাহারো যে আর পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাওয়া চল্‌বে না, এমন গড়ে পিটে তৈরী ক'রে নেওয়া সর্ব্বপ্রসূ কামধেনু যে বশিষ্ঠও তৈরী ক'রে নিতে পারেনি, কাজেই তার চেয়ে আমাদের মায়া ঐ ধেনুটীর ওপর সকলেরই একটু বেশী থাকবারই কথা। আর আগেকার দিনের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখতে গেলে দেখা যায় যে তাদের শিক্ষা ছিল দীক্ষা গ্রহণের জন্য, সেই জন্য তারা শিক্ষা দীক্ষা কতকটা একসঙ্গেই ব্যবহার করতো। এখন আর সেই বালাই নেই, শিক্ষা বলতে হুবহু নকল নবীস হওয়া যাতে কোন দিক থেকে মাৎস্যন্যায়ের ব্যতিক্রম না ঘটে তার পাঠ পড়ে মুখস্থ করা। অনেকে হয়ত আপত্তি জানাবেন যে তা কেন, এরি মধ্যে থেকেও ত প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব হয় বা হচ্চে! তা কে না স্বীকার করবে, তা না হলে যে মানুষ মানুষকে আস্ত আস্ত গেলবার ব্যবস্থা ক'রে নিত, সেটা কিন্তু এ শিক্ষার গুণে নয়, তাদের নিজস্ব প্রতিভার গুণে; অবশ্য কতকটা ঋণ অস্বীকার করা চলে না, তা ব'লে সবটুকু যে নয় তারও উল্লেখ থাকা দরকার। এই হ'ল এই যুগের পাত্র-সম্প্রদায়ের ঘরকন্নার মোটামুটী অবস্থা যার ভিতর থেকে তাকে দিন গুজরাণ করতে হয়—অন্যের মতের পোষকতা ক'রে। এরাই নাকি স্বাধীন, এরাই নাকি কর্ম্মী একে অন্যের মোট বয়ে। এই সবের পরিচর্য্যায় মানুষ হওয়ার ফলে, এখন হঠাৎ আমাদের দেখে কারো সাধ্য নেই যে ধরে ফেলে, আমরা কোন ধাতুর চিজ; রংয়ের পর রং চড়াতে চড়াতে এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে যে দেখলেই মনে হয়, যে ওটী শুধু রংয়ের ছোপ দিয়েই তৈরী, তার অন্তরে সার বস্তু কিছু নেই, কিন্তু ঐ যে কোথা থেকে এক আধটা ফুল্‌কী বেরিয়ে পড়ে, রংয়ের বুক চিরে,

তাই আজ প্রশ্ন উঠছে,—তাহ'লে সে আসলে কি? আঘাত-প্রাপ্ত হ'লে রং-আবরণের মধ্য থেকে ঝঙ্কার তুলে কে সাড়া দেয়, আর সেই সাড়া নেয়ই বা কে? তাই আজ খোঁজের পালা প'ড়েছে যে, ঐ রং আবরণের আড়ালে কার ওই ছায়া? কি সে বস্তু?

রংয়েরও একটা নেশা আছে, লিখতে লিখতে যেমন দেখছি ক্রমশঃ সে কলমের ডগে, চোখে, মুখে, মনে প্রাণে সবটাতেই একটা ছোপ দিয়ে দিতে চায়, যাতে আসল কথাগুলো তার মধ্যে লুকিয়ে থাকার অবকাশ পায়। হে রংরাজ, তোমার সৈন্য-সামন্তদের সং সাজাবার কারিগরি সত্যিই মনোরম, যতক্ষণ সে নাটুকে দলের অভিনেতা অভিনেতৃদের ইচ্ছাধীনে থাকে, কিন্তু তাঁরা যাকে একবার পেয়ে বসেন তার স্বাতন্ত্রতা খুঁজে পাওয়াই দায়ের কথা হ'য়ে পড়ে; তাই আজকালকার দিনে সদাই ভয় তোমার নন্দী ভৃঙ্গীদের কোথায় কখন ভূতের নাচ দেখিয়ে তবে ছাড়বে, একলা পথের যাত্রীদের ভয় দেখিয়ে কাহিল করানো—রাজা।

সং-শালার কারিগরের রং পারিপাট্যে কত অপরূপ দৃশ্যই যে আজ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ও উঠছে—তা দেখে কার মন না রঙ্গীন নেশায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে;—কিন্তু যারা এই মনোমদ জিনিষকে ভাঙ্গতে চায়, তারা কি নির্ম্মম! কি কঠিন!—

কি করা যাবে সব ঘরেই অমন দু' একটা অশান্ত ছেলেপুলে থাকে যাদের স্বভাবই হচ্ছে ভাঙ্গাচোরা, সাজানো ঘরকে তচ্ নচ্ করা। প্রথম দিনকতক হয়ত সে ঐ সব দূর থেকেই দেখে বেড়ায় কেমন সুন্দর মানুষ, কেমন সুন্দর জন্তু-জানোয়ার, কত রকম ফুল-ফল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা ইত্যাদি কত মনোহর ভাবেই না সাজানো র'য়েছে—দিন কতক

গেলে তখন আর দূরে থেকে দেখাটা তেমন পোষায় না, চায় তাদের নিকট সান্নিধ্য, বায়না করেই হোক আর চুরি করেই হোক তাকে তা পেতেই হবে—কাজেই সে সুযোগও পায়, পায় এবং পরে একদিন খেলতে খেলতে ভেঙ্গে দেখে যে, অমন যে সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলি—তার ভিতর আছে মাত্র ‘খড়’ ‘দড়ি’ ‘জল’ ‘মাটী’ আর তার উপরে থেকে খানিকটা রংয়ের ছোপ। ফলে তার কৌতূহল আরো বেড়ে উঠলো, একে একে সকল রকমগুলিকেই ভেঙ্গে চুরে দেখলে—আসলে সবই সেই একই উপাদানে তৈরী, রকমারী ছাঁচ ও রংএর কায়দায় এতদিন তার কোনটী ভয়—কোনটী ভক্তি কোনটী বা আদরের বস্তুরূপে তার মনকে পেয়ে বসেছিল। অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি আরো জেগে উঠলো, খোঁজখবর নিয়ে আরো জানলে যে এসব তৈরী করবার কারিগর নামে একটা জাত আছে, বায়না ক’বলেই সে আসে—তখন তার তল্পীতে থাকে মাত্র, রকমারী ছাঁচ রং ধরাবার সরু মোটা কয়েকটী তুলি আর তার মনের পটে আঁকা অদৃশ্য ছবি; তারপর বাকী মাল-মসলা সে যোগাড় ক’রে নেয় তার কর্ম্মক্ষেত্রে—তখন সে সেই একই মসলা দিয়ে হাতী গড়ে, ঘোড়া গড়ে, মানুষ গড়ে, ঠাকুর গড়ে, গাছ পাথর জীব জন্তু আরো কত কি! যা তার খেয়ালে আসে—তারপর সেইগুলিতে রকমারী রংয়ের ছোপ ধরিয়ে দেয়—তখন সেগুলিকে আর এক পর্য্যায়ে ফেলে দেখা চলে না, দেখতে হয় কারিগরের ভাবের চশমার ভিতর দিয়ে—তখনি কোনটাতে দেখে ভক্তি, কোনটিতে ভয়, কোনটীতে ঘৃণা, কোনটীতে আদরের বস্তু হ’য়ে দর্শকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তাতে রংয়ের অন্তরালস্থিত উপাদানগুলি স্বধর্ম্মচ্যুত হয় না।—হ্যাঁ তবে হয় কখন, যখন সেই সব উপাদানগুলি রংএর রাজার (তেজের) পরশ

পায়, তখন কিন্তু যে যার রূপ হারিয়ে অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয়,—অর্থাৎ "এক্ বরণ হো যায়"।

দুষ্টু ছেলের কৌতূহল আরো বেড়ে চ'ল্লো, শেষে সে দেখলে ও বুঝলে যে নকলের মত সত্যিকার জগৎ প্রপঞ্চও ঐ একই নিয়মে আর ঐ সব একই উপাদানে তৈরী হ'য়েছে আর রং রাজের স্পর্শে এদেরও পরিণতি হয় সেই অঙ্গারত্বে, পার্থক্য মাত্র এক 'চিতিকে' নিয়ে, তাহ'লেও তখন আর কারো বুঝতে বাকী থাকে না যে প্রকৃতিরাণীর ভাণ্ডারে, 'সবে ধন নীলমণি'র মত ঐ কয়টী উপাদানই সম্বল, তার আইন-কানুনই সর্ব্বত্রই এক। রকমারী যেটা দেখা যায় সেটা ঐ কারিগরের ভাব বিন্যাস সাপেক্ষ।

সেই নিয়মে দেখা যায় যে, আমাদের 'পাত্র'গুলিই আসে একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের মধ্য দিয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে। সেখানে সে উত্তাপাদি দ্বারা অঙ্কুরিত হ'লে পর মাতৃপ্রদত্ত ধাতুর প্রবাহে রূপ পরিগ্রহ করে; তার পরেই তাকে প'ড়ে থাকতে হয় কিছুকাল যাবৎ মায়ের পীযূষধারার উপর নির্ভর ক'রে—সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টিলাভের জন্য। তারপর যখন পেকে উঠলো—তখন আর মানুষের ভাববার অবকাশ কই? কে দেয়, কে খায় কে তার ধার ধারে?—তখন তার কাজ কত, দায়িত্ব কত? সে সব চুকিয়ে তবেত ভাববে?

সে যাক্, মোটের উপর অবশেষে দেখা যায় যে মানব-শরীরের উপাদানই ঐ পাঁচটী যা দৃশ্য প্রপঞ্চের অন্য সবগুলিতে দেখা যায় ঐ পঞ্চ উপাদান যেখান থেকেই উৎপন্ন হোক, আর যেই সৃষ্টি ক'রে থাক্ "আমরা" ঐ গুলিকে পাই পৃথিবীর কাছ থেকে অন্নরসাদিরূপে, আর সেগুলি সংগৃহীত হয় মায়ের পীযুষধারার ভিতর দিয়ে—যেমন অঙ্কুরোদ্গমের

সময় এসেছিল মায়ের মূর্ত্তিতে দু'কেঁড়ে দুধ বুকে করে। তারপর তারা বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গে যেমন খুঁটীনাটী খেতে শেখে, তখনই যেমনটী চায় তাকে তেমনটী যোগাতে থাকেন নিজের বুকের ক্ষার ধারা দিয়ে,—আর অতি বুদ্ধিমান মানব আমরা সেই তাঁকে, পৈতৃক-কেলে জড়-সম্পত্তি ব'লেই জেনে রেখেছি। এইখানে একটু ভেবে দেখবে কি মানব! এত যে তোমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা; এত যে তোমার মাৎসর্য্য এত জ্ঞান বিজ্ঞান, এ সবের মূল কোথায়? এ সবের অস্তিত্ব কোথায় থাকে?—যদি সেই জড়ের ক্ষীরধারা থেকে নিজেকে ক্ষণিকের তরে বঞ্চিত করে রাখ, তখন কোথায় থাকে তোমার শৌর্য্য বীর্য্য, যদি মায়ের বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী অন্নরসাদি থেকে নিজেকে পৃথক করে নাও? একবার দেখনা বন্ধুগণ—চেষ্টা-চরিত্র করে যাতে মাটীর জিনিষ আর না খেতে হয়, আর তার ফলই বা কি দাঁড়ায়, কিংবা বিজ্ঞান বলে এমন কিছু একটা খাবার তৈরী কর (যখন খেতেই হ'বে) যার সঙ্গে জড়া পৃথ্বীর কোনই সম্বন্ধ নেই; তাহ'লে ত মহা একটা অপমানের দায় হ'তে এড়িয়ে যাওয়া যায়; এত মহাজ্ঞানের হাঁড়ি মাথায় ক'রে বেড়িয়ে শেষে কিনা তাঁর দুয়ারে পড়ে মরা, তবে একটা কাটান-মন্ত্র যে ইনি পৈতৃক কালের সম্পত্তি— ঐ যা জোর।

আর কি সুন্দর আমার বুদ্ধি বিবেচনা, যার কণিকামাত্র অন্নরস গ্রহণ ক'রে মানব নিজেকে বুদ্ধিমান জ্ঞানী বলে অহঙ্কার করে, আর তার সমষ্টিগত শক্তিকে জড় আখ্যা দেওয়াটা বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক বটে! তবে বলবারও কিছু নেই, কারণ একটা অতি ক্ষুদ্র কীট—মানব-শরীরটাকে যেমন সুমেরু শৃঙ্গবৎ অতিবৃহৎ একটা জড় কোন কিছুর মধ্যে ধারণা করে নেয়; হাজার বুদ্ধির বড়াই করি—তার বেশীত আর আমাদের লক্ষ্য চলে না। ক্ষুদ্র কীটের কাছে মানব-শরীরের ন্যায় পৃথিবী সত্যই আজ

মানবের কাছে জড় ছাড়া আর কিছুই নয়; তবে একটা কথা কি? যা অন্তত নিজেদের কল্যাণের জন্য মানব গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতিদের একটু অন্যরকম ভেবে দেখা দরকার অন্তত আড় চোখেতেও—সে সম্বন্ধে মাত্র দু' একটা কথা ব'লছি।

মানবেরা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের যতটা সন্ধান পেয়েছে তাতে ক'রে দেখা গেছে যে ছোট হোক্ বড় হোক্ যেখানেই কোন কিছুর শরীর বা পাত্র সৃষ্টি হ'য়েছে, তাদের গঠন পোষণ প্রণালী প্রায় একই; মাত্র উপাদান বিশেষের জন্য একটু আধটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। সেই সূত্র ধরে এইটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে, যে নিয়মে মানব-শরীর গঠিত হয়েছে তার বড়র বা ছোটর বেলাতেও সেই একই প্রাকৃতিক নিয়ম বর্ত্তমান; তদনুসারে যদি একটী মানব-শরীরকে তন্ন তন্ন করে কেটে-কুটে-খুঁজে দেখা যায়, তবে সেখানে কতকগুলি ব্যষ্টিকোষ বা বীজানুদের পৃথক পৃথক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হচ্ছে দেখতে পাই, তাছাড়া মানুষটীর পৃথক্ সত্ত্বার কোন সন্ধান পাওয়া যায়না, তা না হ'লেও ঐ জীবানুগুলিকে যখন কোন একটী কেন্দ্রে কোন কারণে একত্রিত হ'তে দেখতে পাই তখন তাদের সেই সমষ্টিকে একটা কোন কিছুর সম্পূর্ণ শরীর ব'লে ধ'রে নিয়ে থাকি। এখানে – যেমন ধরা যাক্ আমার নিজেরি—পৃথক কোন সত্ত্বা না পাওয়া গেলেও, অতগুলো ছোট ছোট পৃথক জীব-সমষ্টিকে নিয়ে তার একটা আমির আধ্যাস ফুটে উঠেছে,—তাদের ক্লান্তিতেই আমার ক্লান্তিবোধ, তাদের সুস্থতাতে সুস্থ বোধ, তাদের ভালমন্দ রস গ্রহণের ইচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে, আমার ভালমন্দ খাওয়ার স্পৃহা, বা ইত্যাকার সব কিছু গ্রহণের বা ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তদনুসারে আহারাদি সম্পন্ন বা গ্রহীত হওয়ার ফলে, এ রস যথানিয়মে রক্তাদিতে

পরিণত হ'য়ে, তাদের অর্থাৎ কোষগুলিকে রসদ যুগিয়ে আসে, তেমনি পৃথিবী শরীরে অস্তিত্বও ঠিক ততটুকু। আমার শরীরস্থ কোষগুলি যেমন স্নায়ু-কেন্দ্রকে প্রহত ক'রে তাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ কেন্দ্রাভিমুখে পরিচালিত ক'রে থাকে, ও তার প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা আপনা আপনিই প্রায় সম্পন্ন হয়, পৃথিবী গাত্রে আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। তবে যদি প্রতিক্রিয়ার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা ব'লে মনে হয়, তবে বুঝতে হবে যে নিজেদেরি কর্ম্মদোষে আজ পৃথিবী-শরীরস্থ আমরা পক্ষাঘাত গ্রস্ত কোন অংশ মাত্র। তা ছাড়া আরো একটা কথা, যদি আমার শরীর-মধ্যস্থ কোন বিশিষ্ট অংশ বা কোষ দুষ্টস্বভাবাপন্ন হ'য়ে অন্য অংশের বা কোষের আহার্য্য অন্ন রসাদি আত্মসাৎ করার দরুণ অন্যান্য কোষগুলি শীর্ণ ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে—ফলে সমষ্টির কেন্দ্রটীকেও সন্তাপিত করে তোলে, তখন আমাকে কি করতে হয় ? প্রাথমিক নিয়মানুসারে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হয়,—সেই ব্রণটীর অতিগ্রহীতা দোষ নিবারণের জন্য প্রথমে হয়ত প্রলেপাদির ব্যবস্থা, যদি তাতে কোন ফল না দর্শে তখন নিজের শরীর হ'লেও,—অপরগুলিকে রক্ষা করবার জন্য ও কেন্দ্রকে নিরাময় কর্ত্তে, সেই সে অতিগ্রহী-দোষ-দুষ্ট কোষগুলির ওপর অবশেষে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা ক'রে থাকি। সেইরূপ পৃথিবী-শরীরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কোষানুরূপ আমরা যদি ঐ সব অনুরূপ দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ি, তার ফল কি হ'তে পারে আমার নিজের উদাহরণ থেকেই তা বুঝে নিতে পারি ; কারণ আইন আইনই, সে আমার বেলা আলাদা আর তোমার বেলা আলাদা অন্ততঃ প্রাকৃত নিয়মে তার ব্যতিক্রমের কোন সন্ধান আজও ধরা পড়েনি।

এই খানেই হ'ল, পৃথিবীর শরীরান্তর্গত কোষ সমূহের মধ্যে মানব

জাতীয় কোষগুলির পার্থক্য ও কর্ম্মারম্ভ ; অর্থাৎ আমরা মানুষরা পৃথিবী-শরীরের অন্তর্গত এক একটী জীব কোষ মাত্র, আর ঐ শরীরের আমাদের স্থান ও কাজ হচ্ছে—(অন্তত মানব নামীয় কোষগুলির চরিত্র দেখে মনে হয়,) স্পর্শানুভাবক কোষের অনুরূপ। স্পর্শানুভাবক কোষের কাজ হচ্ছে যে—ধর তোমার কি আমার শরীরের কোথায়ও কোন অংশে যদি একটা মশা কামড়ায়, সেই অনুভূতিটুকু গ্রহণ ক'রে তাড়িৎ-প্রবাহে ছেড়ে দেওয়া। তারপর তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটে যায় তার কেন্দ্রাভিমুখে নির্দ্দিষ্ট কোষের অনুভূতিটুকু জানাতে—কেন্দ্র থেকে মুহূর্ত্তেই হুকুমনামা বাহির হয় কোন অঙ্গ বিশেষের ওপর অভিযোগের প্রতিকারের জন্য, ধরে নেওয়া গেল সেটা হাত, সেই হাতকে হুকুম হ'ল হয় চপেটাঘাত, নয় টিপে মারা ; সেও তা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন ক'রে থাকে। অথচ ঐ নির্দ্দিষ্ট কোষটী যেমন তোমার কি আমার সুবৃহৎ শরীরের অত শত তত্ত্ব বা কাণ্ডকারখানার কোন সন্ধানই রাখেনা বা বোঝেনা যে কিসে কি হ'ল বা হয়, তেম্নি তোমার আমার জ্ঞান-বুদ্ধিও—অপর একটী বিরাট শরীরের অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক ততটুকুই খবরাখবর রাখি তদনুপাতে জ্ঞান-বুদ্ধিও ঠিক ততটুকু, আবার হয়ত এমনও হ'তে পারে যে আমাদের মতন আমাদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পৃথিবী আবার অপর কোন মহাশরীরের অন্তর্গত কোষানুকোষের মত কার্য্য করে চলেছেন। সে যা হোক্ এখন হয়ত প্রশ্ন হ'তে পারে যে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি বর্ত্তমান র'য়েছে তা'দের সেই সব কই ? অনুরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব থাকতে পারে কিন্তু সেই সেই কার্য্য সমাধা করার মতন যে গুণাগুণ তোমার শরীরস্থ অনুকোষটীর ছিলনা বা নেই তা বল্‌তে পারনা, তারও আছে বৈ কি ! তা না হ'লে সে আহারাদি গ্রহণ করে কি ক'রে !

তার বংশ-বৃদ্ধি হয় কি করে। তারপর তোমার শরীরের সেই অংশে বেদনা হ'ল তা ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পার কি করে। সেখানে তো আমাদের লোক-দেখানো চোখ দুটো হাজির ছিলনা, কে তবে সঠিক খবর পাঠিয়েছিল সে ঠিক ঐখানে—আর সে ব্যথার পরিমাণ কতটুকু, যদি তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি না থাকবে তাহ'লে সেই সুদূরস্থিত অনুকোষটীর সুখ-দুঃখের পরিমাণটা বুঝতে পার কি করে? আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই, ঐ সব খবরের আদান-প্রদান যার মারফৎ হয় সেটাকে চুম্বক-প্রবাহ বলে, ঐ প্রবাহকে দু' ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, একটী কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির পরিচালক, অপরটী জ্ঞানানুবোধক।

ব্যপারটা হয়ত মাত্র গোটা দুই চার লোক ছাড়া অন্যের কাছে একটা কৌতুকের বস্তু হ'বে, তা হ'লেও বলি কি মানব-নামধারী মাত্রেরই বিষয়টা একটু ভেবে দেখা উচিত যে তাদের প্রকৃত অবস্থা কি; হয়ত এও হ'তে পারে যে, যে ভাবে বলা হ'ল তা ঠিক্ নয় অন্য কি বোঝায়, সুধু পরিবার প্রতিপালন না আর কোন কর্ত্তব্য আছে? হয়ত উত্তর হবে ও সব বাজে চিন্তার দরকার কি?—তা সত্যি; বাজে চিন্তা করার মতন আমাদের সময় কই? তা সত্ত্বেও এও আবার ঠিক যে আর এক জাতির লোক আছে, যাদের মধ্য থেকে দিগ্বিদিক্ কম্পিত ক'রে একজন গেয়ে উঠেছিল "বন্দেমাতরম্!" অতএব ঐ মন্ত্রের সাধক যে একেবারে নেই তা বলা যায় না, তার সাধকও আছে সিদ্ধিও আছে—ঋষির মন্ত্র কখনও ব্যর্থ যায়না, তাই অবান্তরই হোক্ আর যাই হোক্ এত কথার অবতারণা শুধু তাদের জন্যই মজুত রইল, কিন্তু অপরদের স্বরূপটা কিরূপ তা'ও তো পরস্পর জানা দরকার; অতএব এর পর তারা যেন চুপ ক'রে না থাকেন, তাতে পরস্পরের চলার পথে বাধা পড়ে।

এই হ'ল পঞ্চভূতাত্মক দেহধারী মানবের পর্য্যায় ও তার কর্ম্মক্ষেত্র। এরপর দেখা যাক্ বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের অর্থাৎ শুধু দেহধারী মানবের কি অধিকার সাব্যস্ত ক'রেন।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা যেমন একবার স্বীকার করে নিয়েছি যে, যে ধাতুতে যে বস্তু উৎপন্ন,—ছাঁচের তারতম্যে তার, যে যত রকম ইচ্ছা রূপান্তরিত হ'য়ে থাক্ না কেন আসলে কিন্তু সে যা তাই থাকে, ধাতুগত ব্যতিক্রম হয় না—এইবার সেইটাই আমাদের খেয়াল রেখে যেতে হবে।

বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের সন্ধান দিয়েছেন যে পৃথিবী একটা বৃহৎ চুম্বক মাত্র; আইনতঃ তাহ'লে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা,—শুধু আমরাই বা কেন, দৃশ্যমান্ তাবৎ পার্থিব জিনিষ মাত্রেই ঐ সুবৃহৎ চুম্বক-শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। (তাহ'লে এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে এ সিদ্ধান্তও আমাদের আগেকার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যাচ্ছে) তাই যদি সাব্যস্ত হয়, তা হ'লে আমাদের আর বলার কিছু থাকেনা, বৈজ্ঞানিকেরা অনায়াসে চুম্বকের আইন মারফৎ মানব গোষ্ঠীরই ভালমন্দের বিচার ক'রে দিতে পারেন অতএব সে ভারটা তাদেরই হাতে ন্যস্ত থাকাই ভাল; তবে মোটামুটী যে ক'টী আইন জানা থাকলে কাজ চলে, তা ইতিপূর্ব্বেই "দেশ" অধ্যায়ের শেষ অংশে চুম্বকের গুণাগুণ আলোচনার মধ্যেই দেওয়া আছে যে, যে প্রণালীতে মৃত চুম্বককে উজ্জীবিত করা চলে, কি করেই বা স্খলিত তেজের পুনরুদ্ধার করা যায়, আর অগ্নি সংস্কারেরই বা কখন দরকার হয় ইত্যাদি।

এই সব খোস-গল্প শুনে অনেকেরই হয়ত মনে প্রশ্ন উঠেছে যে, সত্যিই যদি তাই হয়, তা হ'লে আসলে মানুষকে মানুষটাই যে উবে যায়,

তার আর নিজস্ব ব'লতে কিছু থাকেনা বা রইলনা,—তাহ'লে এর পরে মানবত্বের ব্যাখ্যার আবার কি আবশ্যকতা থাকতে পারে ! * * *

সত্যইত বেচারাদের ঘর দোর যদি সবই ভেঙ্গে গেল নিরালম্বে এখন থাকে কোথায় !—

মাভৈঃ মাভৈঃ—সে ভরসা আমাদের আছে—বা বড় গলা ক'রে ব'লতে পারি,—যে যেমন ইচ্ছা বলুকনা কেন, আর যত ঢাক্ ঢোলই বাজাক্ না কেন, ঘেঁটু ঠাকুরের তাতে বড় একটা কিছু যায় আসেনা, এসব ক্ষুদ্রকের কথা ছেড়ে দিয়ে বাণীর ভাণ্ডারে এমন কোন অস্ত্রই নেই যা গণ্ডারের সহজাত কবচখানি ভেদ কর্ত্তে পারে, তাইত কবি ব'লে গেছেন "যে যা বলে সয়ে থেকো হ'য়ে আমার দুঃখে দুখী" ॥

রসিকতা ত' বেশ একটু হ'ল,—কিন্তু এখন প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যায়।—আচ্ছা—প্রশ্নকে প্রশ্ন দ্বারা চাপা দিয়ে দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় মরে।

ভাই সব তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমার তরফ থেকেও দু' একটা প্রশ্ন আছে আগে সেইটার মীমাংসা ক'রে দাও। ধর এই যে শরীরটা যাকে উপলক্ষ ধ'রে আমরা অমুক ছোট অমুক বড় ব'লে যে বিচার করি,—সেটা তাদের কি দেখে ? বয়েস দেখে—না মাথায় সবার চেয়ে ঢ্যাঙ্গা দেখে—না আর কিছু দেখে ? * *

ওঃ—তোমরা তামাসা করচ ? ব'লচ—ও দুটোতেই বলা যায় ! আচ্ছা তা হ'লে আমার কথাটা বুঝিয়ে বলার ভুল হ'য়েছে। আমার ব্যক্তব্য হচ্ছে, মানুষের মধ্যে একজনকে আর একজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে নিই তার কি দেখে ?—অতিকায়ত্ব বা কায়িক বলের জন্য হ'লে,—তাহ'লে নিশ্চয়ই হাতীর ঘাড়ে মাহুতকে না দেখে মাহুতের কাঁধে হাতীকে চ'ড়তে

দেখতুম, (এতে আবার কেউ যেন মনে ক'রবেন না যে মানুষের শারীরিক বলের অপমান করা হ'ল,) সেটা যে ক্ষেত্রান্তরে মহোপকারী সম্পদ তাতে আমার সম্পূর্ণ সায় আছে, তবে এক্ষেত্রে বা বিষয়ে অন্য কোন দিক্ আছে কিনা দেখে নেওয়া দরকার তাই এ অবান্তর কথার উৎপত্তি। তারপর যারা চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়াতি ইত্যাদির দ্বারা সমাজের বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানোর মত সুখ-সম্ভোগের চরম সীমা অধিকার ক'রে ব'সে আছে, তাদেরও শ্রেষ্ঠাসন দিতে আমাদের মধ্যে কেউ হয়ত রাজী হবেন না, কিম্বা যে বা যারা গুণ্ডামী ষণ্ডামী দ্বারা জন-সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে শোষণাদি চালাচ্ছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্বও বোধ হয় কেউই আমরা প্রাণ খুলে স্বীকার কর্ত্তে চাই না, অবশ্য বেকায়দায় না পড়া পর্য্যন্ত। তাহ'লে আর বাকী রইল কি? বাকী মাত্র মানুষের কর্ম্ম—কর্ম্ম বল্‌তে অবশ্য যে যার নিজ নিজ বিলাস-বাসনা চরিতার্থ ক'রবার জন্য যে কর্ম্ম সেটাকেও ঠিক কর্ম্ম বলে ধরা যায়না, কারণ সে কর্ম্ম তো আমার প্রলোভন আমার ঘাড় ধরে ক'রিয়ে নেবে, আর সে সব ধ'রতে গেলে ভাগীদারের দল আরো অনেক বেড়ে যায়, কারণ সে ক্ষেত্রে জীব-জন্তু, পোকা-মাকড় আদি অন্যান্য প্রতিবেশীদেরও বাদ দেওয়া চলেনা, বরং সময়বিশেষে এমনও সন্দেহ জেগে ওঠে যে, এ কর্ম্মক্ষেত্রে কারা চালাক্ বেশী—প্রতিবেশী জন্তু জানোয়ারগুলো—না—বুদ্ধিমান আমরা? বেশী বুদ্ধি খেলাতে গিয়ে,—হ্যা⋯ ⋯কি বলে⋯অকর্ম্ম কিছু করচি নাত? যাক্ এই সব কথা, এইবার বোধ হয় বুঝিয়ে ব'লতে পেরেছি—যে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? এখন হয়ত আপনারা ওটাকে এক কথাতেই সেরে নিতে পারবেন।

তবে এর সঙ্গে বাদ পড়ে রইল একটা জিনিষ, সেটা হ'চ্ছে ধার্ম্মিকের

ধর্ম্ম, ওটাকে এখন ইচ্ছে ক'রেই বাদ দেওয়া গেল, এই জন্যে যে উপস্থিত জগতে ও বস্তুটী জাত হারিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ আসলে ওটার মানেই আমরা কেউ বুঝিনা।

কতকগুলি জিনিষের দোষ গুণ অল্প বিস্তর বাদ সাদ দিয়ে হয়ত নিলেও নিতে পারা যায়,—কিন্তু কোন একটা ভাল জিনিষ যখন কলুষিত হ'য়ে পড়ে তখন আর তাকে কেউই গ্রহণ কর্ত্তে পারেনা বা সাধারণে চলেওনা আমাদের ধর্ম্মের হ'য়েছে এখন সেই অবস্থা। হয়ত ধার্ম্মিকদের ধর্ম্মকে এমন ক'রে হেনস্তা করায়, অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নাচতে নেমে ঘোম্‌টা টানলেই বা চলে কই! যাক্‌ মোটের উপর এদের উপর সকলের যে খুব একটা আস্থা আছে, বলে মনে হয়না কারণ "ফলেন পরিচীয়তে"। তারপর যাঁদের উপর প্রকৃত আস্থা স্থাপন করা যায় এযুগে তাঁদের অর্থাৎ বিদ্বানদের অবস্থা আরো কাহিল. চাণক্যের যুগে হয়ত ছিল যে "বিদ্বান্‌ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এ যুগে তাঁরাই সকলে পেছনে প'ড়েছেন, লোক সংগ্রহে এরা মোটেই সমর্থ নন্‌; বাকী সুধু সন্ন্যাসীদের কথা তো আমাদের আলোচনায় স্থানই পেতে পারেনা, কারণ তারা তোমাদের আমাদের সকলকার সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ি আলাদা ক'রে নিয়ে, আদান-প্রদানের রাস্তাই মেরে রেখেছেন, কাজেই তাদেরকে নিয়ে টেনে বোনা আর চলেনা, তাই নয় কি ?

বরং এ যুগে মেনে চল্‌তে হ'লে বৈজ্ঞানিকদের মেনে চলার দাম আছে, তাঁরা শাঁকের করাতের মত দু'দিকেই কাটেন, আবার নিজের মৃত্যুবাণ নিজে তৈরী ক'রে পরের হাতে দিয়ে পরখ্‌ ক'রে দেখার সাধও আছে। ও দিকটা বাদ দিয়ে যেটা তারা, অপামর সাধারণকে দিয়েছেন সেই দিক্‌ দিয়ে তাঁদের দেওয়াটার একটা দাম আছে, যার জন্যে মানতে

ব'লচি। আমরা যা নিয়ে আলোচনা করচি অর্থাৎ চুম্বকের গুণাগুণ নিয়ে, তাতে তাঁদের মত হ'চ্ছে, যখন চুম্বকের অনুকোষগুলির দৃষ্টি স্বার্থান্ধ হ'য়ে কেন্দ্রাপসারি হ'য়ে পড়ে, তখন তারা পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে নিপীড়ন কর্ত্তে থাকে গণ্ডীবদ্ধ হ'বার জন্য ; ফলে ক্রমশঃ সমষ্টি শরীর থেকে শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্ধ অনুকোষগুলিও আস্তে আস্তে সমষ্টি-শরীরের কথা ভুলে গিয়ে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে। যদি স্বাভাবিক নিয়মে ঐ শরীরের অবসর (মৃত্যু) কাল উপস্থিত না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ঐ শরীর মধ্যেই কতকগুলি সম্বিৎসম্পন্ন জীবকোষ যারা জাগরিত থাকে, যাদের কথা আগে হয়ত বিষেয় মত লাগত এখন আবার তাদেরি কথা মধুময় হ'য়ে ওঠে—নিমজ্জিত লোকের তৃণ আশ্রয় করার মত, এখন তাদের নির্দ্দেশ মেনে নিয়ে, পরস্পর বিবাদমান অনুকোষগুলি আবার কেন্দ্রাভিসারি দৃষ্টি ফিরে পায়, তাতে নিজেরাও যেমন বেঁচে যায় ও শক্তি সামর্থ ফিরে পায়, তেমনি আবার সমষ্টি শরীরকেও অতুল প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে তখন সেই সমষ্টি শরীরও তাদের ধ'রে এনে দেয় অনন্তের সম্পদ। তাই বলি কি এদের বরং মেনে নেওয়া চলতে পারে শুধু মতটার জন্য কি বল ? আর যারা সম্বিৎ-সম্পন্ন তাদের উপমা উদাহরণ দিয়ে স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়ার কোন আবশ্যক না থাকলেও আমাদের দরকার প'ড়েছে বন জঙ্গল কেটে অভিপ্সিত স্থানে পৌঁছবার মত একটু রাস্তা ক'রে নেওয়া। তাই এত আজ বাজে কথার অবতারণা।

এইখানেই আমাদের অর্থাৎ মানব গোষ্ঠির ধাতুগত ত্রুটী বিচ্যুতির অধ্যায় ব'লে শেষ ক'রলেই হ'ত কিন্তু ইতিপূর্ব্বে প্রশ্নের জবাব দেবার অছিলায় যেমন আসল কথা চাপা দিয়ে পাশ কাটিয়ে আসা হ'য়েছে,

যার কিছুই এখন পর্য্যন্ত বলা হয়নি, এগুলো নিয়ে আলোচনা করবার আগে আরো দু'একটা কথা সেরে নেওয়া দরকার, কারণ এর পর আর খাপ খাওয়ানো চলবেনা—অবান্তর হ'য়ে প'ড়বে।

ইতিপূর্ব্বে যে সম্বিৎসম্পন্ন জীবকোষ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, মানব সমাজে তাঁরাই কর্ম্মীপর্য্যায়ভুক্ত শ্রেষ্ঠ মানব। মানব সমাজে যখনই কোন সামাজিক, নৈতিক কি ধর্ম্ম সংক্রান্ত কিম্বা রাজনৈতিক ব্যাপারে আবর্জ্জনা জমে গিয়ে মানবগোষ্ঠির সাধারণ স্বাস্থ্যকে বিষাক্ত ক'রে তোলে বা চোরের ভয়ে বাহিরে আলো হাওয়া প্রবেশের পথগুলি বন্ধ ক'রার ফলে, অন্ধকারে নিজে নিজেই যখন হাঁপিয়ে উঠে কিম্বা মানবের অভীষ্ট লক্ষ্য ক'রে চলার পথে যখন পাথেয় শূন্য হ'য়ে প'ড়ে দস্যু তস্করের উপদ্রবে, তখনি এই সব সম্বিৎসম্পন্ন জীবকোষগুলির অভ্যুথান হয়।

আর ঐ সব উপদ্রবগুলি মানবগোষ্ঠি শরীরের সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ। আর এগুলি হবার কারণ হ'চ্ছে মানবের পরমুখাপেক্ষী ভাব প্রবণতা; অর্থাৎ যখন তারা অমিতব্যয়ীর ন্যায় কর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে নিস্বঃ হ'য়ে পড়ে, তখন খুঁজে বেড়ায় কিসে একটু ফাঁকি দিয়ে কাজ সারা যায়—একটু আরাম একটু অবসর—এরি প্রত্যাশায়। "যিনি খান চিনি, তার চিনি যোগায় চিন্তামণি", জগতে অভাব কিছুরই নেই, সেই অবকাশটুকু লক্ষ্য ক'রে সেতোর দলও ঠিক্ হাজির থাকে, যেই ডাক দেওয়া—"সেতো ভাত খাবি?" কোনো কিছুর অপেক্ষা না ক'রে, অমনি উত্তর আসে "আজ্ঞে হাত ধোব কোথায়?" একেবারে অছির দলকে-দল এসে হাজির হয়না। সেই একটু অবসরের প্রত্যাশায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, উপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব সঁপে দেয় অছির দায়িত্ব জ্ঞানের উপর বিশ্বাস ক'রে।

তারপর অছিরা অছিত্বের দায়িত্ব দেখিয়ে, গচ্ছিত বস্তুগুলিকে সুসংরক্ষিত করার অছিলায় ক্রমশঃ নানারকমের আইন-কানুনের কড়া পাহারার ব্যবস্থাদি দেখিয়ে গচ্ছিতকারিদের খুব খুসি ক'রে দেয়, তাই না দেখে ঐ গচ্ছিতকারীরা নাসিকায় সর্ষপ তৈল সংযোগে একটা কিছু ক'রে ফেলেন। তারপর?—তারপর "পি-পু ফি-সু"। এদিকেও সংস্কারের পর সংস্কার অব্যাহত গতিতে চ'লতে থাকে, যখন সংস্কারের ঠেলা কণ্ঠায় এসে হাজির হয় তখন না "দে জল দে জল।" এই জলটুকু এগিয়ে দেওয়াই প্রথম কাজ—তার পরের কাজ? সে ঐ সব নিদ্রোত্থিত বিশ্বম্ভরদের ;—তারাই ঐ সব ঠিক করে নিতে পারে কিন্তু এদের বোঝায় কে? ঝোড়া কোদাল দিয়েও সে হয় না।

তোমার আমার শারীরিক অসুস্থতার সময় যেমন চিকিৎসক দরকার হয় তেমনি বৃহৎ শরীরেরও চিকিৎসক আছে, তারাও নিযুক্ত হয় কোন এক অজানা মালিকের দপ্তরখানা থেকে। এসে যখন তারা যে যার নিজের দায়েই রোগের অনুসন্ধান কর্ত্তে থাকে যে এ রোগের মূল কি? যদি কাউকে জিজ্ঞাসা কল্লে, যে কেন তোমরা এমন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছ, তোমাদের প্রকৃত অভাব কি? রোগের কোন হদিস্ না দিয়ে, কেউ ব'লে সুখ নেই, কেউ হয়ত ব'ল্লে শান্তি নেই কেউ বা বল্লে কর্ম্মফল ভোগ হ'চ্ছে—এম্নিতর আবোল-তাবোল প্রলাপ বকে বিকার গ্রস্তের মত—যা তারা অধিকরণদের কাছে পড়া পাখির মত শুনে শিখেছে, তাই উদ্গিরণ করে দেয়। তখন কর্ম্মিদের অবশ্য বুঝতে বাকি থাকেনা যে, এরা যখন নিজে নিজে খেয়ো-খেয়ি করতে ব্যস্ত, অবসর বুঝে "সাধুরা" এদের "যথা সর্ব্বস্ব" অর্থাৎ সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি সবেরই মূলে "স্বাধীনতা" ব'লে যে বস্তুটি গচ্ছিত রেখেছিল তাকে হজম করে ফেলেছে।

তাও কেউ যদি বোঝাতে চেষ্টা করে যে ওহে বাপু, তোমরা যা ব'লচ ওটা ঠিক্ নয়, তোমাদের সুখ শান্তিও হারায়নি,—হারিয়েছে ও সবের মূলে যে স্বাধীনতা তাই। তোমাদের গোষ্ঠি "পুরুষরা" স্বীয় অধ্যবসায়ের বলে যে বস্তু সংগ্রহ ক'রে তোমাদের হাতে ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন,—আদান-প্রদান দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধনার্থে,—আর মূর্খ তোমরা অবসর গ্রহণের আবার সেই বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অপাত্রে ন্যস্ত করার ফলে আজ তোমরা দীনের দীন।

এই আয়াসলব্ধ স্বাধীনতা বস্তু যাতে মরুভূমির মাঝে ছড়িয়ে প'ড়ে, আত্মগোপন না করে—সমষ্টিকে নিয়ে চলার পথে, পরস্পর পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা ও আদান-প্রদান দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করত উত্তর উত্তর মহান লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে—এরি জন্য গড়েছিল সমাজ—গড়েছিল ধর্ম্ম—গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্র—গড়ে উঠেছিল নীতি! উদ্দেশ্য মহান্-স্বাধীনতাকে বা মানবের মানবত্বকে রক্ষা করা।

যার উদাহরণ দিতে হ'লে বল'তে হয় গঙ্গোত্রীর কথা, যার উৎপত্তির স্থান হচ্চে "মানস সরোবর" তারপর সেই পাহাড়ি মেয়ে "গোমুখ" নিসৃত হ'য়ে মুক্তধারা যখন ঝরে পড়ল ধরণীর অঙ্গে—সগর সন্তানদের মুক্তির জন্য। সে তার কাজ সেরে, থেকে গিয়েছিল ধরণীর বক্ষে কৌস্তুভের মতই, কিন্তু তা সইল না আমাদের (মানব গোষ্টির) বুকে * * * * এখন তাকে খুঁজলে দেখতে পাই প্রবাহহীন ঘোষেদের গঙ্গা, বা বোসেদের গঙ্গা নামে এক একটি কূপ মাত্রে পরিণত—তাও হয়ত বা ব্যাঙের কৃপাতেই এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি।

এই রকম শুধু একটা বিষয় নয় আরো কতজন কত দিকে ভার নিয়েছিল অছিত্বের, সব ক্ষেত্রেই ঐ একই ফল অর্থাৎ সবাই ছিল চোরে

চোরে মাসতুতো ভাই, জোট পাট করে একেবারে পুকুরটাকেই চুরি ক'রে বসে আছে।

আজকাল এই জগৎ জোড়া অতশত চাহিদার মধ্যে মানুষের সত্যিকারের চাওয়ার মূল বস্তুটি কি তা বোধ হয় স্পষ্ট ক'রে কাউকে ব'লে দিতে হবে না যে, সেটী মানব-জীবনের জীবন-স্বরূপ তার "সর্ব্বাঙ্গিন স্বাধীনতা" (অবশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা নয়) আর ওটি সুধু তোমার আমার জন্য নয়, জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অণু, পরমাণু সকলেই ঠিক্ ঐটিকেই চায় একান্ত ভাবে,—তার সহজাত সম্পদকে যে যার মণি-কোটায় রেখে আত্মবান হবার জন্যে।

যা যায় তা আর ফেরেনা সত্যি, কিন্তু এ বস্তু যাবারও নয় হারাবারও নয়, অবহেলার ফলে দেশান্তরে প্রবাহিত থাকে মাত্র, তাকে খুঁজে বার কর্ত্তে হ'লে, চাই আকুল আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা, দৃঢ়তা। হয়ত বা সে হারানো জিনিষ আমাদের সামনেই প'ড়ে আছে, আমরা নিজেরাই আত্মবিস্মৃত হওয়ার দরুণ চক্ষে মোহের আবরণ থাকায় তাকে চিনে নিতে পারচিনা—আর সত্যিই যদি চেনা না থাকে তাকে হয়ত বা হাতে পেয়েও পথে ফেলে দিয়ে আসবো।

আরো একটা কথা বা জিনিষ আবার চেয়ে চিন্তেও পাওয়া যায়না—কেউ কাউকে হাতে ক'রে তুলে'ও দিতে পারেনা ;—একমাত্র পাবার উপায় হচ্ছে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আর ঐকান্তিকতা।—সুধু তাই কেন দুটার কথা বাদ দিয়ে, যে কোন বস্তুই এমন কি একটা তৃণ পর্য্যন্তও দুর্ব্বলের কথায় কর্ণপাত করেনা,—কারণ দুর্ব্বলতাই জাগতিক আইনে শ্রেষ্ঠ পাপ, আর যাচিঞা মাত্রেই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, তা সে যে কোন রকমেই হোকনা কেন! অতএব হে বন্ধুগণ, হে "অমৃতের পুত্রগণ"

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"·········কি উপায়ে ?······ ভুলে যাও ভেঙ্গে ফেল ব্যষ্টির গণ্ডী, বুকে আঁকড়ে ধর সমষ্টিকে। সেইত মহাশক্তি! তখনি—তখনি তোমরা হ'বে বিশ্ববিজয়ী—জ্ঞাতব্য প্রাপ্তব্য যা কিছু তখন আপনি এসে ধরা দেবে ঐ শক্তি কেন্দ্রে, আর ঐ যে সর্ব্বস্ব যা হারিয়ে আজ এত দীন, তাকে পেতে আর তোমাদের যেতে হবেনা অনুসন্ধানে, তার চিরবাসই হচ্ছে ঐ মহাশক্তির বক্ষে!!

ঐ মহাশক্তিকে উদ্বোধিত করতে হ'লে চাই—যে সব অস্থি-সংস্কৃত পাশ আজ প্রত্যেক ব্যষ্টিকে পাস ফিরতে দিচ্ছেনা, আগের ভাগে সেই সেই বন্ধন গুলিকে ছিন্ন করা, যা সমষ্টিগত জীবন লাভের একান্ত অন্তরায়। হে মহাশক্তিধরগণ! যাকে তোমরা—নাগ-পাশের মত কঠিন বলে মনে কর সে যে একান্তই অলীক,—তোমার অনিরুদ্ধ শক্তির কাছে ওর অস্তিত্ব কোথায়? ওযে কেবল অস্থি ঐন্দ্রজালিকদের মায়া "মায়া রজ্জু মাত্র," যার অস্তিত্ব কেবল তোমার আমার কল্পনা রাজ্যেই প্রতিফলিত হয়,—কুসংস্কার বশে রজ্জুতে সর্প বোধের ন্যায় একান্তই অলীক।

আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয় আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংসার জ্ঞান, অর্থাৎ কর্ত্তব্যবোধে মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজনাদির প্রতি আত্মবিক্রয়। কর্ত্তব্যবোধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিধি-নিষেধের ফাঁস গলায় পরে কলসীর জন্য অপেক্ষা করা। ধর্ম্ম বোধে অধর্ম্মের দ্বারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আর শিক্ষা দীক্ষার নামে আত্মপ্রবঞ্চনায় পোক্ত হওয়া।—তারপর রাজা আছে, প্রজা আছে, স্বকৃত পরকৃত আরো অনেক কিছু আছে, যা আমরা স্বেচ্ছায় অলঙ্কার বোধে গলায় প'রে ভদ্র সমাজের নামে তারিফ ক'রে

বেড়াচ্ছি। এ সবের বাঁধন ছিড়তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঐ সব গুলির মূলসূত্র কোথায়, কিসের উপর ভিত্তি ক'রে ঐ সবের সৃষ্টি হ'য়েছিল,—তা না ক'রে যদি মূল আদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে প'ড়ে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তা হ'লে মানবের স্বর্গপথ চিররুদ্ধ হয়ে যাবে, তা হ'লে কিন্তু প্রকৃতির সুচ্ছৃঙ্খলিত রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে ডেকে এনে আত্মনিগ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখানো হবে। সাধু সাবধান! এ বন্ধন ছেদনের উদ্দেশ্য আর কিছুই না নিজেকে মুক্ত রাখা, তা হ'লে বুঝে নেওয়া দরকার হয় যে তুমি যদি কারো বন্ধনের কারণ না হও, তা হ'লে তোমারও কারো তরফ থেকে বন্ধন পাবার আশঙ্কা থাকবে না। তদ্বিপরীতে এটুকুও বুঝে নেওয়া দরকার, এই যে সব নানা রকম স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, এর কোন অর্থ হয়না কারণ একজন হাত পা বাঁধা লোক আর একজনের বন্ধন মোচন করে দেবে, কথাটা কেমন কেমন শোনায়।

আমরা সাধারণত এই প্রকৃতির ব্যক্তিদেরই শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে নিই যাঁরা দশের জন্য অন্ততঃ কতকগুলা বন্ধনের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন যদি প্রশ্ন হয় যে এ বন্ধনের স্বরূপ কি? কেই বা বাঁধা পড়ে? এখন সেই সব কথাই ক্রমশঃ এসে প'ড়ছে।

আগে যে স্বাধীনতার কথা বলা হ'ল, তাকে আমরা স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান বা মানবত্ব লাভের প্রথম অধ্যায় ব'লেও ধরে নিতে পারি। তারপরই দেখা যায় ঐ স্বাধীনতাকামীরা, যারা একবার স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে, তারা শুধু পার্থিব-স্বাধীনতাকে লাভ ক'রেই সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, তখন তারা প্রাকৃতিক বন্ধনকে সব চেয়ে দৃঢ়তার বন্ধন ব'লে মনে করে আর কিসে সেই বন্ধন ছিন্ন ক'রে প্রকৃষ্টতর স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তার প্রতিকারের জন্য দ্বিগুণতর উৎসাহে আত্মনিয়োগ

করে, কারণ যারা সত্যিই স্বাধীনতার কতকটা আস্বাদও পেয়েছে, মানুষের কল্পিত নিগড়ের চেয়ে প্রাকৃতিক নিগড় যে আরো দুর্ব্বহ তা তারা সহজেই বুঝতে পারে। কাজেই প্রকৃত বীরহৃদয় নদীর মত বাধা পেয়ে আরো স্ফীত হ'য়ে ওঠে, নৈসর্গিক বাধাও আর তখন তাকে টলাতে পারে না। বীরদের এইরূপ দুর্দ্দমনীয় অভিযানের ফলে প্রকৃতির অনেক কিছুই এসে পড়ে মানবের অধিকারে। ঐরূপ প্রচেষ্টায় আংশিকতার ফলে আজ মানব-সভ্যতাকে আমরা দর্শন, বিজ্ঞান, কলাদিরূপ অমূল্য-সম্পদ-সম্ভার-অলঙ্কৃত দেখতে পাই, এই হ'ল মানব সভ্যতায় পার্থিব স্বাধীনতার স্থান ও এইখানেই তার শেষ, আর মানবত্ব বিকাশের সূত্রপাত। যারা এই সভ্যতা নিয়েই মস্‌গুল থাকতে চায় তাদের আর এগিয়ে দেখার দরকার নেই, তাদের পক্ষে সেটা পণ্ডশ্রমের মতই হবে কিন্তু যারা বাহ্যাড়ম্বরের ভিতর না গিয়ে সাদা সিধেভাবে মানবত্বের পরিচয় নিতে চায় তাদের আরও একটু ঠাণ্ডা মেজাজে আর একটু বিচার বুদ্ধি সঙ্গে নিয়ে এইবার এগুতে হবে।

প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ জানতে হলে এইবার আমাদের দর্শন নামীয় অদ্ভুত বস্তুটাকে নিয়ে নাড়া চাড়া কর্ত্তে হবে। এখানে অবশ্য দর্শন নাম শুনেই আমাদের ভয় পাবার মত কিছু নেই; আমার মনে হয় আসলে ওর ব্যবহার বিধি ভুলে যাওয়াতেই আজ ঐ অদ্ভুত বস্তুটী আমাদের ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, নাম শুনেই গা আড়াল দেবার ইচ্ছা হয়। একটু পর্য্যালোচনা ক'রে দেখলে মনে হয় যে, আমরা যা ভাবি তা নয় ওটা একটা সাধারণ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কতকগুলি অতি সহজ ও প্রকৃষ্টতর নিয়ম কানুন বা প্রণালীমাত্র, যা প্রকৃতির রাজ্যশাসনে অনুক্ষণ নিয়োজিত রয়েছে। তা জেনেই হ'ক আর অজানতেই হ'ক ব্যতিক্রম

ক'রলে তার প্রতিফলের হাত এড়ান যায় না; এম্নিতর প্রাকৃত আইন-কানুন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা যে গ্রন্থ মানব সমাজে প্রচার করে গেছেন তারই নাম দর্শন। অতএব ভয় পাবার কিছু আছে বলে ত মনে হয় না। তাও বলি যদি কিছু থাকেই, কোঁৎকা দেখে পালানটাও ত মরদের কাজ নয়? একবার না হয় চোখ-কান বুজে দেখাই যাক্ না—ঘটিটা নেয়, কি বাটিটা নেয়? আর যদি সত্যিই ওর কোন মূল্য না থাকে দেখা যায়, তা নিয়ে লাঠালাঠি হবার পূর্ব্বাহ্ণেই ওকে সাগর পার ক'রে দিয়ে আসা যাবে; তার জন্যে চিন্তা করবার কিছু নেই।

আসলে জিনিষটা যে ছিল অক্লান্তকর্ম্মীদের মহান্ প্রচেষ্টার ফল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, তবে কিনা ভাব-বিলাসীদের হাতে প'ড়ে এর অনেক দুর্গতি ও বিকৃতি ঘটেছে বটে, কিন্তু আসলকে কোন কিছুতেই চাপা দিতে পারেনি, বরং তার সংস্পর্শ পেয়ে যত সব ছাই ভস্ম গুলাও ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে, একেই বলে মহতের আশ্রয়, কি বল?

এটাকে কর্ম্মীদের বলার মানে আর কিছু নয় কারণ, আসলে ব্যাপারটা হ'চ্ছে আত্যন্তিক "স্বা"ধীনতাপ্রিয় সবল চিত্ত মানবের অভীষ্টকে খুঁজে বার করে আন্তে দুর্ব্বলের শক্তি কোথায়? যে একবার "স্বা"ধীনতার সূত্রটুকুকে ধ'রে পথান্বেষণে কর্ম্মকেই বরণ ক'রে নিয়েছে, সে ছাড়া মূলের সন্ধান নিতে কার সাহসে কুলাতে পারে?—সে যে আর তখন কারো বাঁধনই মেনে নিতে পারে না, সেই জন্যেই না তারা "স্বা"ধীনতার সন্ধান কর্ত্তে গিয়ে মুক্তিলাভ ক'রেছিল। আর আমাদের প্রকৃতিরাণীরও এম্নি অদ্ভুত স্বভাব; এই সব দুর্দ্দান্ত ছেলেদের অপহরণের জন্য শাস্তি দেওয়া চুলোয় গেল, বরং তারাই হ'য়ে উঠলো কিনা শেষে তাঁর রাজ্যের আলালের ঘরের

দুলাল ; অনন্ত ভাণ্ডারের চাবি কাটিটি পর্য্যন্ত তুলে দেয় তাদের হাতে, বেশী কথা কি নিজেও মেনে নেয় তাদের শাসন ! হায়রে শক্তি ! তোমারই জয় জয়কার চতুর্দ্দিকে ; শান্ত ধর্ম্মভীরু আমরা আমাদের দিকে ফিরে দেখার মত অবসর কারো হয় না।

জীব মাত্রেরই তথা মানবের সাধারণ প্রগতিই হ'চ্চে স্তর থেকে স্তরান্তরে এগিয়ে যাওয়া, তা সে ভালই বা কে জানে আর মন্দই বা কি ? পূর্ব্বে আমরা আলোচনা ক'রে এসেছি যে, জীবমাত্রেই স্বাধীনতাকামী, তেমনি তাদের আর একটী আত্যন্তিক স্পৃহা হ'চ্চে আত্মপ্রতিষ্ঠার,—এ চাওয়ার কোন দোষ-ঘাটের কথা বল্‌চি না, তার মীমাংসার জন্যে রকমটার একটা নক্সা দেওয়া দরকার হ'য়ে প'ড়েছে প্রথমেই।

ধরা যাক্, আমরা কোন এক নদীকূলে ব'সে আছি ; ইতিমধ্যে ঐ নদীতে বান এসে প'ড়েছে, দেখা গেল সেই বানের মুখে দেশ-দেশান্তরের কত কি ভেসে চ'লেছে, তার সঙ্গে দেখা গেল যে এক গৃহস্থ পরিবার বন্যাতাড়িত হ'য়ে দ্রুতগতিতে ভেসে চ'লেছে অকূলের পানে, তাদেরি একখান গৃহচাল্‌কে আশ্রয় ক'রে যারা নিহাতই রক্ষা পেয়েছিল বিপর্য্যয়ের হাত থেকে—তখন যদি দেখা যায় যে সেই গৃহস্থটী ভাসমান্ চালের উপর ব'সে বানে ভাসা জিনিষপত্র কুড়িয়ে তাংড়াতে সুরু করেছে নিজেদের অবস্থা ভুলে গিয়ে, আর পাছে আবার কেউ ভাগীদার জোটে সেই ভয়ে তার বসবার মত যায়গাটুকুর চারিদিকে আল-আঁটন দিতে সুরু ক'রেছে প্রতিষ্ঠালাভের আশায়, তা হ'লে বলত' ভায়া, তাদের দেখে কি করা কর্ত্তব্য, হাসবো না কাঁদবো ?

এখন কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ধরে দেখা যাক্ অর্থাৎ নিজেদের উপর আরোপ ক'রে ;—যে ধর আমরা যেমন নদীতীরে ব'সে বানের গতিও

তার বক্ষে ভাসমান যাত্রিদের লক্ষ্য ক'রছিলাম, তেমনি কালস্রোতের তীরে ব'সে কেউ যদি আমাদের ঠিক্ ঐ কর্ম্মই কর্ত্তে দেখে তারা আমাদের বুদ্ধির মর্য্যাদা কতখানি দেবে? এম্নিতর বুদ্ধি নিয়েই না আমরা বড়াই করে থাকি? প্রতিষ্ঠা চাই ঐ চালের উপর! এ বুদ্ধির বালাই দোবই বা কাকে নেবেই বা কে?

তারপর ধর মানবত্বের কথা দূরে রেখে, যদি "মানব" কথাটারই মানে ধরা যায় (যদি প্রকৃতই তার কোন মানে থাকে?) তা হ'লে ত আরো অন্ধকার! কারণ যদি "মনজ" কথারই অপভ্রংশে মনব বা মানব কথার উৎপত্তি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমাদের উপাধি হওয়া উচিত "দেহজ" বা দেহব। তাহ'লে কিন্তু সত্যিই বাঁচা যায় অনেক নটখটির হাত থেকে, অর্থাৎ বোঝা যায় যে এই জন্মকালো দেহ ও তার উপাধির এইখানেই শেষ বা যেখানে উৎপত্তি সেইখানেই নিবৃত্তি,—নে বাবা যার যা খুসী দিন-কতকের জন্যে আশা মিটিয়ে ক'রে নে, মিছে প্রতিষ্ঠার বালাই নিয়ে, আত্মনিগ্রহ করা। এটাত আমরা জানি আর চাক্ষুষ দেখতে পাচ্চি যে, জন্ম-মুহূর্ত্ত থেকে সেই যে "যম" আর "যমি" পিছু নিয়েছে, আর ডালকুত্তার মত লেলিয়ে দিয়েছে তার ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি যমদূতগুলোকে, তারা তাদের প্রভুর ইঙ্গিত মত শীকারটীকে "মৃত্যু" নামক অন্ধকূপে না নিক্ষেপ করা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি ত দেবেই না, তা ছাড়া নিমেষের জন্যও তাদের না আছে অবসাদ না আছে ক্লান্তি, এমন কি ভুলবশতঃও তাদের না আছে কোন বিলাস—যে অবসরে একটু বিশ্রাম নিতে পারা যায়! তা যখন হবে না তাহ'লে আর এই কতক্ষণের জন্যে এটা ওটা নিয়ে বৃথা মাথা ঘামান, যখন মৃত্যুই সবের শেষ পরিণতি, বরং এই চলার পথে যতটুকু ভোগবিলাস সেরে নেওয়া যায় ততটুকুই লাভ, কি বল?

না। তাও ত লোকে শোনে না,—বলে, কে যেন ভিতর থেকে কেঁদে ওঠে, নিশ্চিন্ত ’ত থাকৃতে দেয়ই না—বরং আকুল-আহ্বানে ডেকে বলে, আমায় প্রতিষ্ঠা কর—আমায় প্রতিষ্ঠা কর। তখন নিরুপায় হ’য়ে বেরিয়ে প’ড়তে হয় অজানার পথে, তখন তার টানে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে খানায়-ডোবায়, কেউবা ঘুরে বেড়ায় এর দোর তার দোর, আবার কারো ভাগ্যে সাথী মিলে গেল ত’ চল্লো হরিদ্বার, গঙ্গাসাগর।

হে বন্ধো! ভিতরের ঐ আকুল আহ্বান কি বলে জান যে, হে মানব! তোমরা মানবকুলে জন্মেছ মানবত্বের প্রতিষ্ঠা কর, তাতেই আমার প্রকৃত-প্রতিষ্ঠা হবে.—হে মানব ওঠ, বর নাও, দর্পণে দেখে নাও তোমার “স্বরূপ” মানবত্বের মহিমাময় অপরূপ রূপ, যার কাছে দেবত্ব বা শিবত্ব সবই নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ ডাক তারাই শুনেছে যারা কর্ম্মী, যারা “স্বর্গাদপি গরীয়সী” মায়ের অনুজ্ঞা লাভ করেছে, যারা তাঁর অনির্ব্বচনীয় মহিমাময় শক্তির ছোঁয়াচ পেয়েছে।

যারা মানবত্বের দাবি রাখে তাদের উচিত, প্রথমে মাতৃ-অনুজ্ঞালাভ করা; মাকে অবহেলা ক’রে কেউই কখনও বড় হতে পারেনি পারবেও না। দশের সেবাতেই তাঁর সেবা, তা সে যে যতটুকু পারে করুক যে রকমে ইচ্ছা, সেইটুকুই তার করণীয় কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য-পালনই মানবত্ব লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।·· অন্য পন্থা ? ··অন্য পন্থা আছে কিনা জানি না।

যাকে আশ্রয় ক’রে বহির্জ্জগৎ (বা ব্যবহারিক জগৎ) ও অন্তর্জ্জগৎ (বিজ্ঞানময় জগৎ) এককালীন উদ্ভাসিত হ’য়ে রয়েছে তিনিই মনব পদবাচ্য বা ‘মানব’। কারণ মন+বহির্জ্জগৎ নিয়ে যে “আমি” বর্ত্তমান থাকি উহা ভাবানুপ্রাণিত “জীব” মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার যখন মন+অন্তর্জ্জগৎ নিয়ে “আমি” থাকি তখন উহা শিব পদবাচ্য

(এই শিবরূপী "আমি"ই সাধারণতঃ ঈশ্বর নামে পরিচিত বরদরূপী প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তি নিজেকে নিজে অভীষ্ট প্রদানের কারণ হন)। অনেকেরই ধারণা যে এই শিবত্বলাভই বুঝি আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তা মোটেই নয়। কারণ এতদুভয়ের কোনটীই পূর্ণ নহে, উহা কোন একটী চুম্বকের দুটী প্রান্তের ন্যায়, একটী কল্পিত হয়েছে ব'লেই স্বতই অপরটীও ফুটে উঠেছে আলোক আঁধারের মত একটী অপরটীর ভিত্তিরূপে। আর চুম্বকের দুটী প্রান্ত যেমন একটী কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে অবস্থিত, আর ঐ প্রান্তদ্বয় যেমন কেহই কাহারো চেয়ে কোন বিষয়েই ইতর-বিশেষ নয় ও একই বস্তু কেবল আমরা স্বেচ্ছায়, উহার এক একটী প্রান্তকে, নিজেদের ইচ্ছামত নামকরণ ও দাম ধ'রে নিয়ে থাকি আবার একের অন্যটীর অস্তিত্বের পরিকল্পনাও হয় না,—"শিবত্ব" বা জীবত্ব ও তদনুরূপ কল্পনা-রাজ্যের ইতর বিশেষ মাত্র।

যে কারণেই হ'ক, অভ্যাসের বশে এতদুভয়ের মধ্যে যখন যেটী আমাদের পেয়ে বসে "জীবত্ব" কি "শিবত্ব", তখন সেইটিকে নিয়েই আমরা মাতালের মত আড় হয়ে পড়ি,—অপরাংশটী তখন সেই অবসরে ধীরে ধীরে স'রে যায় দৃষ্টির অন্তরালে, ছিঁড়ে যায় সেইখানেই মানবের মানবত্ব বিকাশের মূলসূত্র। যেমন চুম্বকের কোন একটী প্রান্তকে যদি বেঁধে রাখা যায়, সেই সঙ্গে যেমন তাহার কেন্দ্রটীও আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে আর সে চুম্বক যেমন দিক্ নির্দ্দেশে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আমরা মানবরা যে কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে মুক্ত থাকতে পারি, বুদ্ধির দোষে সেই মুক্ত কেন্দ্রটীকে দিই অচল ক'রে, ঐ এক দিকে ঢ'লে প'ড়ে;—কাজেই দিক্‌দর্শন-যন্ত্রের অভাবে এখন মানুষকে ঘুরে বেড়াতে হয়, দিগন্তের মাঝে দিশেহারা হয়ে, বিকাশের নিকাশ হ'য়ে যায় সেইখানেই। এখানে

বিকাশ ব'ল্‌তে এটা ঠিক্‌ই যে, আমাদের দুটা হাতের যায়গায় চার্‌টা হাত বা দুটা মাথা ইত্যাদি তেমন কোন একটা কিছু নয়, আর এ দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারটা যে কারো কাছে অবোধ্য নয় তাও ঠিক্; এখন প্রশ্ন হতে পারে, "বিকাশ" ব'লতে এখানে তাহ'লে কিসের বা কার বিকাশ নির্দ্দেশ করে ? কারণ "মানবত্বর বিকাশ" কথাটা খেয়ালীর খেয়াল ছাড়া কোন বিশিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে নির্দ্দেশ করে না! কথাটা খুবই সত্য, আর বিকাশ ব'ল্‌তে এখানেও বিকাশের মানে যা তাই বজায় আছে বা থাক্‌বে; অর্থাৎ অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণকেই বিকাশ ধরা হয়েছে, বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছের স্বরূপ যেমন সুপ্ত থাকে, আবার উপযুক্ত ক্ষেত্রেও জল হাওয়ার সংযোগে উপ্ত হ'য়ে উঠে, কিন্তু বীজকে শিকেয় তুলে রাখলে তার যেমন কোন কিছুই বিকাশ দেখা যায় না; আমাদের অবস্থা হয়েছে ঠিক্ তাই, আসল বীজকে আমরা শিকেয় তুলে ফেলেছি; তা থেকে যে আবার কিছু স্ফুরিত হ'তে পারে তা না দেখা পর্য্যন্ত আজ-কালকার দিনে ধারণা করাই চলে না, তা ছাড়া মস্ত অভাব হ'য়ে প'ড়েছে মালীর। তাহলেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকলেও ত চ'লবে না, বীজটীকে শিকে থেকে নামিয়ে ক্ষেতে ফেলে রকমারি ক'রেও দেখা দরকার—কিসে সুপ্ত বীজটী উপ্ত হ'তে পারে, কি বল ?

বাহিরের দিক্ থেকে খুঁজে পেতে পাবার মত যা কিছু, সে সব চুকে-বুকে গেছে ব'লেই মনে হয়, আর যে কিছু থাকতে পারে তার আশাও তেমন উপস্থিত ক্ষেত্রে কিছু নেই, কাজেই এখন আমাদের দেখতে হবে বাদ রইল কি ? বাদ পড়ার মধ্যে দেখা যাচ্চে যে এক 'মন'ই বাদ প'ড়ে আছে, সে সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা হয়নি তা ব'লছি না; তবে কিনা রাসায়নিক পরীক্ষাগারের test tubeএ তাকে পোরা যায়নি ব'লে

ব্যাপারটা এখনও ঠিক্ ব্যবহার উপযোগী হ'য়ে উঠেনি, মাত্র কয়েকজন ভাব-বিলাসীর বিলাসের বস্তুতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে আছে, উপস্থিত দিনে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কোন সুযোগ-সুবিধা নেই বল্লেই চলে, মোট কথা আমরা কেউই ওটীকে চিনি না বা জানি না ; তবে সকলে (মন) বলে বলেই যা আমাদেরও বলা। তা হলেও কিন্তু মনের বিকাশ অনুযায়ী যে আমাদের ভিতর ছোট-বড়'র পর্য্যায় গ'ড়ে নেওয়া হয় সেটাও বোধ হয় সকলেই বুঝি,—কারণ সব সময়েই ও সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্চি যে অনুশীলনের ফলে, একজন আর একজনের চেয়ে ভাবসম্পদাদিতে কতখানি মার্জ্জিত ও শক্তিধর হ'য়ে ওঠে! কোথায় তার উৎস ? সে ওই 'মন' বলে বস্তুটী নয় কি ?

প্রথমতঃ ঐ 'মন'কে অনাবাদের দরুণ যে বন-জঙ্গল চারিদিকে গজিয়ে উঠেছে, সেই বন থেকে খুঁজে বার ক'র্ত্তে যাওয়া যেমন অশেষ লাঞ্ছনাকর, তারপর বিনা অভ্যাস আয়াসে তাকে আয়ত্ব করাও ততোধিক কষ্টকর। শুধু চাওয়ার উপর নির্ভর ক'রেও ঠাকুরটীকে ধরা চলে না। শুধু এঁকেই বা কেন বলি, কোন কিছুই যে চেয়ে পাওয়া যায় না, তা আগেও বলা হ'য়েছে। শাস্ত্রও বলে "ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ," অথচ দুর্ব্বলের বল না চেয়েই বা যাই কোথায় ?

যদি দাতা ব'লেই কাউকে ধরা হয়, তিনি ত যা দেবার তা অপামর সাধারণকে সমানভাবেই দিয়ে রেখেছেন, সেখানে তাঁর কোন বৈষম্য বা কৃপণতা যে নেই তাও ঠিক্, তবে যার যেমনতর ইচ্ছা সে তাকে সেই রকমেই খাটিয়ে নেয়, নতুন ক'রে তোমাকে আলাদা বা আমাকে আলাদা দেবার মত নিজস্ব সঙ্গতি কিছু রেখে-ঢেকে রেখে দিয়েছেন সে স্বভাবও তাঁর নেই। তবে সত্যিই যদি এমন কোন দৃষ্টান্ত আমরা পাই যে, কেউ

শুধু চাওয়ার উপর নির্ভর ক'রে কোন কিছু পেয়েছে, সেখানে কর্ম্মীদের জানতে হবে যে, সে তার অদৃশ্য মনের দৃঢ়-সংকল্প থেকেই তা পেয়েছে অর্থাৎ তাকে স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি বলেই গড়ে নিতে হয়েছে তার অভীষ্টকে, তবে তখনকার মত সে হয়ত বুঝতে পারেনি বা ধরতেও পারেনি যে, সে নিজেই নিজের কাছে বরদরূপী সেজে এসে সিদ্ধি দিয়ে গিয়েছিল।

আর ঐ রকম হঠাৎ নবাবেরাই, "বেরালের ভাগ্যে শিখে ছেঁড়া"র মত ক্ষীর দই খেতে পেয়ে জন-সমাজে যা তা ব'লেই বেড়াতে থাকে, অপরকেও তাই কর্ত্তে বলে, ফলে লাখ করা একজনের ভাগ্যেও আর তেমনটী যোটে না। আর ঠিক তেমনিটী ক'রে যে অন্যের ভাগ্যে জোটা সম্ভব নয়, তা কেউ ভেবেও দেখে না, ফলে আপশোষ ও মনস্তাপই শেষ সার হয়। আসলে ঐ সব দুর্ব্বলচেতারা আসল বস্তুকে ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের মত দেখে ও তেমনি অত্যাশ্চর্য্য বস্তু ব'লে নির্দ্দেশ দিয়ে থাকে (হয়ত বা কোনখানে ভাঁড়ামিও থাকতে পারে) আর যাঁরা আজকালের দিনে তথাকথিত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁরা মানব-সমাজের সাধারণ-সূত্র ছন্ন ক'রে তত্ত্বান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন বনান্তরালে, আদান-প্রদানের যে একটা আবশ্যকতা থাকতে পারে, সে তাঁরা আমোলেই আনেন না। অথচ যাঁরা ছিলেন প্রথম তত্ত্বদর্শী, যাঁরা সাধারণের সঙ্গে আদান-প্রদান রাখা একান্ত দরকার ব'লে বুঝেছিলেন, সেই যে বোকার দল অকাতরে ডেকে হেঁকে বিলিয়েছিল আপামরকে, তাদের বহু আয়াসলব্ধ "অমৃতের ভাণ্ড"—যে, হে অমৃতের পুত্রগণ! ওঠ অমৃত গ্রহণ কর! তাঁদের তখনকার দিনের এই ধারণা ছিল যে, যে যা উপার্জ্জন ক'রে আনবে, স্বগোষ্ঠির সেটায় সমান অধিকার, অন্যথায় পৃথিবীর কাছে চৌর্য্য অপরাধে অপরাধি হ'তে হয়।

এইসব প্রাচীনেরা যা দিয়ে গিয়েছিলেন তাও যদি ঠিক্ বজায় থাক্তো, সে বরং ছিল ভাল ; কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যেমন বিলাস সেঁধিয়ে সেই সেই ক্ষেত্রকে অন্তঃসার শূন্য ক'রে ফেলেছিল, তেমনি ধর্ম্মের নামেও যে বিলাস এসে দেখা দিয়াছিল, বিলাসিদের সেই তখনকার দেওয়া অলঙ্কারাদিতে এমনভাবে ধর্ম্মের অঙ্গরাগ ক'রে দিয়েছিল যে, তার সেই ছোব তুলে আসল চেহারা বার ক'র্ত্তে মণখানেক সাবান সোডাতেও কেউ আর কুলোতে পারচে না ; ফলে এখনকার দিনের বিদ্বৎসমাজ তাই দেখে অর্থাৎ আসল নকলকে বেছে নিতে না পেরে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে সন্দেহ দোলায় দোল খাচ্চেন, আর গান গাচ্চেন।

যাদের নেওয়া না নেওয়ার উপর সাধারণের নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করে, তারাই যখন রইল পেছিয়ে, তখন 'অন্য পরে কা কথা'। বাকি যেটুকু থেকে গেল সেটা স্তরান্তরে অন্ধ-বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রেই রইল, তাই স্বগোষ্ঠি অমৃতত্বে বিশ্বাস একেবারেই হারিয়ে ফেল্লে, আর সেই সে দুর্ব্বলতার ফাঁকে বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হল, সাধারণ জীবত্বকে, তাই না আজ অপরিমেয়, অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত মানব আজ কুসংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে মৃত্যুকবলিত! আজ তারা সামান্য জীবধর্ম্মের উপাসক! যেখানে তেত্রিশকোটী দেবতার বসবাস ছিল সেখানে কোন একটী দেবতার সন্ধান মেলা দূরে থাক, একটী অপদেবতারও সন্ধান মেলে না। হ'তে পারে প্রাকৃতিক নিয়মে বা কালের অনুশাসনে আজ মানবগোষ্ঠির এই অবস্থা, তাহ'লেও আর ত অপেক্ষা করা চলে না মানব! ওঠ, হে মানব, তুমি জাগ্রত হও পৃথিবীর কল্যাণার্থে! বিলম্বে জ্ঞাতি-ধ্বংস অবসম্ভাবি! হে তরুণের দল, এগিয়ে প'ড়! ওই দেখ তোমাদেরই অতি প্রিয় আত্মহারা জনগণ আজ পশুভাবাবিষ্ট, প্রকৃতিপুঞ্জ অপ্রতিষ্ঠ,

আজ তারা প্রতি পদক্ষেপে অধীনতার দৃঢ়শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও ক্লিষ্ট, এ অধীনতা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয় বা ধর্ম্ম ও সমাজেই তার সমাপ্তি হয়নি, যা মানব নামের কলঙ্ক ; রিপু, রীতি, নীতি, ভাব, অভাব, স্বভাব, শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি সবেতেই প্রবলভাবে সংক্রামিত ও প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে ; আজ ওই সব আত্মীয়েরা এতই দুর্ব্বল যে বিনা সাহায্যে ওঠবার শক্তিটুকু তার মোটেই নেই, প'ড়ে আছে মাত্র মৃত্যুর অপেক্ষায়।

যাক্, ওসব অবান্তর কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা যা ধ'রেছি, তাই শেষ ক'রে নেওয়াই ভাল। আমাদের কথা হচ্ছিল "মন" নিয়ে, এখন ঐ মন বস্তুটী কি অপরূপ জিনিষ দেখা যাক্, বাস্তবিক্ই সহজে যার নাগাল পাওয়া যায় না,—অনবরত অভ্যাস ব্যতীত যার মর্কুটেপনাকে বাগে আনা যায় না, কেবলই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এ ডাল ও ডাল ক'রে বেড়ানই যার স্বভাব, আর যে বিষয়রূপ পাতার আড়ালে থেকে অনুক্ষণ মিট্ মিট্ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চে যে কেউ তার সন্ধান পেলে কিনা ? আবার এদিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকাটাও তার অভিপ্রেত নয়, যদি কেউ একটু অন্যমনস্ক মত হয়, তাহ'লে তখনই এমনভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঝাঁপা-ঝাঁপি কর্ত্তে থাকে যাতে সেদিকে না চেয়েও কেউ থাক্‌তে পারে না, অথচ পেছন ফিরে দেখে কোথায় কে ? গাছটাই শুধু বর্ত্তমান আর সব নিস্তব্ধ। কাজেই এমন জন্তুকে কায়দা কর্ত্তে হ'লে নিহাত সাদা-মাটা লোকের কর্ম্ম নয়, শিকারী হওয়া দরকার, বিষয়বুদ্ধি থাকা দরকার আর দরকার হাতের টিপ বা যাকে অভ্রান্ত লক্ষ্য বলা হয়। কারণ সে অর্থাৎ জন্তুটীও বিশেষ রকম ভাবেই জানে যে, সে যতই চালাক-চতুর হোক্ না কেন, রামের শরসন্ধানের মুখে তার কি অবস্থা দাঁড়াবে। তবে কিনা, রাবণের হাতে না ম'রে রামের হাতে মরা। তবে

তার সেই মরার অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাবণের গোষ্ঠিকে গোষ্ঠির হ'য়ে পড়ে সৎকারের ব্যবস্থা।

ইতিপূর্ব্বে "দেশ" অধ্যায়ে প্রাচীন দার্শনিকদের মীমাংসিত যে পঞ্চভূতকে নিয়ে নাড়া চাড়া দিয়ে দেখা হ'য়েছে তাতে দেখেছি যে, মাত্র পঞ্চভূতেরই রকমারি ইতর-বিশেষ সংমিশ্রনের ফলে উদ্ভূত বস্তু বা বিষয় দিয়ে আমাদের এই দৃশ্যমান জগতটা গড়ে উঠেছে। আরো দেখা হ'য়েছে যে ঐ ভূতগুলি অনুলোম ও বিলোম ক্রমে একটী অপরটীর উৎপত্তি ও লয়ের কারণ স্বরূপ হ'য়ে থাকে। এখন আর একবার না হয় বিষয়টাকে ঝালিয়ে নেওয়া যাক্। ধর অনুলোম হিসাবে মাটীকে যখন 'জল' তত্ত্বে লীন হ'তে দেখি, তখন আমরা কি বুঝবো? এই কথাই মনে হয় না কি যে 'মাটির' চেয়ে 'জল' সূক্ষ্মতর বস্তু এবং তার ঘনত্বও অনেক বেশী, আর সেই কারণেই মাটি জলকে আট্‌কে রাখতে পারে না, তাই আমরা মাটি খুঁড়লেই জল পাই? তেমনি 'জল'ও অনুলোম হিসাবে তেজে লীন হ'য়ে যায় ব'লে জানতে হবে যে জল অপেক্ষা তেজের সূক্ষ্মত্ব ও ঘনত্ব আরো অনেক বেশী, তাই সে জলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার ক্ষমতা রাখে, তা হলে এও আমরা ধরে নিতে বাধ্য যে, জল যেখানেই থাক্, মাটীর মধ্যেই থাক্, আকাশেই থাক্, আর বাতাসেই থাক্, যেখানে জল সেখানে 'তেজ'ও বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ 'তেজ' আবার বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয় ব'লে, তেজ অপেক্ষা 'বায়ু' আরো লঘু এবং তার ঘনত্বও তেমনি আরো বেশী, কাজেই তেজের যে জীবন—বায়ু, সে তেজ ও তেজ হ'তে নিম্নতর সব কয়টী তত্ত্বকেই অধিকার ক'রে রয়েছে;—সেইরূপ আবার বায়ুর যে লয়ের স্থান আকাশ রয়েছে তার যে, ঘনত্ব ও লঘুত্ব এদের সকলকার চেয়ে বেশী তার সন্দেহ নেই; অতএব অনুলোম প্রণালী

অনুযায়ী আকাশ ভূতটী, তাবৎ ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট ও ঘেরে রয়েছে।

এই সব ভুতুড়ে ব্যাপার নাড়াচাড়া ক'রে মোটমাট এইটুকুই বুঝ্‌তে পারা গেল যে এক আকাশই ঐ পঞ্চভুতের আদি কারণ ও মূল উপাদান। এখন তা হ'লে আমাদের জানতে হবে যে ঐ সর্ব্বব্যাপী (?) আকাশের স্বরূপ কি ? তারই বা উৎপত্তির কারণ কি ? বা তার অস্তিত্বই বা কতটুকু ?—এখানে কিন্তু এটা মনে ক'রে রাখতে হ'বে যে আকাশ বা অবকাশ ব'ল্‌তে তৎপূর্ব্বেই আমরা মেনে নিয়েছি বা নিচ্চি—কোন একটা ঘনত্বকে,—যার মধ্যে অবকাশ—কল্পনায় গ'ড়ে নিতে হয়, কোন কিছুর বিকাশের সম্ভাবনায়, কেমন নয় কি ? নতুবা অবকাশই বা ব'লতে যাব কেন ? যেমন জলটা একটা নিরেট বস্তু ব'লেই উপস্থিত ধরা গেল (আমরা সাধারণত যা মনে করি) মাছকে তারই মধ্যে অবকাশ ক'রে নি'তে হয় তার চলাফেরা ইত্যাদি জীবন-নির্ব্বাহের জন্যে বা আমরাও যেমন বায়ু-সমুদ্রের মাঝে অবকাশ ক'রে নিয়ে রয়েছি।

আমাদের বিজ্ঞানময় আকাশকেও ঠিক্ তেমনি ক'রেই গ'ড়ে নিতে হ'য়েছে কোন একটা কিছুর ভিতরে, যার ঘনত্ব আকাশের চেয়েও অনেক বেশী, কেবল তার খবর রাখি না এই জন্যে যে, আমাদের ঐ মাছের মত অবস্থা ব'লে।

ধরা যাক্ তুমি বা আমি কোন একটা কিছু গড়বার মুখে কি ক'রে আকাশকে গড়ে নিয়ে থাকি। ধর তুমি একখানা বাড়ী ক'রবে, তোমার মাথাটা কিছু আর এত বড় নয়, যে অতবড় বাড়ীখানার স্থানের সঙ্কুলান হ'তে পারে তোমার মাথার মধ্যে ; যখন সেই বাড়ীর স্বরূপ তুমি মনে মনে কল্পনায় আঁকবে ভাঙ্গবে গড়বে, সে তখন তা হ'লে

কোথায় ?—তোমার মনের মধ্যে খানিকটা অবকাশের কল্পনা ক'রে নিয়ে নয় কি ?

তা না হ'লে তোমার ছোট্ট কয়েক ইঞ্চি মাথাটির মধ্যে কিছু আর অতবড় ইমারত খানির স্থান সঙ্কুলান হ'তনা। অতএব কোন কিছু গড়বার পূর্ব্বাহ্নেই অর্থাৎ সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই আগে দরকার হয় খানিকটা আকাশ বা অবকাশের—যার মধ্যে সঙ্কল্প-জাত বস্তু বা বিষয় ফুটে উঠতে পারে ; যদি কেউ বলেন, কল্পনা না ক'রেই যদি কিছু গড়া যায় ? সেখানে উত্তর দেবার মত কিছু নেই, তবে এটা ঠিক্ যা কেউ কল্পনা করেনি এমন কোন কিছুর অভিব্যক্তিও জগতে নেই। আর যে কল্পনা করলে বা যার মধ্যে ফুটে উঠলো ঐ আকাশ সে ঐ আমাদের সংকল্প ও বিকল্পের ক্ষেত্র, মনেতেই। অতএব এখন আমরা অন্তত ন্যায়ের খাতিরেও ধরে নিতে বাধ্য যে আমাদের আকাশটি হ'চ্চে—একটি মনোময় বস্তু, মনে উহার জন্ম ব'লে, তাই মনের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে আকাশও অন্তর্হিত হ'য়ে থাকে, আর আকাশ না থাকলে আকাশ-প্রাণ তাবৎ ভূতগণই আকাশ অভাবে তদ্-স্বরূপে লীন হ'য়ে যায়। এই থেকে উপস্থিত আমরা মোটা মুটি একটা ধারণা ক'রে নিতে পারি যে আমাদের এই প্রতিভাষিক জগতটা মাত্র মনস্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে রয়েছে।

এই বোমগর্ভ 'মন'ই হ'চ্চে আমাদের বিজ্ঞানময় জগৎ বা অন্তঃর্জ্জগৎ; অর্থাৎ যে দৃঢ় সংকল্পের বশে আকাশ-প্রাণ ভূতগণ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে এই বিজ্ঞানময় জগতের স্বরূপ কি ? উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্,—একটা আলোক, ঐ আলোকটি একটা কিছুর ভিতর ফুটে উঠ্‌লো, ঐ কিছুটা হ'চ্চে এখানে ধ'রে নিতে হবে অন্ধকার—এখন ঘন অন্ধকারের মধ্যে যদি ঐ আলোকটি মাত্র তার প্রজ্জ্বলিত অংশটুকুতেই

নিবদ্ধ থাকতো, তা হ'লে তার ফল কি হয় ? সে নিজেও যেমন অপরের কাছে প্রকাশিত হ'ত না, তেমনি পরকে প্রকাশ করাও তার সাধ্যে কুলাত' না (অর্থাৎ যে বস্তুতে তেজের অংশ নেই তাকে প্রকাশ করা যেমন আলোকের সাধ্যাতীত হ'তো, আর যাতে তেজের অভাব সেও তেজের স্বরূপ বুঝতে পারত না)। অতএব কোন একটি আলোক যেমন তার মাত্র ঐ কেন্দ্রটিতেই শুধু আবদ্ধ নয়, সুদূরপ্রসারি কিরণ-জাল সমেত উহার যে মণ্ডল ততদূর পর্য্যন্ত তার ব্যাপ্তি ধরে নিতে হয়, বা আলোক ব'লতে মাত্র তার প্রজ্জলিত অংশটুকুকে না বুঝে উহার জ্যোতি সমেত মণ্ডলটীকে বুঝতে হয়, আর সেই মণ্ডলমধ্যে জ্যোতির বিদ্যমানতা আমরা সকলেই অনুভব ক'রে থাকি ; সেইরূপ তুমি, আমি, দ্রষ্টা, দৃশ্য বা যা কিছু অনুভুতি-সাপেক্ষ বস্তু বা বিষয় আমাদের অনুবোধ্য, সে সব-কিছুই কোন এক সুদূর প্রসারি মনোময় মণ্ডলের অন্তঃবর্ত্তী ব'লেই আমাদের দেখা, শোনা, বলা, করা বা ভাবাদির বিনিময় ইত্যাদি অনুবর্ত্তিত ও আদান প্রদানে সমর্থ হই।

আলোচনাটাকে অন্যদিক্ দিয়েও যদি দেখা যায় ত' ফল সেই একই দাঁড়ায়। যেমন, ধর তুমি ও আমি! আমি এখন চোখ দিয়ে তোমাকে দেখছি,—দেখ্‌বার সময়টীতে আমার 'মন' শুধু যদি আমার দেহমধ্যেই কোন এক কোটরে নিবদ্ধ থাক্‌তো তা হ'লে কি হ'ত ? আমিও তোমাকে দেখ্‌তাম না, তুমিও আমাকে নয়। তুমি হয়ত দেখাশুনার ব্যাপারে আলোক-রশ্মির কথা তুল্‌বে! তা কিন্তু আর বলা সাজেনা, কারণ ইতিপূর্ব্বেই অমরা অন্ততঃ তর্কের খাতিরে স্বীকার ক'রে নিয়েছি যে, রশ্মিজালের চেয়ে মনের ঘনত্ব বেশী হওয়ায়, ঐ রশ্মির মধ্যেই মনের সমাবেশ রয়েছে, তা না হ'লে 'মন' দিয়ে আমরা আলোককে গ্রহণ কর্ত্তেই

পারি না ;—তা ছাড়া তুমি যখন আমাকে দেখ,—দেখ্‌বার সময় তোমার মনটীকে একবার বিষয়ান্তরে সরিয়ে নিয়ে দেখ দেখি,—আমি তোমার সামনে বর্ত্তমান থেকেও নেই, কারণ তোমার দৃষ্টিশক্তি সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, মন বিষয়ান্তরে নিরুদ্ধ হওয়ার দরুণ, রশ্মিরও যে প্রাণবস্তু 'মন' তার অসংযোগের ফলে, দ্রষ্টার অভাবে দৃশ্যের যা সার্থকতা ঠিক্ ততটুকুই অবশিষ্ট থাকে। আর ঠিক তেমনটীই তোমার আমার শোনার ব্যাপারে, গন্ধের ব্যাপারে, কোন ভাব, অভাব, অনুভুতি ইত্যাদি সবেতেই ঠিক্ ঐ একই ফল।

ঐ আলোকরশ্মির মত, আমরা বা আমাদের মন শুধু দেহাশ্রয়ী নয় ব'লেই পরস্পর পরস্পরের কথা শুন্‌তে পাই, পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝি, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারি। অতএব আমাদের মন বস্তুটী আকাশ-বাতাসের মত, তুমি ও আমির ব্যবধান মধ্যে যে অবকাশটুকু রয়েছে ব'লে মনে হ'চ্চে সেখানেও সে পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান, তারও কারণ যে, সে যে আকাশ বাতাসেরও প্রাণবস্তু। আর ওখানে অভাব হ'লে হ'ত কি ? আমাদের পরস্পরের আদান-প্রদানই থাকতো না। অর্থাৎ টেলিগ্রামের তারের সংযোগ থাকলে কি হ'বে—যার প্রাণবস্তু তড়িৎ-প্রবাহের সংযোজনা নেই ?

এম্নি সাধারণ ভাবেই যদি আমরা নিজেদের দিকে একটু লক্ষ্য ক'রে দেখি, তা হ'লে বুঝতে পারি যে, চোখ, কান, নাক, মুখ আদি ইন্দ্রিয়েরা (—) মনের বিয়োগে বা অসংযোগে একেবারেই নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে ; আবার মনের সংযোগ মাত্রেই পুনরায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে। এই থেকেই ধ'রে নিতে পারা যায় যে, মন ছাড়া উহাদের পৃথক কোন সত্ত্বা নেই।

যখন আমি আমার 'মন'কে—কোন ভাব-রাজ্যে,—কি কোন

অতীতের স্মৃতির প্রতি, কিম্বা প্রবাসী আমি, আমার দেশস্থ আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশে নিয়োগ করি, তখন এই দেহস্থ ইন্দ্রিয়গুলির কর্তৃত্বাভিমান একান্ত অভাব হ'য়ে পড়ে। বরং দেখা যায় যে, মন কিন্তু এই সব ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঙ্গে না নিয়েও তার অভীষ্ট প্রদেশে গিয়ে দেখা, শোনা, বলা, করার কোন কিছুরই অভাব বোধ করেনি, এরা যেন সূক্ষ্মশরীরে মনেরই অনুগম ক'রেছিল। এদিকে এখানে দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণ ও তাদের বিষয় সকল বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সত্যিই যাদের (ইন্দ্রিয়দের) নিতান্ত আপনার ব'লে ধারণা ছিল, যাদের কর্তৃত্বে কোন সন্দেহের অবকাশই কোনদিন ছিল না সেই তাদের এক মনের অসংযোগে কি অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছিল? চোখ, বর্ত্তমান থেকেও কিছু দেখেনি, কান শোনে নি, নাক গন্ধ পায়নি ইত্যাদি, অথচ মন এদের সঙ্গে না নিয়েও নিজের কাজ সেরে এলো।

আরো ধরা যেতে পারে, যেমন তুমি বা আমি কোন দূরস্থ দেশ থেকে বাড়ীর কথা মনে করছি, তখনি ওস্নি দেশের, বাড়ীর প্রত্যেক লোকটী, প্রত্যেক কক্ষাদি, রাস্তা, ঘাট সবই যেন প্রত্যক্ষীভূত হ'য়ে উঠলো, তখন কিন্তু মনের সঙ্গে এ চোখ যায় নি, তবুও যে দেখেছিল,—দেখার গুণ বা শক্তি মনেরই নিজস্ব সম্পত্তি ব'লে, তেমনি সব ইন্দ্রিয়েরই ঐ এক দশা! মনের অভাবে এতক্ষণ অহঙ্কারী চোখ-কানের কোন কিছুই করবার শক্তি ছিল না, যতক্ষণ না মন তার সফর সেরে এসে, এদের জাগিয়ে তুলেছিল; যদি বল সেটা কাল্পনিক;—কাল্পনিকও প্রত্যক্ষের ব্যবধান—মাত্র অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের।—যা নিয়ে আমরা (বৃথা সময় নষ্ট হবার ভয়েই বলতে হবে) মাথা ঘামাতে চাইনা, সেইটাই আমাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয় "কাল্পনিক" নামে। আচ্ছা এই যে বই পড়াটা, এটাও

ত' এসেছে কল্পনার মারফৎ, তারপর সেই কল্পনার বস্তু দিয়ে নিজের কল্পনাকে রঙিয়ে তুলে দেখচো আমার কল্পনাকে,—তা হ'লে কি ব'ল্তে হবে তোমার বা আমার বা বিষয়টার কোন অস্তিত্ব নেই? অথচ অভ্যাসের গুণে এতগুলা কল্পনা একসঙ্গে হ'য়েও, এখন আর আমাদের কাছে কল্পনা ব'লেই মনে হয় না। অভ্যাসের গুণেই আজ তারা প্রত্যক্ষের মতই সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

সে শুধু মন ব'লে নয়, মন থেকে নিম্নতর সব ভূতগুলিরই ঐ একই ধাঁচা। প্রথম থেকেই ধর, পৃথিবী,—সে তোমারও নয়, আমারও নয়,—সে তার নিজেরি, অথচ আমরা তাকে বুদ্ধির বালাই দিয়ে, ভাগাভাগি কর্ত্তে গিয়ে, মারামারি ক'রে মরি, তার আবার তারিফ্ কত! তেম্নি জলও কারো নিজস্ব বস্তু নয়, তার অন্তঃপ্রবাহ সর্ব্বত্রই সমান, কিন্তু যেই কেউ পুকুর কাট্‌ল', কি কূয়ো খুঁড়ল',—স্বভাবের দোষে অবকাশ পেয়ে জলও এসে জম্‌লো সেই পুকুর কি কূয়োতে, তখন সে-জল হ'য়ে গেল খননকারীর যেন বাপকেলে নিজস্ব সম্পত্তি, তখন আর কারো তাতে হাত ডোবাবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত থাকে না। এর পরের তিনটী ভূত কিন্তু অতি-বুদ্ধি মানুষকে একটু কাহিল ক'রে রেখেছে দেখা যায়, সে ঐ আলো, বাতাস আর আকাশ। আলো সম্বন্ধে একেবারে নিজস্ব ব'লে দখল-জারি কর্ত্তে না পার্লে'ও অন্ততঃ মন প্রবোধ দোবার মত মানুষ কতকটা কায়দা ক'রে নিয়েছে বটে, কিন্তু বাতাস ব্যাটাকে মোটেই কায়দা কর্ত্তে পারে নি,—ও ঠিক্ তোমার যত্নে-গড়া ফুলবাগানের গোলাপ বকুলের সৌরভটুকু চুরি ক'রে নিয়ে বিলিয়ে দিয়ে আসে অপরের নাকে, আট্‌কাবার চেষ্টা কর্ত্তে গেলে নিজেরি অবস্থা হ'য়ে ওঠে কাহিল, কাজেই তাকে বাধ্য হ'য়ে ছেড়ে রাখতে হ'য়েছে;—বেটার চেয়ে ঐ

সব সম্বন্ধে বাপের গুণ এককাটী সরেস, তাঁর গায়ে (আকাশের) কেউ আবার আঁচড়টী পর্য্যন্ত দিতে পারেনা, যদিচ দেয়াল তুলে, পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে কত রকমে তাকে নিজস্ব ক'রে নোবার কায়দা করা হ'য়েছে, তবুও এমন হুড়কো-স্বভাব যে, কিছুতেই তাকে কেউ বাগে আনতে পারলে না ! তার পরই র'য়েছেন মন, উনিত' আবার বাবার বাবা ! কাজেই তার স্বভাব আর কত ভাল হ'বে ? উনিত' সর্ব্বভূতে হাজির আছেনই,—তদতিরিক্ত আমাদের নিজস্ব যে ভাবধারা, সেখানেও তাঁর অবাধ গতিবিধি বাহাল ক'রে বসে আছেন। অতএব যেমন আকাশেরও প্রাণ,—যার মধ্যে আকাশ আত্মপ্রকাশ ক'রে র'য়েছে; তাকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই পৃথকভাবে হবার উপায় নেই।

মন সম্বন্ধে অনেক কিছু আবোল-তাবোল বলা হ'য়ে গেল, কিন্তু তার আসল ক্ষমতা নিয়ে এখনও পর্য্যন্ত মোটেই আমাদের আলোচনা করা হ'ল না ; তার কারণ যে নেই তা নয়, যা বলবার সে আর কতটুকু ; ব'লতে গেলে ত' এক কথাতেই বলার শেষ হ'য়ে যায়, তা হ'লে প্যাঁচ কষার বাহাদুরীটা ত' আর লাভ হয় না—তাই একটু প্যাঁচ দিয়ে নেওয়া হ'ল ; তারও কারণ হ'চ্চে আজকাল সকলকারই প্যাঁচ খুব বেশী ক'রে আঁটা, তাকে খুলতে হ'লে আগে একটু ক'ষে নেওয়াই নাকি নিয়ম—তবেই তাকে সহজে খোলা যায়, অতএব এ ক্ষেত্রে বিশেষ যে কিছু ক্রটী হ'ল ব'লে মনে হয় না, আর হ'লেও, আমাদের ত' সাতখুন মাপ ; ঐ যে লোকে কি বলে, যাদের মাথা গোল, না আর কি।

যাক্, যাঁরা এতদূর পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাদের সঙ্গে এসেছেন তাঁদের এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, এরপর আর বেশী অবান্তর বাতান্তর হবে না, যাতে কাজের কথাই হয় সেইটুকুই লক্ষ্য থাক্‌বে ; তবে

কিনা 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম,' বুদ্ধিমানেরা নাকি সেটুকু বাদ-সাদ দিয়ে নেন ; তা হ'লে আমাদের দাবী যে আরো কিছু বেশী সে আশা নিশ্চয়ই কর্ত্তে পারি।

যা হোক, মন সম্বন্ধে ওদিকে যা বলা-কওয়া হ'য়েছে সে ত' হ'য়েই গেছে, অন্য আর একদিক্ দিয়ে আমাদের একটু দেখবার আছে, বিষয়ান্তরে প্রবেশ করবার আগে সেইটে সেরে নেওয়া যাক্।

ধরা যাক্, তুমি কি আমি, সুকোমল শয্যায় শুয়ে নিদ্রা দেবীকে স্মরণ করা মাত্রেই, তিনি এসে চোখের উপর হাতটী বুলিয়ে দিলেন ; আর ওম্নি সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আমি আমাদের অভ্যস্ত জগতের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে, অন্য আর এক জগতে গিয়ে হাজির হ'লাম। সম্পর্ক ছেড়ে দেওয়ার কথা এই জন্য বলছি যে, যে শরীরকে নিয়েই আমাদের ইহ জগতের সম্পর্ক, যার অবর্ত্তমানে তোমার আমার অস্তিত্বই থাকে না, যে চোখ না থাক্‌লে বলি দেখ্‌তে পাবনা, নাক না থাকলে গন্ধ পাবনা, কান না থাক্‌লে শুন্‌তে পাব'না ইত্যাদি আরও অনেক কিছু ;—কিন্তু ঘুমের সময় তারা সকলেইত' প'ড়ে রইল এখানে—আমাদের অত্যন্ত-আপনার শরীরকে আশ্রয় ক'রে ; অথচ, তারা এই শরীরে বাহাল-তবিয়তে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অচেতনের মত হ'য়ে পড়ে কেন ? তারপর ধর, ঘুমের কোলে এরা ত' (ইন্দ্রিয়াদি) প'ড়ে রইল এখানে সংজ্ঞাহীনের মতই, কিন্তু স্বপনঘোরে স্বপ্ন-জগতে এ চোখ থাকে না, অথচ দেখে কে ? কান থাকে না—শোনে কে ? কণ্ঠ থাকে না—কথা কয় কে ? পা রইল এখানে প'ড়ে, হাঁটে কি ক'রে ? এই রকম কত কি যে ক'রে বেড়ায়—এই সব কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য না নিয়েই, সম্পন্ন হয় কি ক'রে ? এখন এই জাগ্রত অবস্থায় যাদের অভাবে অসহায় হ'য়ে পড়ি তখন তারা সঙ্গে না থাক্‌লেও

অভাব বোধ হয়না কেন ? সেই সে ঘোর নিশার অন্ধকারে— স্বপ্ন-জগতে, দিনের বা চাঁদের আলো ফুটে ওঠে কোথা থেকে ? আবার যে ইন্দ্রিয়গুলিকে দেহাশ্রয়ী আমাদের একান্তই নিজের ব'লে বিশ্বাস ছিল, যাদের অভাবে নিজেদের অস্তিত্বেই বিশ্বাস থাকে না, সেই তাদের (ইন্দ্রিয়গুলির) তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়গুলি সাম্‌নে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বাহ্য-জগতের একান্ত অভাব হ'য়ে পড়ে কেন ? আবার অন্যদিকে 'স্বপ্নজগৎ'-খানি সহানুভূতিতে ভ'রে ওঠেই বা কেন ? কার অধিষ্ঠান হেতু ? (অর্থাৎ তখন আমাদের এই ব্যবহারিক জগতটা যেন মিথ্যা, আর স্বপ্ন-জগতটাই সত্য ব'লে মনে হয়, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশও থাকে না)। যার সংযোগ-বিয়োগের ফলে সত্য-মিথ্যার বিপর্য্যয় সাধন হয়, তা'কে কেউ চেন কি ? সে ঐ ঐন্দ্রজালিক মন !!

এইখানে আর শুধু বলার উপর নির্ভর না ক'রে, সকলকেই একটু ধীর স্থির হ'য়ে ভেবে দেখতে হবে যে, ঐ ঐন্দ্রজালিক মন তোমার আমার অন্তরে থেকেই, কেমন ক'রে চিদাকাশের আশ্রয় নিয়ে স্বপ্ন-জগতটাকে গ'ড়ে তোলবার জন্য ঘটাকাশের (তোমার স্বপ্ন জগতটাকে সৃষ্টি করবার মত অবকাশটুকুর) সৃষ্টি ক'রেছিল ; আবার তারি মধ্যে নিজেই দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য সেজে তার সৃষ্ট তাবৎ বিষয় ও বস্তুগুলিকে সৃজন, পালন ও লয় দ্বারা নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করছিল। অর্থাৎ, তুমি তোমার স্বপ্নজগতের কারণ স্বরূপে, কত দেশ দেশান্তর, আকাশ বাতাস, পাহাড় পর্ব্বতাদি দৃশ্য বস্তুর সৃষ্টি ক'রে, নিজেই আবার দ্রষ্টা সেজে, সেই সব ইহজগতের সম্পর্ক-শূন্য কাল্পনিক বস্তু বা বিষয়কে গ'ড়ে নিয়েছিলে, সত্যানুভূতি দিয়ে, সেই সেই বস্তু বা বিষয়কে ; আর এখন যেগুলিকে সত্য ব'লে মনে হ'চ্ছে, এরা তখন হ'য়ে প'ড়েছিল মিথ্যার সামিল। তারপর

সত্যিই যে দেখে, যে শোনে, যে করে বা বলে বা ঐ দেখা, শোনা, বলা, কওয়া ইত্যাদি যার নিজস্ব গুণ বা স্বভাব, সে যখন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে নিজের স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমানী যন্ত্রাদি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে প'ড়ে থাকে, আবার যন্ত্রীর যন্ত্রে অধিষ্ঠান মাত্রই তারা সজীবের মত ক্রিয়াশীল হয়। তার প্রমাণ, ধর তুমি মনে মনে কত কথাই না ভাব. হয়ত' বা মনে মনেই কারো সঙ্গে কথা কইছ', কিন্তু যতক্ষণ না তুমি তোমার কণ্ঠকে সেই সব কথা শব্দ প্রয়োগে প্রকাশ করবার আদেশ দাও, সে তা ব্যক্ত কর্ত্তে পারে না। তা হ'লে সেই কথা কওয়াটা তোমার গলার স্বভাব নয়, সেটী শব্দ প্রয়োগের যন্ত্র মাত্র। তেমনি অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বা কর্ম্মেন্দ্রিযের ব্যাপারও, তারা প্রত্যেকেই যন্ত্রীর যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধারণতঃ যাদের আমরা শক্তিশালী মানব ব'লে দেখতে পাই তাদের সেই শক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মন। সেখানে অজ্ঞাতসারেই হোক্ আর জ্ঞাতসারেই হোক্ যে যতটা যাওয়া আসা রাখে, অর্থাৎ চিন্তাশীল, তাকে ততখানি শক্তিমান্ ব'লে মনে হয়।

এখন বোধহয় কারো বুঝতে বাকি নেই যে, অনুশীলন দ্বারা কেন মানব এত শক্তিধর হ'য়ে ওঠে, তা সে, যে যে বিষয় নিয়েই হোক্ না কেন। চেষ্টা ক'রলে যে আরো কত শক্তির অধিকারী হ'তে পারে তার ইয়ত্বা নেই। কিন্তু মানবের মানবত্বের দিক্ থেকে, শুধু ঐ শক্তিটুকুই সংগ্রহ করাই তার যথেষ্ট নয়। আরো এগিয়ে গিয়ে তার অভীষ্ট বর্ত্তমান!

তা হ'লেও মনকে নিয়ে আরও দু এক কথা বলার আছে। মনকে নিয়ে বাক্-চাতুর্য্য ত' অনেক কিছুই হ'ল; কিন্তু আসলে ঐ মর্কটরূপী 'মনে'র আধিপত্য থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি? কারণ উহাকে

অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত মানবের মানবত্বে পৌঁছান, আকাশকুসুমের মতই অলীক হ'য়ে পড়ে। প্রথমতঃ তো মনের সান্নিধ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ 'মন, তার কতকগুলি অলৌকিক ঐশ্বর্য্য মানুষকে (মানবকে নয়) পাইয়ে দেয়, আর তা দিয়েই তাদের একান্ত বশ ক'রে ফেলে ; যার ফলে লোকসমাজে মধ্যে মধ্যে আমরা দু-চার জন ঐন্দ্রজালিককে দেখতে পাই, যাদের, ঐ সব বিভূতির গুণে মানব-সমাজে বেশ প্রতিপত্তিও জ'মে ওঠে, তাই পেয়েই অনেকে নিজেদের যেমন ধন্য মনে করে—অজ্ঞ আমাদেরও তেমনি আরও মজায়। কারণ তখন আর আমাদের এ বুদ্ধি জোটে না বা ভেবে দেখি না যে, আমরা যা নিয়ে মনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছি, সে দিক্ দিয়ে আমাদের এই শক্তিটাও কম নয় অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন-জীবনে যা প্রত্যহই গ'ড়ে তুল্ছি, সে গুলিকে কার্য্যে পরিণত করা ঐ সব বুজরুকদের সাধ্যাতীত! অর্থাৎ ধর, যদি আমরা সকলেই ঐ সব ঐন্দ্রজালিকদের দলের লোক হ'তাম আর কর্ম্ম ও অভ্যাস দ্বারা কোন কিছু গড়ার দলে মাত্র দু-চার জন লোক থাকত', তা হ'লে তখন আমরা কি বলতাম? যে-ঐ কর্ম্মীরাই প্রকৃত ঐশীশক্তি-সম্পন্ন লোক! তাই না? কাজেই আমাদের মনের ঐ সব ভাঁড়ামীতে ভুলে থাক্লে চল্বে না। দরকার, ওকে অতিক্রম ক'রে মূলের সন্ধান দেখা।

যে বীর ইতিপূর্ব্বেই ঐশ্বর্য্যের মায়িক বন্ধনকে অবলীলাক্রমে এড়িয়ে এসেছিল, তাকে এ নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যও ভোলাতে পারে না, আর সেই ভুলটুকু না হ'লেই 'মন' তখন দায়ে প'ড়েই ধরা দিতে বাধ্য হয় ঐ অভ্রান্ত-লক্ষ বীরের কাছে, আর তাকে ঠেকা দিয়ে রাখ্‌তে পারে না অধীনতার পাশে। দৃঢ়তর আঘাতের ফলে তখন মন নিজেই আত্মসমর্পণ করে ঐ

স্বাধীনচেতার পাদমূলে—বলে দেয় তার মণিকোঠায় লুক্কায়িত রত্নের সন্ধান।

'মন'-চরিত্রে শেষের দিকটা প্রশ্নোত্তর ছলে, আলাপের মধ্যদিয়ে ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রবো, কারণ তা না হ'লে বিষয়টা হয় তো কতকটা, হেঁয়ালীপূর্ণ হ'য়ে পড়বে বলে মনে হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ—

প্রশ্ন। এখন উপায় কি ঐ মর্কটরূপী মনটাকে আয়ত্ত করবার?

উত্তর। ভাবছি তো অনেক, অথচ ভাবতে গেলেও দেখি যে সেই মনেরই গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অতএব ভেবে বলা ত' চলেই না, অন্য যে আর কি হ'তে পারে?—তাও ত' এসে পড়ে ঐ মনেরি ভাবনার গণ্ডীতে—অতএব এক্ষেত্রে 'চুপ'ই ভাল।

প্রশ্ন। বলি একটা কিছু উপায় ত' চাই?

উত্তর। ফের সেই কথাই আনছো, তারও মূলে ঐ ভাবের ঘরে চুরি,—বরং সংকল্প-বিকল্পকে ছেড়ে দিয়ে, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে একটু চুপ ক'রে ব'সো; পরে যা হয় বিবেচনা করা যাবে। (উভয়ের তথা করণ ও ক্ষণিক পরে উভয়ের মধ্যে একজন উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলো—'হ'য়েছে হ'য়েছে।')

প্রশ্ন। কি হ'য়েছে?

উত্তর। হ'য়েছে ঠিক্ হ'য়েছে, দাঁড়া আর একটু দেখে নিই।

প্রশ্ন। কি দেখে নিবি?

উত্তর। দাঁড়া, আগে আমি তোকে একটা প্রশ্ন করি, তুই তার উত্তর দে,—আচ্ছা তুই সহজ ভাবে বল দেখি, তোর মনটা কার ?

প্রশ্ন। সে আবার কি কথা ? আমার মন ত' আমারি !

উত্তর। ছ্যাখ্, তা হ'লে হয়েছে, ঠিক্ হ'য়েছে,—এই ছ্যাখ্না তুই ও বলিস্ আমার মন, সেও বলে আমার মন ; অতএব ছ্যাখা যাচ্চে যে, একটা জায়গায় এর বেশ মিল র'য়েছে। আমার মনে হয় ও ব্যাটা কি শয়তানী করে জানিস্,—এ্যাকে ত' উনি প্রত্যেকের অন্তরে-বাহিরে রয়েছেন, এখানে সেখানে দু' জায়গাতেই ভেদ বুদ্ধি বাতলে ও বেটা সেই পাতার আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বসে থাকে।—তাই সকলে ধরতে পারে না! ওর অখণ্ডত্ব ওর কথা থেকেই পাওয়া যায়। ও তো বরাবরই আবহমান্ কাল থেকেই সকলকে ব'লে আস্‌ছে 'আমি'র মন। আমরা যদি এখন বুদ্ধির দোষে ভুল বুঝে নিয়ে থাকি ?

প্রশ্ন। ও তো বল্লে, আমরাও না হয় বুঝলাম্, ফলে কি হ'ল,—তারপর যে,—সব থৈ, থৈ,—আসলে ওকে বাগ্ মানাবার কি হ'ল ?

উত্তর। তাও ত' বটে,—তবে যখন তার হদিস্ পাওয়া গেছে তখন বছাধনকে আর বেশী চালাকি ক'র্ত্তে হবে না।

প্রশ্ন। বেশ দেখ্, হ'লেই ভাল।

উত্তর। (একটু ধ্যানস্থ থাকিয়া) নারে। ও যা ব'ল্‌ছে তার এক বর্ণও মিছে নয় ; যে কোন বিষয়ের চিন্তা কর্ত্তে গেলে, ও যেমন বহুরূপী সেজে সবতাতেই কর্ত্তৃত্ব ক'রে বেড়ায় কিন্তু আমিতে ওকে নিয়োগ ক'রলে আর কোন উৎপাতই করে না,—স্থির হয়ে থাকে, ও যে "আমি"র তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে এক আধ দিনে না হলেও অভ্যাসের

গুণে ওকে পাওয়া এখন আর কষ্টকর ব্যাপার ব'লে মনে হয় না। এই ছাখ না এখনি মনে হ'চ্চে, এত যে রকম-ফের, এত যে বাহ্যাড়ম্বর ও সবই ভুয়ো ;—হ'তে পারে মানুষের ছড়ান মনকে কুড়োবার প্রণালী, কিন্তু যারা ওকে সত্যি'ই চায় তাদের অত ঘোরফের না ক'বে, সরাসরি আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত। অবশেষে যা হয়—সে পরের কথা, পরে * * * তাও এখনি যা মনে হ'চ্ছে, সবেরই মূলে ঐ আমিই বিদ্যমান্, এখন আর যেন অন্তরে-বাহিরে বল্লে চলে না, জগতজোড়া বল্লেও খাটে না, অনন্ত ব'লতেও বাধে, তবুও যদি কিছু ব'ল্‌তে হয়, বলা যেতে পারে যে 'আমি'ই বিদ্যমান। তাই না তুমি বল 'আমি', আমি বলি 'আমি', সে বলে 'আমি'—জীবজন্তু, অণুপরমাণু, চরাচরে যে যেখানে বিদ্যমান আছে সকলেই বলে 'আমি', এমন কি মনও বলে 'আমি'! আসলে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতব্যও সেই 'আমি', অতএব সব কিছুই 'আমি'-ময়! তাই তোমার আমিতে যে গুণাগুণ বর্ত্তমান রয়েছে দেখতে পাই, আমার আমিতেও সেই সব গুণাগুণেরই সমাবেশ থাকা সম্ভবপর হ'য়েছে, তেমনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাধারেই সেই আমিরই গুণাগুণ, পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে পাত্রের ক্রম অনুযায়ী উনিশ বিশ আকার বর্ত্তমান দেখতে পাই, আর সেই সব ক্ষেত্রে 'আমি' বিদ্যমান আছে বলেই আমার 'আমি', তাদের 'আমি'কে দেখতে পায় বা বুঝতে পারে। সেই সঙ্গে এটুকুও ধারণায় রাখ্‌তে হবে তোমার 'আমি' ও আমার 'আমি'র মধ্যে যে ব্যবধান র'য়েছে সেখানেও সেই 'আমি'ই বর্ত্তমান। দেখ—এখন মন থেকে মনেতর তত্ত্বগুলি 'আমি'ত্বে পর্য্যবসিত হওয়ায় জগতকে একটা 'আমি' ময় সমুদ্রের মত বোধ হ'চ্ছে!

*   *   *   *

এতো হ'ল। এখন আমাদের নিজের কথা শেষ করা যাক্। আগে আমরা দেখেছি যে, মন থেকেই তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হ'য়েছে বা হ'চ্ছে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুবোধ্য দৃশ্যমান তাবৎ জগৎ মনেরই বৈচিত্র্যময় বিকাশ, তারপর সেই মন আমিত্বে লীন হ'লে এই জগত-বৈচিত্র থেকেও আর তেমন থাকে না—যেমনটী এখন দেখ্‌ছি; পটের উপর চিত্রিত চলচ্চিত্রের মত ইচ্ছামাত্রে নিশ্চল হ'য়ে যায়, সে সময় আর কালের অভিব্যক্তি থাকে না। আকাশই আমাদের জগতনাট্যের পট, মনের তুলিস্পর্শে একটি বা বহুর আধার রূপে পরিণত হয়।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যাভিনয়ের বেশী যে কিছু ব্যতিক্রম আছে বলে মনে হয় না;—যেমন চলচ্চিত্রের একখানি পর্দ্দা থাকা দরকার, যার গাত্রে দৃশ্যগুলি আপতিত হ'য়ে ফুটে ওঠে দর্শকের সামনে,—জগত-দৃশ্যাভিনয়েও তেমনি যে পটে দৃশ্যগুলি ফুটে উঠ্‌ছে সেই পর্দ্দাটী হ'চ্ছে আমাদের আকাশ। তারপর দেখতে পাই, পটের পশ্চাতে সাদা চোখে দেখবার মত কিছুই নেই,—বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'র্‌লে দেখা যায় যে, নিরাবলম্বনে একটা জ্যোতি এসে পটগাত্রে আপতিত হ'চ্ছে; সেই জ্যোতি কণাকে অনুসরণ ক'রে গেলে দেখা যায় যে, ঐ জ্যোতিকণা একটা 'ক্যামেরা' নামক বস্তুর মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। আমাদের জগত-দৃশ্যাভিনয়ে মনই হ'চ্ছে এখানে 'ক্যামেরা', আর মনের মধ্যে কল্পনার সাহায্যে অঙ্কিত দৃশ্যগুলি যার অদৃশ্য সংস্পর্শ পেয়ে, মনের বিচিত্রতাকে সত্যানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তোলে, সেই জ্যোতিঃকণাকে "জ্ঞান" আখ্যা দেওয়া হয়। কি জগৎ-চিত্রে, কি চলচ্চিত্রে ঐ যে জ্ঞান বা জ্যোতি, যার অভাবে দৃশ্যের সব কিছু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কাহারও অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, সেই জ্ঞান বা জ্যোতির অবস্থিতি হ'চ্ছে ক্যামেরার অন্তবর্ত্তী দৃশ্যলেখারও পশ্চাতে।

ঐ জ্যোতির স্বভাব হ'চ্ছে, কাহারও বিনা আবশ্যকে সে আত্মপ্রকাশ করে না ; অর্থাৎ তোমার আলো দরকার হ'লে তাকে প্রজ্জ্বলিত করবার জন্যে যেমন তোমাকে প্রয়াস নিতে হয়, (সর্ব্বত্র বিদ্যমান তেজকে প্রজ্জ্বলিত ক'রতে হ'লে সংঘর্ষের দরকার) তেমনি জ্ঞানের বিকাশের জন্যে দরকার হয় কর্ম্মকে ; সেটা আমরা সাধারণ ব্যাপারেও বুঝতে পারি যে, হাতে-নাতে কোন কিছু না করা পর্য্যন্ত সেই সেই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। চলচ্চিত্র ব্যাপারে যেমন আলোককে আবশ্যক মত প্রজ্জ্বলিত করবার একজন চালক থাকে—যে থাকে সকলের পিছনে ; জগচ্চিত্রে ঐ চালকের নাম হ'চ্ছে 'আমি' বা যাকে অহং বল, যে সকলের পিছনে থেকে এই সব চিত্র-বৈচিত্রকে পরিচালিত ক'র্চ্ছে, যার ইচ্ছাশক্তিই এ সবের মূলাধার কারণ। আর ক্যামেরা-সংলগ্ন নিশ্চল চিত্রগুলি চালকের ইচ্ছানুযায়ী আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ পটগাত্রে যেমন তাদের ছুটাছুটি, চলাফেরা, ভাবভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা সজীবতার পরিচয় দিয়ে থাকে, অথচ আসল ছবিতে তার কোন আভাষ পাওয়া যায় না, আমাদের এই যে সজীবতা এও তেমনি, কতকগুলা অনুপরমাণুর গতিবেগের মুখে রূপ নিচ্ছে মাত্র। আর ঐ যে গতিবেগ যার আবর্ত্তনে চিত্রগুলি সজীবতার পরিচয় দিচ্ছে উনিই হলেন কাল, আর নিশ্চল অবস্থাকে অকাল বলা যেতে পারে। আর এই সব চিত্রাভিনয়ের খুঁটি-নাটি খবর জানতে হ'লে আমাদের ধাওয়া ক'র্ত্তে হয় ঐ যে পিছনে দাঁড়িয়ে "আমি" রূপ চালক—ওরই কাছে, সেই সব ব'লে দিতে পারে কিসে থেকে কি হয় ; শুধু Theory জানা থাক্‌লে হবে না, হাতে নাতে শিখতে হবে ওর পেছু নিয়ে, তবে যদি জ্ঞান হয়।

সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত শুধু পাঁচটা

উপাদানকে ইতিপূর্ব্বে দেখেছিলাম, এখন সেই তাঁদের আবিষ্কৃত আরও তিনটীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল, যথা—'মন', 'বুদ্ধি' ও 'অহঙ্কার'। মোটমাট তাহ'লে আমরা ঐ আটটীকেই উপাদান ব'লে ধ'র্ত্তে পারি; অনেকে হয় ত' ফোঁস ক'রে উঠবেন 'তা কি ক'রে হয়', আমি বলি কি, ও হয় !! কেমন ক'রে হয় সেটা পরের কথা অর্থাৎ সওয়াল-জবাবের সময় তা বলা যাবে।

যাই হোক্. ওরা তিনেই এক কি আটেই এক সে কথা হ'চ্ছে না; তবে ঐ তিনের প্রত্যেক সত্ত্বাটাকে ব্যাপকভাবে অথচ পৃথক পৃথক অনুশীলন করবার জন্য পুরাণকারেরা,—ভাল মন্দ বুঝেই হোক্ আর না বুঝেই হোক্,—মনের নামকরণ ক'রেছিলেন 'ব্রহ্মা'—যিনি সৃষ্টি করবার মালিক; বুদ্ধি বা জ্ঞানের নাম হ'ল 'বিষ্ণু'—যাঁর—মনের খামখেয়ালী গুলিকে পালন ক'রে যাওয়াই কাজ। আর শুধু মনের কথাই বা বলি কেন ? এই সবের যে মূলাধার কারণ 'আমি', তার নেশার ঝোঁকে দেখা খেয়ালগুলিকে ফুটিয়ে তোলাও তার একটা কাজ, যাই হোক, ঐ 'আমি'র নাম হ'য়েছিল 'মহেশ্বর'। তারপর মানুষরা ওদের হুড়কো স্বভাব দেখে নিজেদের অনুকরণে হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান দিয়ে সরাসরি মানুষ তৈরী ক'রে তাদের এক একটা রাজধানী ও রাজতক্ত দিয়ে বসিয়ে দিলে, তার পরেই তার পূজা ও বৃত্তি বন্দোবস্ত ক'রে না দিয়েই নিজেরা পঞ্চম পক্ষকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ ক'রলেন একটু আরামের আশায়; সেই আরাম এখন মানুষের নাসিকা পথে ঘন ঘন ঢুকছে আর বেরুচ্ছে; তবুও এখনও "কমলি নেহি ছোড়তা হ্যায়।"

যাই হোক, যাঁরা নিজের চেষ্টায় ঐ তিনের সন্ধান পেয়েছিল, পাছে কেউ ঐ তিনের ব্যবহারের অপলাপ করে সেই সন্দেহেই বোধহয় ঐ

তিনকে এক ক'রে গেঁথে দিয়েছিলেন এক 'ওঁ'কারের মধ্যে—যে ওরা তিনেই এক বা একেই তিন। তারপর তাঁরা তার ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছিলেন যে গুণ হিসাবে 'মনে'র হ'চ্ছে 'রজ'গুণ, বুদ্ধির হ'চ্ছে 'সত্ত্ব'গুণ আর অহংএর হ'চ্ছে 'তম'গুণ! তেমনি কর্ম্ম হিসাবে 'মন' হ'চ্ছে সৃষ্টি করবার মালিক, 'বুদ্ধি' স্থিতি বা পালন করবার মালিক, আর 'অহং' লয়ের মালিক। তারপর, পরবর্ত্তীকালে আদি, অন্ত, মধ্য, ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ইত্যাদি আরো কত কি যোগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল তাতে কিছু যায় আসে নি, বা তুমি আমিও যদি আসলটাকে বজায় রেখে যা তা আরোপ ক'রে নিই তাতেও কিছু আসে যায় না, সে যা তাই থাক্‌বে। তবে কিনা বেচারীদের ঘর ভেঙ্গে দেওয়াতেই কে কোথায় ছ'ট্‌কে প'ড়েছে দূরদূরান্তরে, আত্মীয়স্বজনেরা দেখা ক'র্ত্তেও যেতে পারে না, 'অন্যে পরে কা কথা'। দেখা যাক্ যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে 'এয়ারোপ্লেনে'র মত তেমন কোন যান-বাহনের অভ্যুদয় হয়, তবে অনেকেরই সুরাহা হ'তে পারে।

যা হোক্, পাত্র দেখবার জন্যে তোমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, পাত্র দেখা ত' হ'ল যে, সেটী কি ধাতুতে তৈরী; তারপর পাত্র ব'লতে বোঝায় আধার, যার আধেয় বস্তু হয় আলাদা, পাত্রের সেই আধেয় বস্তুটীকে জানতে গিয়ে দেখা গেল যে, কেঁচো খুলতে সাপের আবির্ভাব, ও দুইই এক, একই দুই,—যেমন ধর আমি! আমি ব'লতে এখানে আমার মন, বুদ্ধি, অহংকার, আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, মাটি ইত্যাদি সব কয়টীকে নিয়েই আমার আমিত্ব, তেমনিটী তোমার বেলায় ও সকলের বেলায়, তাহ'লে যে পাত্রটীকে দেখবো ব'লে এতদূর সকলকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা, সে পাত্র কিনা শেষকালে দাঁড়ালো

এই 'আমি'ই। বেয়াদবী দেখে সকলের হয় ত' রাগ হ'চ্ছে, তাতে আর কি করা যাবে, শুধু বেয়াদবীর জন্যে যদি পাত্রকে অপচ্ছন্দ হয়, স্ব ঘরের মধ্যে আর একজন মাত্র আছে সে হ'চ্চে 'তুমি',—কেমন পছন্দ হয় ? এ ছাড়া 'সে' বা 'তারা' ও সব হ'চ্ছে নীচু ঘর। বংশমর্য্যাদা বজায় রাখতে হ'লে, 'আমি'ই উত্তম পুরুষ, নেহাৎ অপছন্দ হয় ত' 'তুমি' অবধি চ'লতে পারে। দেখ, যাকে পছন্দ হয়।

সরেজমিন তদারক ক'রে দেশ, কাল ও পাত্রের যা যা নজরে প'ড়েছে, সে সবই নথীজাত করা গেল। তারপর অল্প একটু সওয়াল জবাবের পালা শেষ না ক'রেই, বিচারকদের বিচার-পর্ব্ব দু'এক কথাতেই সেরে নেওয়া যাবে। অতএব যাঁরা ইতিমধ্যেই উতলা হ'য়ে পড়েছেন তাঁদের বলি কি 'বঁধু' হে অল্পক্ষণের জন্য "ধৈরজ ধর,"—আর এই ব'লে "মনেরে বুঝায়ো" যে একবার "সমাপ্ত" প'ড়তে পারলে হয়, তারপর "কে কার কড়ি ধারে" ; এমন ত' অনেক কিছুই লেখাপড়ার মধ্যে র'য়েছে, তাদের অবস্থাও ত' সেই 'কলার পাতা'র সামিল হ'য়ে পড়ে আছে—এই না ?

সওয়াল

বলে "কোনকালে নাইক' চাষ, ধানকে বলে দূর্ব্বোঘাস"। আমাদেরও হ'য়েছে সেই দশা। যার সাতপুরুষে কেউ উকিল নয়—নিজেও যার ত্রিসীমানায় পদার্পণ ক'রলে না,—তার উকিলী চালে কিছু ক'রতে বা ব'লতে যাওয়াটা যে বেয়াদবীর একশেষ হবে বা হ'য়েছে তা জানি; তার জন্যে হয়তো যাঁরা প্রকৃত ব্যবহার-ব্যবসায়ী তাঁরা কেউ কেউ অব্যবসায়ীর ব্যবসাদারী দেখে রেগেই খুন হবেন, মন্তব্যেরও অভাব হবে না, আবার কেউ হয়তো পাগলের প্রলাপ ভেবে আমোল নাও দিতে পারেন;—কিন্তু যেটা আসল দরকার যে, কি ক'রে বিচারের কাগজপত্র তৈরী কর্ত্তে হবে, বা কি ক'রে সওয়াল জবাব করা দরকার, সে রকম কোন সাহায্যই কারো কাছে ভুলেও পাবার আশা নেই; এমন কি পরামর্শটুকু নিতে গেলেও ট্যাঁকে কিছু থাকা দরকার, তবেই মাত্র আলাপ পরিচয়টুকু পর্য্যন্ত হ'তে পারে, অবশ্য বেশী কিছু থাকলে ত' বেশী কোন কথাই নেই। সে যাই হোক,—তাহ'লে যার কিছুই নেই, সে কি চুপ ক'রেই থাকবে? তার অভাব অভিযোগের কোনই মূল্য নেই—বিচারকেরাও তাই সমর্থন করেন না কি? আমরা মানুষ, রক্তমাংসের শরীর, তার উপর পুরুষত্বের দাবী করি,—অন্ততঃ বাড়ীর ভিতর! (সে কথা সামনে কেউ বলুক না বলুক, আড়ালে যে বলে তার কোন ভুল নেই) কাজেই রোখের মাথায় অব্যবসায়ীর ব্যবসাদারী দেখাতে গিয়ে যে সব ত্রুটী-বিচ্যুতি থেকে গেল বা আরও হবে, সে সব

দোষ ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে নেবেন, অন্ততঃ পক্ষপাত-দোষশূন্য বিচারকদের কাছে সে আশা করা যায়। তারপর "রায়" যাই হোক্ না কেন,—তাতে এ পক্ষের বড় একটা কিছু যাবে আসবে না, কারণ সমুদ্রে যার বাস তাকে শিশিরের ভয় দেখান নিতান্তই বৃথা! আর এ পক্ষে সেই রকম জমা খরচ বাদে একটা কৈফিয়ৎ টানাই হ'য়ে আছে;—তবুও ত' লোক দেখান কিছু একটা থাকা দরকার,—না হ'লে শেষে যে আবার চোর ব'নতে হবে।

ও সব মান অভিমানের পালা ছেড়ে দিয়ে এখন দেখা যাক সরেজমীন তদারক করে মোটামুটী কি পাওয়া গেল।

দেশ, কাল ও পাত্রের সমালোচনা কর্ত্তে গিয়ে প্রথমেই আমরা পেয়েছি দেশকে। দেশ দেখার অভিপ্রায় হ'চ্চে যে, দেশ অনুযায়ী পাত্রের প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা, বলা, কওয়া এমন কি ভাব-সম্পদেরও অনেক কিছু পার্থক্য হয়ে' থাকে। সে সব পরের কথা, আগে দেশের কথাটাই একটু পুনরালোচনা করে নেওয়া হোক। দেশটা তৈরী হ'চ্চে জল, মাটী, তেজ আর আকাশ বাতাস দিয়ে। তার অঙ্গে রকমারী যে সব আসবাব ও তৈজসপত্রাদি দেখা যায়, সেগুলি ঐ একই উপাদানে তৈরী;—যেমন পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর; ছোট তৈজসপত্রের মধ্যে উদ্ভিদ্, খনিজ ইত্যাদি; তারপর সচল পদার্থের মধ্যে মানুষ, জীব, জন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি, সবই ঐ একই উপাদান। এদের মরা-বাঁচার ক্রম হ'চ্চে চুম্বকের আইন অনুযায়ী অর্থাৎ সংযোগে জীবন, বিয়োগে মরণ। মোটের উপর এদেশের এলাকাধীনে যা কিছু আছে, সবই তার নিজস্ব, কাজেই তার অনুশাসনই এখানে চূড়ান্ত। বেশী বাড় কাকেও বাড়তে দেয় না, তার জন্যে এখানকার

সব কিছুই ঐ জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পাল্টাই করে নেওয়া হয়। না জানি এরা অমর হ'লে কি অনাসৃষ্টির কাণ্ডই না ক'রতো!

তারপর "কাল,"—যে কালকে নিয়ে একবার হা-ক্লান্ত হওয়া গেছে। যাক্, এখানে তার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার দরকার নেই; মোটের উপর তার অভিব্যক্তি বা স্বরূপ হচ্চে—কোন কিছুর চলা নিয়ে। এই চলা বন্ধ হলেই, মহামারী ব্যাপার আরম্ভ হয়,—যখনই যে কোন জিনিষের, যে কোন কারণেই হউক, গতিরোধ হবার মত অবস্থা আসে তখনই বুঝে নিতে হয় যে, সেই বস্তু বা বিষয়ের মৃত্যু আসন্ন;—কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নিয়ে চলার পথে উত্থান-পতনের নাম মৃত্যু নয়। ইতিপূর্ব্বে যখনি, আর যে কোন কারণবশতঃই হোক্ মানবসমাজের চলার রাস্তা বন্ধ হবার উপক্রম হ'য়েছিল, সেই তখন পর্য্যন্ত কোন একটা যুগের শেষ পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে,—আবার যখনি তারা নূতন উদ্যমে সঙ্ঘ-বদ্ধ হ'য়ে চলতে সুরু করেছে তখনই কোন একটা যুগের আরম্ভ ব'লে ধ'রে নিয়েছে; বৎসর হিসাবে এ সব যুগের যুগান্ত বা যুগারম্ভ হয় না। আর এটা শুধু মানবসমাজের উত্থান-পতন নিয়েই পরিকল্পিত হ'য়ে আছে।

এইবার পাত্রের কথা;—এদের বংশটা খুব বড় বংশ,—তাহ'লে কি হয়! বাপের কিছু থাকলে বসে খাওয়া ব'লে একটা রোগ আছে, সেইটাই হয় তাদের সংক্রামব্যাধি, যত কুবুদ্ধি দুষ্ট-সরস্বতী মারফৎ আমদানী হতে থাকে, তখন হয়ে পড়ে বেপরোয়া;—ভুলে যায় বংশ, ভুলে যায় আত্মমর্য্যাদা, এমন কি শেষে মা, বাপ পর্য্যন্ত।

এদের এখনকার যে অবস্থা, সেটা হচ্চে "কেউ বা হাড়ি কেউ বা শুঁড়ী, কেউ যায় না কারো বাড়ী"—এই হ'লো সমাজ। ধর্ম্ম হচ্চে—

সততা ও ভদ্রতার ঘোমটা টেনে আত্মপ্রবঞ্চনায় ও আত্মগোপনে, শিক্ষা—অনুকরণ পারিপাট্যে অর্থাৎ পড়া-পাখীটির মত, দীক্ষা—শীকারান্বেষণে, নীতি—শোষণে, অপভ্রংশ পরস্বাপহরণে, রীতি—বক্রতর অর্থাৎ সাপের চেয়েও বিষম (বিষহীন ঢোঁড়াও দুই একটা আছে বটে, কেউ তাদের মানে গণে না)। তারপর বংশের মর্য্যাদা, সেটাকে ঢেকে রেখেছে শিক্ষা ও সংস্কারের আবর্জ্জনায়। তবে তদ্দেশীয় জ্ঞান-বৃদ্ধদের মারফৎ যা জানতে পারা গেছে যে তাদের চুম্বকত্ব,—যেটা তাদের আসল প্রকৃতি, সেটা এখনও একেবারে নষ্ট হয় নি,—যা আমরা "দেশ"-অধ্যায়ে দেখে এসেছি। তারপর এদের দেখলে যা মনে হয়, যে এরা কালগ্রাসিত হ'তে চলেছে, অর্থাৎ এদের চলার পথ বন্ধ হ'য়ে আসছে ;—সেটা যেমন এ যুগ আর সে যুগ ব'লতে তার মাঝে একটা গণ্ডী বা ব্যবধান কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়, অথচ বাস্তবিক্ কোন গণ্ডী বা ব্যবধান থাকেনা, কালের গতি সমানই চলে আসচে। সেই রকম এরা আধ্যাত্ম ও পার্থিব ব'লে একই বস্তুকে দু'টো ভেবে উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান খাড়া ক'রে নেওয়ার ফলে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, আর কল্পনার গণ্ডী টেনে সেখানে এসে এখন সকলে মিলে তুড়িলাফ খাচ্চে, অবশ্য যে যেটা ধরে আছে সে সেইটা ধরেই লাফাতে সুরু করেছে, ইচ্ছে যে কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে ঐ কল্পনার পাঁচিলটা টপ্‌কে যাওয়া যায় কি না ?

সত্যিই যদি কেউ ওভাবে গায়ের জোরে গণ্ডী পেরিয়ে যায় (যেতে পারে কি না তার কিছু ঠিক নেই) তাতে আমাদের জনসাধারণের বড় কোন একটা উপকারে আসবে না, কারণ সকলের গায়ে সমান জোর থাকাটা সম্ভবপর নয়, কাজেই আমাদের সেই অপেক্ষা ক'রেই থাকতে হবে সাধারণ ব্যবস্থার জন্যে। আর যে তুড়িলাফ খেয়ে বেরিয়ে গেল বা

যাবে, সে আর এ সমাজের লোক রইল না (কে জানে পাঁচিলের ওপাশে পড়ে তার হাত পায়ের অবস্থা কি হয় বা হবে), সে সাধারণের সম্বন্ধ কেটেই ত' বেরিয়ে গেল যা যাবে ; তোমার আমার মত দুর্ব্বল অনুসরণ-কারীদের ভালমন্দ দেখবার অবকাশ থাকবেনা বা থাকেনা, তা হ'লে আর তাদের কথা এক্ষেত্রে না তোলাই ভাল। হায়রে সেকালের যুধিষ্ঠির! তুমি কি আহাম্মক্ লোকই না ছিলে,—অনুসরণকারী একটা কুকুরকে ছেড়ে তুমি স্বর্গে যেতে চাওনি ;—আর এ কালের সাধুরা পেছন টানের বালাইএর মোটেই ধার ধারেনা, সরাসর নিজেরাই চলে যায় (কোথায় যায় তা কে জানে), ভাবে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এম্নিতর সব ক্ষেত্রেই।

উপস্থিত এদের যা অবস্থা, তাতে ত' কোন দিকটাই খোলা ব'লে মনে হয়না যে সেইপথে বেরিয়ে গিয়ে খোঁজ খবর নেবে! তা সে কি ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, কি সমাজের দিক দিয়ে, কি নৈতিকজীবনে, কি রাষ্ট্রনীতিতে, কোন দিক দিয়েই নয়। কাজেই কালের অনুসাশনে এদের কালগ্রাসিত ব'লেই মনে হয় অন্ততঃ আসন্নকাল!—যদি এখনও গুটীপোকার মত গুটীতন্তুগুলি কেটে বেরোবার প্রয়াস না পায়। যে, যে ক্ষেত্রে আছে আজ সে যে তারি নালে-জোলে নিজেকে বেঁধে ফেলে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে, তার সন্দেহের অবকাশও নেই! পূব্‌পাড়ার অবস্থা যখন সসেমিরে, পশ্চিমপাড়ার খবর পাওয়া গেল যে তারা আবার নতুন ক'রে চলা সুরু করেচে, তাতে অনেকেই আশা করেছিল এই নতুন চলার পথে ওরা হয়ত একটা কিছু হদিস্ শীঘ্রই দিতে পারবে, যাতে অনেকগুলো দুর্ব্বল লোকের কতকটা সুরাহা হ'তে পারে। শেষ দেখা গেল ভাগ্যদোষে সে বোঝাবুঝির রকম দাঁড়িয়েছে—"উল্টা বুঝলি রাম" অর্থাৎ তারা চল্‌তে সুরু করার দরুণ, তার পুরস্কার স্বরূপ যে সব

পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেলে বা তাদের দখলে এলো, পাছে সেগুলো পরেক্কে বেহাত হয়ে যায়, বা অবাধ মেলামেশা কর্ত্তে গিয়ে পশ্চিমের স্বাতন্ত্রতা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পড়ে, চাই কি পাড়াই ছেড়ে চলে যায়, এম্নি সব সাত-পাঁচ ভেবে স্বাতন্ত্রতা বজায় করবার জন্যে উভয় পাড়ার মধ্যে একটা গণ্ডী টেনে দিলে ;—সেই তখনি এরা নিজেদেরি চলার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে নিয়েছে, কারণ গণ্ডী দেবার কল্পনা যদি একবার কারো মাথায় গজায় তখন তাকে তার নেশায় পেয়ে বসে। সেই গণ্ডীই এখন এদের চলার পথের মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রাচীরের মত হয়েছে, ঠিক যেমন করে পূব্‌পাড়ার ওরা নিজেদের গণ্ডী দিতে গিয়ে নালে-জোলে জড়িয়ে পড়েছিল বা এখনও রয়েছে ; আর নীতি-বিশারদ্‌রাও বলেন পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়। হায় মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি "কেমন মা তা কে জানে।" বলি তোমার অনন্তের বাজারে কি নুণও জোটেনা তাহলে এদের আঁতুড়-ঘরেই সেই অকাজটা সেরে নাওনি কেন ? এত ভুল, এত ভ্রান্তি মানুষের হয় ? যে ডালে বসবে সেই ডালই কাটবে ?

বলে—"কার শ্রাদ্ধ কেবা করে ! খোলা কেটে বামুন মরে !!" অতএব আমাদের ও সব "ধান ভান্‌তে শিবের গীতে" দরকার কি ? নিজেদের চরকাতেই তেল দেওয়া যাক্‌, দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় যায়। দেশ, কাল, পাত্র নিয়ে আলোচনা করার ফলে মোটমাট আমরা বুঝেছি যে, এক যেখানে আছে সেখানে সকলেই আছে ; একের অভাবে কোন সংখ্যাই দাঁড়াতে পারেনা, তা সে এক থেকে উর্দ্ধতম সংখ্যার দিকেই যাক্‌ বা উর্দ্ধতম সংখ্যা থেকে একের দিকেই আসুক ; এককে যেমন যে কোন সংখ্যার মধ্যে অনুভব করে নিতে হয় বা একের মধ্যেই বহুর যে কোন সংখ্যার অধিষ্ঠান বুঝে নিতে হয়, আর সেই সঙ্গে জান্‌তে হয় তার

সংযোগ বা বিয়োগ প্রণালী তবেই গণিতশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মায়। এক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অনুবোধ্য বিষয় বা বস্তু মাত্রেই আমাদের ঐ একের সংযোগ বা বিয়োগের ফলে ঘটে উঠেছে। যে কোন সংখ্যার মধ্যে "এক" যেমন অনুবোধ্য বিষয়, তেমনি যে কোন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে "আমি"ও অনুবোধ্য বিষয়। আর অঙ্কশাস্ত্র জান্‌তে হ'লে তাকে যেমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ মেনে নিয়ে অভ্যাস-যোগে তাকে আয়ত্ব করতে হয়, তবেই সে যে কোন সংখ্যা-সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। তেমনি এক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম বর্ত্তমান।

চুম্বক থেকেও আমরা সেই নির্দ্দেশই পেয়েছি যে, যে কোন একখণ্ড চুম্বকের প্রত্যেক অণুপরমাণুটী কেন্দ্রহীন অবস্থায় থাকতে পারেনা ; অতএব তাকে আমরা যত অংশেই বিভক্ত করিনা কেন সবেরই মধ্যে কেন্দ্রের বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী, বা তার প্রান্তদ্বয়েও চর্ম্মচক্ষে দুর্লক্ষ্য হ'লেও সেখানে বর্ত্তমান আছে ; তেমনি যেখানেই কোন বস্তু বা দুর্লক্ষ্য বিষয় বর্ত্তমান, সেখানে "আমি"ত বর্ত্তমান আছেই, সঙ্গে তার ভূত-ভবিষ্যতেরও অভাব নেই ; এই 'আমি'কে কেন্দ্র ক'রেই সব কিছুর অভিব্যক্তি। চুম্বক অনুগুলির একত্র সমাবেশের ফলে যেমন তারা বৃহৎ বৃহৎ লৌহখণ্ডের উপরও প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে পারে, তেমনি যে কোন একটা "আমি"র গোষ্ঠী একত্রে সমাবেশের ফলে অনেক কিছু অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে। তবে যদি নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেই কোন বিভিন্নতারূপ মলিনতা থাকে বা যতদিন থাকবে ততদিন তাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেই হবে,—নান্যপন্থা।

এখন কথা হচ্চে—কি করে ঐ এক থেকে বহু ও বহু থেকে একের দিকে ওঠা নামা করা যায় তার একটা হদিস্ ঠিক করা, যেমন অঙ্কশাস্ত্রে

আমরা পাই। সে হদিস্ যে ছিলনা, তা নয়, তবে দেশ, কাল, পাত্র হিসেবে কথার মানে গেছে বদ্‌লে। যখন মানব মানবত্বের দাবী করতে চেয়েছিল, তখন তারা তাদের ভাষাকেও এমনভাবে সাজিয়ে নিয়েছিল যে প্রত্যেক কথার মারফৎ তারা অক্ষরের ভুল না ক'রে (অক্ষর অর্থে যার ব্যত্যয় নেই বা ব্রহ্মনির্দ্দেশক) অর্থাৎ কথার প্রকৃত অর্থ ভাল ক'রে বুঝতে পারে। এখন সেই তাদের সাজানো কথাগুলোর মানে কিছু ফুটুক না ফুটুক, নাম মুখস্থ করেই আমরা বাহাদুরী নিয়ে থাকি; তা ছাড়া তাদের সমাজ, তাদের রীতিনীতি, তাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে, এখনকার সমাজাদির এতই পার্থক্য যে আকাশ পাতাল বল্লেও অত্যুক্তি হয়না। এখন সত্যিই যদি তাদের কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া কর্ত্তে হয় আগে সেগুলা সব জানা দরকার, তবে সব নেওয়াটা সম্ভব হোক না হোক কতকটা আশা করা যেতে পারে।

যে যুগে (অন্ততঃ কয়েকজনের মধ্যে) মানবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়েছিল ব'লে মনে হয় সেটা হচ্চে মহাভারতের যুগ, যে যুগে গীতার সৃষ্টি হয়েছিল। এখন তাহলে আমাদের আগে জানা দরকার, তাদের তখনকার সমাজে রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি; যুদ্ধবিগ্রহাদি কি রকম ছিল? প্রথমেই ধরা যাক্ গ্রন্থকারের আত্মজীবনী, পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে দ্বৈপায়ন হ্রদে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত,—আমাদের এখনকার সমাজ ঐ ব্যাপারটাকে কি চক্ষে দেখতে পারে? শুধু মহাপুরুষদের লীলাখেলা বা গল্প ব'লে পাশ কাটিয়া গেলে চলবে না, সেটা অন্ততঃ একটু ভেবে বলা দরকার। শুধু তাই নয়, তারপর আবার সেই সত্যবতীর শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ; তারপরে আরও দেখতে পাই যে সত্যবতীর পুত্রবধূদ্বয়ের গর্ভে ঐ ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও

বিদুরাদির জন্ম। তারপর পাণ্ডবাদির জন্ম এবং দ্রৌপদীর বিবাহ ব্যাপারও রয়েছে। এই যে সব ব্যাপার, আধুনিক সমাজ এই সব ব্যাপারকে কি ভাবে দেখবে? যদি তখনকার সমাজ এগুলোকে হীনচক্ষে দেখতো, তাহ'লে ওরা প্রত্যেকেই তখনকার সমাজের শ্রেষ্ঠতর আসনগুলি দখল ক'রে বসে থাকে কি ক'রে? এতো গেল সমাজের দিক দিয়ে। তার-পর দেখা যাক্, মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হ'ত কিরূপে। মহাভারতের মধ্যে যাকে আমরা সব চেয়ে পাপিষ্ঠ বলে জানি, সেই সে দুর্য্যোধনকে গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ ছেড়ে দিয়ে যদি নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায়, তা হলে সে হীন যে কোথায় তা আর আমাদের বুদ্ধি দিয়ে নির্দ্দেশ কর্ত্তে পারি না; বরং তার প্রজাবাৎসল্য, বন্ধুবাৎসল্য ধর্ম্মবুদ্ধি, গুরুপূজা, বীরত্ব, সত্যবাদিতা, যোগসিদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি গুণে এমনই সমলঙ্কৃত যে, আজকালকার দিনে তেমন একজন কেউ থাকলে তাকে অবতার বলায়ও কোন আপত্তি থাকতো না। যখন পেঁচো, রামা প্রভৃতিকে ঐ রকমের একটা কিছু পদবী তার লেজে বেঁধে দিয়ে ব্যাচারাদের "ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট" করে দিই, আর নিজেরা তার পদরেণুর প্রত্যাশায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি তার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে; এই ত আমাদের অবস্থা। তাহলে আমরা ঐ দুর্য্যোধনকে কি চোখে দেখতুম? দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মত নয় কি? তারপর মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, শল্য ইত্যাদি, তারপর অন্যদিকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন অবশেষে "কৃষ্ণ"; এদের মধ্যে একজন একজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা হীন প্রতিপন্ন হ'ত কি রকম বিচারের সাহায্যে? যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় উভয় যোদ্ধায় পরস্পর

পরস্পরকে হীন সম্বোধনে গালাগালি কর্ত্তো কেন ? নীতিবিদ্‌দের মতে,—“কর্ম্ম করে বসি, শত্রু মেরে হাসি” সে স্থলে খুনোখুনি করবার জন্যে ন্যায়-যুদ্ধই বা কি ? অন্যায়-যুদ্ধই বা কি ? স্বয়ম্বর ছাড়াও কেড়ে বিগড়ে নিয়ে যাওয়াটা তখনকার সমাজ সমর্থন কর্ত্তো কি করে ? শিক্ষা-দীক্ষার মূলে দেখা যায়, কোথায় ইন্দ্রিয়-জয়, কোথায় রিপু-জয় এই সবেতেই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তারপর কোথায় ধনুর্ব্বেদ, কোথায় আয়ুর্ব্বেদ, কোথায় বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য ও ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন কর্ত্তো যে যার ইচ্ছামত ; ইন্দ্রিয়-জয় বা রিপু-জয়ের উদ্দেশ্য কি ? তারপর তাদের হাবভাব, আচার, ব্যবহারাদি অনেক কিছুই আছে। সে সব খুঁটীনাটী ধর্‌তে গেলে আমাদের দ্বিতীয় মহাভারত লিখ্‌তে হয়। সব চেয়ে বড় কথা তাদের ভাষা, যা ভাঙ্গিয়ে ভারতের লোক আজ নিজেদের সম্মান বাড়াতে চায় দার্শনিক বলে : সেই হাজার হাজার বৎসর আগে তারা কোন্ কথার কি মানে কত্তো তার হদিস্ ধরা আমাদের মত অন্ধের পক্ষে সম্ভবপর কি ? আজ পাঁচ বৎসর আগে বাঙ্গালীর যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল, তাই যখন সবটা ঠিক ঠিক বুঝতে বেগ পেতে হয়, তখন ঐ মরা-ভাষায় আমাদের ব্যুৎপত্তি কতখানি সুবোধ্য হবে তা আর বেশী করে বলায় দরকার নেই। মরা-ভাষা বলাতে অনেকের হয়ত আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু মরা কেন বলা হ’ল তার একটা উদাহরণ দিচ্চি,—আজ কালকার দিনে রাম বল্‌তে আমরা সকলেই ঐ এক কথাতেই বুঝে নিই যে এ দশরথের বেটা রাম ছাড়া আর কেউ নয়, তখন আর আমাদের জানবার দরকার হয় না যে ঐ “রাম” কথার ব্যুৎপত্তি কি ; সেটা অন্য কোনখানে প্রযোয্য কি

না? সে সব ভাবার কথা চুলোয় যাক, কেউ যদি রাম নামের অন্য কোন রূপ দিয়ে ব্যাখ্যা করে তাতেই আমাদের টনক নড়ে ওঠে। তাকে কত কথাই না শুনিয়ে দিই; কিন্তু যখন ঐ ভাষা জ্যান্ত ছিল সেই সময়ে একজন কিন্তু "রাম" কথার বদলে "মরা" শব্দ ব্যবহার করেছিল তার নিজের সুবিধার জন্য; অর্থাৎ "রাম= জগদীশ্বর" না ব'লে সে বলেছিল "মরা=ঈশ্বর এই জগৎ" অর্থাৎ সে জগদীশ্বর জগদীশ্বর বলে হা হুতোশ না করে, কি এখানে সেখানে খোঁজাখুঁজি না করে ধরে নিয়েছিল—যা যেখানে দেখ্‌ছি সেইটাই ঈশ্বর। আর পরবর্ত্তী যুগে সেইটাকে ব্যাখ্যা কত্তে গিয়ে কি দাঁড়িয়েচে যে "মরা, মরা, মরা" বার বার উচ্চারণ কর্ত্তে কর্ত্তে "রাম, রাম, রাম" কথা তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল বলেই ঐ উচ্চারণকারী নামের গুণে উদ্ধার হয়ে গিয়েছিল। মরা ভাষা আর জ্যান্ত ভাষায় তফাৎ এইখানেই। যেমন ইন্দ্র বল্‌তে আমরা একটা ঠাকুর দেবতা কিছু ভেবে নেই, বজ্রগর্ভ ইন্দ্রকে (ইন্দ্রবায়ুকে) খুঁজে পাই না; কাজেই কি ক'রে তার আরাধনা (এখানে আরাধনা বলতে পূজা-আশ্রয় নয়) করা দরকার তা ঠিক ঠিক বুঝি না, শেষে পূজা দিয়ে তার আরাধনার শেষ করে দিই; ঠিক এম্নিতর সব ক্ষেত্রেই।

অত কথার দরকার কি! এমনি সাধারণ ভাবে যে সব কথা বা শব্দ নিত্যই ব্যবহার কচ্চি সেগুলিও আমরা শুধু পড়া-পাখীর মতই মুখস্থ কপ্‌চে যাই, তার কোনটীরই মানে আমরা জানি না বা বুঝি না। ভাষা এখন ভেসেই আছে, তাদের খবর সে আর দেয় না। অক্ষরের সম্বন্ধ ত ছেড়েই দেওয়া হ'য়েছে; তাতেও ক্ষতি ছিল না যদি অন্ততঃপক্ষে ভাবগুলোও বজায় থাকৃতো, যার জন্যে এত

মারামারি কাটাকাটী করে ভাষাকে সংস্কার করা হয়েছিল; অন্ততঃ এ পাড়ায়।

কথা বলার ধরণ দেখে আবার কেউ না মনে ক'রে বসেন যে "লিথিয়ে" তাহলে না জানি কত বড় পণ্ডিত। সেটা বুদ্ধিমান্ পোড়োদের বেশী কিছু প্রকাশ ক'রে বলতে হবে না। লেখার ভঙ্গী দেখে হাঁড়ীর খবর তাঁরা অনেকক্ষণই পেয়েছেন, কিন্তু যাঁরা এতখানি আলাপ সালাপের পরও লেখার ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাননি তাঁদের বলি কি যে, দেখ গা ও রকম "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" করলে তাতে কোন দোষ হয় না। ও একটা দলই আছে।

আমরা মহাভারতের যুগের হাবভাব, রীতি, নীতি ইত্যাদি জানবার জন্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ইতিপূর্ব্বে উত্থাপন করে এসেছি, সেই সব প্রত্যেক খুঁটীনাটী নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য ত নয়, তা ছাড়া বিদ্যাবুদ্ধিতেও যথেষ্ট অনটন হয়ে পড়ে। তবে যাদের জিনিষ নিয়ে আমরা আলোচনা কর্ব্বো, তাদের তখনকার দিনের মোটামুটী ভাব-ধারাটা কি রকম ছিল, কি লক্ষ্য নিয়ে তারা চ'লত'—যে চলার সম্বন্ধ নিয়েই সমাজ, ধর্ম্ম ইত্যাদি আশ পাশ ঐ ভাবে গ'ড়ে উঠেছিল—মাত্র সেইটুকু জানাই উদ্দেশ্য, সেই রকম একটা সাধারণ সূত্রের সন্ধান পেলেই, আমাদের একটা খুঁটীনাটী প্রশ্নের একটা সহজ মীমাংসার পথ পাওয়া যেতে পারে।

আরো এক মুস্কিলের কথা, আমাদের মধ্যে আবার অনেকেরই সে যুগের ঐ সব "বিশ্বকোষ" পড়ার মত সময় নেইবা ধৈর্য্যে কুলায় না; তবে যতটুকু অভিজ্ঞতার বুকনি আমরা আওড়াই তা ঐ থিয়েটার, যাত্রা-ওয়ালাদের দৌলতে বা কল্যাণে, তাও আবার মাত্র সে যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের

ব্যাপারটুকু নিয়েই বেশী। তার কারণটা কি বোঝা যায় না ; বোধ হয় "দুধের আশা ঘোলে মেটান"র মতই অবস্থা থেকে উৎপন্ন বা অন্য কিছুও হ'তে পারে। অতএব আমরা ওরই মধ্যে থেকে যতটুকু খুঁজে নিতে পারি, তারই চেষ্টা ক'রবো।

সে যাই হোক, সে সময়ের কোন পুরাণ পড়তে গেলে বা থিয়েটার, যাত্রা শুনতে গিয়ে দেখতে পাই যে হয়ত' দুজন বিশিষ্টনামা যোদ্ধা পরস্পর যুদ্ধার্থি হ'য়ে সামনা সামনি হ'য়েই,—আমরা যাকে ইত রোমি বলি, সেইরূপ ভাষায় গালাগালি স্থুরু ক'রে দিয়েছে! বা এমন কোন মিথ্যে দুঃসংবাদ শোনালে যাতে প্রতিপক্ষ শোকাভিভূত হ'য়ে পড়ে। তাতে ঐ গালাগালির তোড়ে যে রাগ্‌লো বা শোকাভিভূত হ'য়ে প'ড়লো বা ঐ রকম কোন কিছুর দ্বারা অভিভূত হ'য়ে প'ড়লে সেই সে যুদ্ধে পরাজিত বা হত হ'ল। আর যে যতক্ষণ ঐ সব বাগ্‌-যুদ্ধে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পার্ত্তো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে হারানো বা তাকে ধ্বংস করা প্রতিপক্ষের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপারে দাঁড়াতো—তা সে প্রতিপক্ষ যত বড়ই ক্ষমতাশালী হোক্ না কেন। অবশ্য সমপর্য্যায়ভুক্ত রথীদের মধ্যেই সেটা খাট্‌তো, অসমপর্য্যায় হ'লে সে আলাদা কথা। তারপর আরও বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, ঐ সব যুদ্ধে যারা কর্ণধার—স্বরূপ থাকতো, তাদের ক্ষণিকের বিক্ষেপে "বল" মধ্যে যথেষ্ট অনিষ্টপাত হ'ত, আর ঐ পদের অনুপযুক্ত হ'য়ে যেতো। আবার একদিকে যেমন হীনবল বা নিরস্ত্র শত্রুকে উপেক্ষা ক'রতো, তেম্নি আবার প্রবল প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করবার জন্যে যে কোন অন্যায় পন্থা গ্রহণ কর্ত্তেও ছাড়তো না।

ঐ আপৎপাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে তখনকার দিনের

যুদ্ধ শিক্ষার্থীদেরও মাত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ী হবার জন্যে গোড়া থেকেই তাদের শিক্ষা নিতে হ'ত বা নিজেদের গ'ড়ে তুল্‌তো, যাতে তারা লোকের স্তুতি, নিন্দা ইত্যাদিকে তুল্য মূল্যে বিবেচনা ক'রতে পারে। ঐ একই উদ্দেশ্য পরিচালিত হ'য়ে তাদের আরো সব ভিতরের খবর জানতে হ'ত যে,—যতক্ষণ মানুষ রিপু-বশীভূত হ'য়ে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার পক্ষে স্তুতি—নিন্দার বাহিরে গিয়ে দাঁড়ান সম্ভবপর নয়। অতএব শুধু যুদ্ধব্যবসায় শিখ্‌তে গিয়ে তাদের অন্দরমহলের অনেক খবরই সুস্পষ্ট ক'রে জানতে হ'ত, কেননা খুনোখুনিটাও যাতে সভ্যভব্য হয়।

তখনকার দিনের সভ্যতাও ছিল তাই। দেখা যায়—শুতে, ব'স্‌তে, নাইতে, খেতে, হাঁচতে, কাশ্‌তে পর্য্যন্ত দরকার হ'ত দর্শনটাকে ছুঁয়ে নেওয়া। অর্থাৎ দেখে নিতে হ'ত কেউ কারো ঘাড়ে চাপলো কি না? অতএব তখনকার দিনের সভ্যতাকে আমরা দার্শনিক—সভ্যতা ব'লে আখ্যা দিতে পারি। এখন এসব অদ্ভূত তথ্যগুলি আমদানি হ'ল কোথা থেকে, বা এ সবের মূল কি, বা কোথায়,—তাই দেখা যাক্।

যুদ্ধার্থিকে খুনোখুনি ছাড়াও যে "পার্শ-বিদ্যা"টা শিখ্‌তে দেখেছি সেটারও নাম হচ্চে দর্শন। ঐ সব দর্শনের জন্ম হ'চ্চে অরণ্যে, তাই ওর আর একটী নাম "আরণ্যক"—অর্থাৎ বুনো। ঐ বুনো ব্যাপার নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটী ক'র্ত্তো, তারাও ছিল ঠিক্ সেই রকম,—মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল, আনাভিলম্বিত শাদা পাকা দাড়ি, হাতে পায়ে ঝুলতো আধ হাত ক'রে নখ, আর তদুপযুক্ত ছিল তাদের পোষাক পরিচ্ছদের ছটা, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল ঐ রকমের শিকড় মাকড় দিয়ে,—মোটের ওপর যাদের আমরা অসভ্য

বলি। পরে জনসমাজের মাথা খেতে ওরা দর্শন-বিদ্যাটাকে বন থেকে টেনে এনে চুপি চুপি লোকালয়ে ছেড়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব বুনো বিদ্যাগুলো নিজমূর্ত্তি ধ'রে মানুষদের নধর ঘাড়ে চেপে ব'স্‌ল, মায় সে রাজা থেকে ভিখারী পর্য্যন্ত—আর অবসর মত তাদের এক-এক ক'রে উদরস্থাৎ ক'রতে লাগ্‌ল'। তারপর সেই সব শিকার-লব্ধ মানুষের অলঙ্কারাদি প'রে এমন ভোল্ ব'দ্‌লে ফেল্লে যে, হঠাৎ কেউ দেখে বুঝে উঠ্‌তে পারতো না যে আসলে তারা কি ছিল। সেই তালে ঐ সব বুনো বিদ্যার রোজারাও বেশ একটু আধিপত্য বিস্তার ক'রে ব'স্‌লো সমাজের উপর।

তারপর থেকেই ওদের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে উঠলো মানুষের ওপর, আর সেই অবধি লোকালয়ে ওরা বুনোর বদলে সভ্য নাম "দার্শনিক" ব'লে পরিচিত হ'ল। এখন দার্শনিক ব'লেই বলি, আমাদের 'উপস্থিত আলোচ্য যুগটা' যাদের কথায় ওঠা বসা ক'ত্তো; সেই তারা শাদা চোখের মাথা খেয়ে উল্টোনো চোখ দিয়ে কি দেখেছিল না দেখেছিল, তারি একটা মোটামুটী 'বার-নক্সা' আঁক্‌বার চেষ্টা করবো।

ঐ সব দার্শনিকদের পেশা ছিল মানুষের 'প্রাণ' টুকু কোন্ 'ভোমরা-ভুমরীর' মধ্যে আছে বা সোনার কাটী কি রূপোর কাটীরূপ 'ভোজদণ্ডের' পরশ সাপেক্ষ, তন্ন তন্ন ক'রে সেই সবই খুঁজে বেড়াত'—উদ্দেশ্য,—শিকার খেলবার সময় বেশী ধ্বস্তাধ্বস্তি না ক'রে যাতে একটা টিপুনি দিলেই কাজ সেরে নিতে পারে। ভাল ব'লেই হ'ক্ আর মন্দ ব'লেই হ'ক্, কারো আপ্রাণ চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। কাজেই তাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফল একদিন ফোল্লো;—এমন সব সন্ধান সুলুক আয়ত্ত ক'রেছিল যে শুধু মানুষগুলা কোন্ ছার, দরকার হ'লে দুনিয়াটাকে

উবিয়ে দেবার মত মাল মশলাও পরেক্কে তাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল।

এই সব খুনে-বিদ্যার যিনি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁর নাম ছিল "কপিল", সাগর সঙ্গম ছিল তাঁর আড্ডা, আর তাঁর আবিষ্কৃত বিদ্যাটীর নাম ছিল "সাংখ্য",—যাকে ভিত্তি ক'রে পরে অনেকরকম শাখা প্রশাখা গজিয়ে উঠেছিল। ঐ মূল বিদ্যাটী সম্বন্ধে আমাদের এখানে আর বেশী কিছু জানবার নেই, যতটুকু জানা দরকার তা আমরা ইতি পূর্ব্বেই "পাত্রের" সন্ধানে গিয়ে আলাপ-পরিচয় নিয়ে এসেছি (যদি কারো বেশী কিছু জানবার দরকার হয়, তাঁদের জন্যে ত' ষড়দর্শনই পড়ে রইলো, উচিৎ সেই সব পুঁথির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করা)। তার বেশী বলার বা লেখার সময়ের ও স্থানের সঙ্কুলান হওয়া এক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়; আরো একটা কারণ,—যাদের নিয়ে এ আসর পাতা গেছে, সে কতকটা ধ'রে ধর্ম্ম ঘটান'রই অবস্থা ;—বেশী বাড়াবাড়ির ফল হবে "অরণ্যে রোদন" পরে যে 'আহা!' বলে সান্ত্বনা দেবার লোকটীও থাক্‌বে না।

যাই হোক্‌, পরে ঐ বিদ্যাধর বা আদিম মানুষগুলোকে গোটা গোটা গেলার দরুণ বদ্‌হজমের ফলে যা উগ্‌রে ফেলেছিলো, তারাই পরেক্কে "মানব" উপাধি নিয়ে ভূপৃষ্ঠে চরে ক'রে বেড়াতে লাগলো, তাতে হ'ল কি, যাওবা দু, চারটে ছিট্‌ মানুষ ছট্‌কে ছাট্‌কে এখানে ওখানে প'ড়েছিল, ল্যাজকাটা শিয়ালের প্ররোচনায় তারাও সব ল্যাজ মুড়িয়ে বেঁড়ে,—এখানে "মানব" ব'নে গেল। সেই থেকে ঠিক্‌ ঠিক্‌ আদিম মানুষের সন্ধান পৃথিবীতে বড় একটা পাওয়া যায় না।

তখনকার দিনের লোকগুলো বোধ হয় ছিল আলুনো, তাই বিদ্যাধররা

আগের ভাগে ঘুণ ছিটিয়ে দিয়ে রাখতো, অর্থাৎ মানুষগুলোকে শেখাত' যে, ওহে বাপু! তোমরা তোমাদের ঐ যে শরারটাকে নিজস্ব ব'লে ভেবে নিয়ে ব'সে আছ, ওটা কিন্তু ঠিক তোমাদের সম্পত্তি নয়; ওর কতকটা হ'চ্চে ক্ষিতির, কতকটা জলের, কতকটা আগুনের, কতকটা আকাশের, আর কতকটা হ'চ্চে বাতাসের সম্পত্তি; এরা পাঁচভূতে, মাত্র তোমার প্রতিবিম্বটুকু নিয়ে, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকেই ভ্যাঙাচ্চে। যদি এদেরও নিজের স্বরূপ জান্‌তে চাও, তা হ'লে যত কিছু ঐ ওদের সম্পর্কিত ভূতে পাওয়া অভ্যাস অর্থাৎ তোমার দেহ সম্পর্কে অভ্যাসলব্ধ বদ্ধ-সংস্কারগুলিকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিয়ে 'আমি'র কাছে এগিয়ে এসো, তা হ'লে তখন স্পষ্ট বুঝতে পারবে, ওরা কে, তুমি কে, বা আমি কে? তখন বুঝবে—কে বলে, কে শোনে, কে দেখে, কে খায় বা কে বলায়, কে শোনায়, কে দেখায় বা কে খাওয়ায় ইত্যাদি। আর তোমরা ত' বুদ্ধিমান্, তোমাদের বেশী কি আর বল্‌বো, এম্নিইত তোমরা এক কথাতেই বুঝে নিতে পার' যে, এই যে শরীরটা, যাকে আমরা আমাদের নিজের ব'লেই জানি, আমাদের দেহের সেই সব কিছুই বজায় থাকা সত্ত্বেও তবে আবার কার বা কিসের অভাবে একে মৃত বলি? একটা কোন কিছুর অভাবেই ত' এমনটা হয়? এই ত', এবার তোমরা বুঝে ফেলেছ দেখছি! তবে আর কি? এস, এস, থপ্ ক'রে চ'লে এস,—"আমি" তোমাদের সেই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবই দোব। আর যায় কোথা, লোকের আত্মশ্লাঘায় আঘাত ক'রে তাদের দিয়ে না করান যায় কি? তার ওপর নতুনের নেশা! নতুনের নেশা একবার মানুষকে পেয়ে বস্‌লে হয়, তারপর সে মরুক আর তরুক, তখন সে মরিয়া হ'য়ে ছুট্‌তে থাকে নতুনকে আয়ত্ত করবার জন্যে।

হ'লোও তাই ; দার্শনিকদের সল্লা-পরামর্শ শুন্‌তে শুন্‌তে নতুনের নেশার প্রলোভনকে এড়াতে পাল্লে না, সুড়্ সুড়্ ক'রে প্রায় সকলেই গিয়ে জুটলো ওদের দলে, তখন থেকে তারা নিজেদের 'মানব' বলে জাহির ক'ল্লে। তারপর মানুষের আর একটা প্রধান দোষ হ'চ্চে, তারা অনুকরণ-বিলাসী, —ফলে ক্রমশঃ এমন একদিন এসেছিল, যখন আপামর সকলেই প্রায় হ'য়ে গিয়েছিল মানব ; এই সেই যুগ, যে মহাভারতের যুগ নিয়ে আলোচনা কর্ব্বো বলে আমরা এগিয়ে এসেছি।

ঐ সময়ের দার্শনিকরা আবার একদিন ডাক-হাঁক ক'রে সকলকে শোনালে যে, ওহে বাপু!—"আমি" যে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে এসেছি—সেই একের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দোব ব'লে. সে জন্যে তোমরা এবার তটস্থ হও ; অর্থাৎ তোমাদের শুধু ঐ বিদ্যার কচ্‌কচি নিয়ে থাক্‌লে হবে না, যথা,—আধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব, তন্মাত্র, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, প্রকৃতি ও পুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় বা বাহ্যজগতের পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় ও বস্তু গুলিকে সড়্‌গড় ক'রে নিয়ে বা ওগুলিকে একেবারে উদরস্থাৎ ক'রে ফেল্লেও সেই সে তার নাগাল পাওয়া যায় না বা যাবে না। যদি সত্যিই আলাপ পরিচয় কর্ত্তে চাও, তা হ'লে তোমাদের যা ক'রতে হবে, বা শিখ্‌তে হবে,—বল্‌চি শোন ; মায়ের কোল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে যে বিষয় বা বস্তুকে, যে আরোপিত ভাব ও ভাষা দিয়ে শিখে রেখেছ বা জেনে রেখেছ, সেই সব মুখস্থ-বিদ্যাগুলিকে উপস্থিত একরকম ভুল্‌তে হবে —তাদের প্রকৃত মূল্য না জানা পর্য্যন্ত। যেমন ধর,—আমরা কত কল্পনা, কত ভাব দিয়ে শিখে রেখেছি,—জড় একটী, চৈতন্য একটী ; ঐরূপ জ্ঞান—অজ্ঞান, কাল—অকাল, জন্ম—মৃত্যু, সত্য—মিথ্যা, কর্ত্তব্য

—অকর্ত্তব্য, পাপ—পুণ্য, আলো—আঁধার, দিন—রাত্র, ভাল—মন্দ, সুখ—দুঃখ, উচ্চ—নীচ, আমি—তুমি ইত্যাদি ;—এম্নিতর যত কিছু দ্বৈত-বুদ্ধি, এরা স্বরূপেতে যে একেরই এপিঠ ও ওপিঠ, যেমন তোমার "সামনে ও পেছনে" বলাতে তুমি দুটো হয়ে যাও না, তুমিকে তুমিই বর্ত্তমান থাকো, বা তোমার 'সামনেটা' কি 'পেছনটা' কোন একটাকে বাদ দিলে তোমার অস্তিত্বেরই অভাব হ'য়ে পড়ে,—ঠিক ততখানিই ভুল্‌তে হবে। ঐরূপ যে যে আত্যন্তিকতাকে আমরা মনগড়া একটা দাম আরোপ ক'রে নিয়ে তারি পেছনে নিজেদের অকারণ আবদ্ধ ক'রে রেখেছি, সেই তন্তুগুলিকে এখন আর নিজের গুটী ব'লে মায়া মমতা করলে চলবে না, তাকে কেটে বেরিয়ে আসতে হবে। ঐরূপ আত্যন্তিকতা-দোষযুক্ত যত কিছুকে আমরা সত্য ব'লে বদ্ধ-ধারণা ক'রে নিয়ে ব'সে আছি, সেগুলির কোনটাই আমাদের সত্য পথ অর্থাৎ সিধা রাস্তা ব'লে দেবেনা, বা ঐরূপ সত্য, মিথ্যা, জ্ঞানের পশরা মাথায় ব'য়ে, সত্যের সন্ধানও পাওয়া যায় না। তবে ব্যবহারিক জগতে ওগুলিকে একেবারে কিছু নয় ব'লে উড়িয়ে দিতে পারনা, দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী আপেক্ষিক সত্য ব'লে ধরে নেওয়ায় কোন আপত্তি নেই, আর ঐ আত্যন্তিকতা দোষ-দুষ্ট বিষয় বা বস্তুগুলি যে যার আরোপিত মনগড়া দাম ধরে নেওয়া হয় ব'লেই একের সত্য অন্যের কাছে মিথ্যা ব'লে বিবেচিত হয়, একের সুখ অন্যের দুঃখের কারণ হয়, যেটা আমার কাছে পাপ সেইটাই হয়ত অপরের পুণ্য কর্ম্ম ; আজ এখনি যে পৃথিবী তোমার সামনে নিশার অন্ধকারে ঘেরা ব'লে মনে হ'চ্ছে সেই পৃথিবীরই অপর একজন বাসিন্দা ঠিক এখনই হয়ত দিবার আলো উপভোগ ক'চ্চে ; আমাদের অবস্থান অনুযায়ী যে দিকটাকে আমরা পূর্ব্বদিক ব'লে নির্দ্দেশ

ক'রে থাকি, এই পৃথিবীরই অন্য অংশের লোকেরা সেই দিকটাকে আবার পশ্চিম ব'লে থাকে। আমরা ভারতবাসী, আমরা আমাদের মাথার দিকের আকাশ লক্ষ্য ক'রে এই দিকটা উঁচু আর পায়ের দিকটা নীচু বলি, কিন্তু আমেরিকার লোকেরা ঠিক তার উল্টো দিক দেখিয়ে উঁচু, নীচু, নির্দ্দেশ করে। ঠিক ঐ একই নিয়মে বস্তু বা বিষয়গুলি দেশ, কাল ও পাত্রের অবস্থান অনুযায়ী আপেক্ষিক সত্য বা সত্যের একটা পাশ মাত্র, আর সেই দোষেতেই আমরা একচক্ষু হরিণের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ি, অর্থাৎ ব্যাধাক্রান্ত হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন দিই নির্জ্জন প্রান্তরে। অতএব ঐ সব বিষমতাকে সঙ্গে নিয়ে সত্যের খোঁজে যাওয়ার মানে হয় দু'চোখে ঠুলি বেঁধে কোন কিছু দেখ্‌তে যাওয়া বা কাণে তুলো গুঁজে কোন কিছু শুন্‌তে যাওয়ার মতই মনোরম। যত গণ্ডগোল ঐ খানেই, আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখনা ব'লে। আর ঐ যে সব আপেক্ষিক সত্য-পণ্যগুলি তোমার আমার কাছে কিনি-বিকির জন্যে ভবের হাটে আসে, ওরা স্বেচ্ছায় আস্‌তে পারেনা ; ওর কতকগুলি প্রতিভূ আছে তারাই আমদানি ক'রে একটা দর বেঁধে দেয়, আমরাও সুবোধ বালকের মত তাই মেনে নিই ; তখন আত্যন্তিক বিশ্বাসের ফলে দর ক'ষে দেখারও দরকার বোধ হয় না। ঐ সব প্রতিভূ হচ্চে, বাপ, মা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন, শিক্ষক, উপদেষ্টা ; তারপর সমাজ আছে, রাজা আছে, প্রজা আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আরো কত কি ! ওর মধ্যে কতকগুলি থাকে পয়সা দিয়ে খরিদ করা, কতকগুলি বিনা পয়সায় লব্ধ আর কতকগুলি স্বকৃত।

চুম্বকের যেমন কোন একটী প্রান্তকে ছোট বড় ক'রে দেখার কোন কারণ না থাক্‌লেও আমাদের দরকার মত কোন একটী প্রান্তকে সময় বিশেষে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি, অথচ বাস্তবিক পক্ষে উভয় প্রান্তের

কোনটাই কারো হতে ছোট বড় নয়, বরং উভয়কে নিয়েই এক ; আর ঐ উভয় প্রান্তে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই কেন্দ্রের সন্ধান জানে, এমন কি তার প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যেও চুম্বকের গুণাগুণের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে থাকে ; তেম্নি যত কিছু আত্যন্তিকতা (দোষই বল আর গুণই বল) যুক্ত-বিষয় বা বস্তুকে আমরা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা ক'রে যে দাম আরোপ ক'রে নিয়েছি ঐ সমস্তগুলিই কেন্দ্রাপসারি দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও প্রত্যেকটাই যে একটা মুক্ত কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রেই অবস্থিত রয়েছে, সেই বুদ্ধিকে জাগিয়ে না তোলা পর্য্যন্ত কোন দ্বন্দ্ব-বুদ্ধি নিয়ে ঐ মুক্ত কেন্দ্রের সন্ধান পাই না। ঐ সন্ধিরূপ কেন্দ্রকে জানতে হ'লে দরকার, যে আমাদের অভ্যাস দিয়ে যত কিছু ভাব-অভাবের সৃষ্টি ক'রে নিয়েছি তার কেন্দ্রে স্বভাবকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়ে ভাব-অভাব নামক প্রান্তদ্বয়কে স্বরূপে ফুটিয়ে তোলা, বা ভাব-অভাবের মধ্যেই 'স্ব' ভাবের সত্বাকে চিনে নেওয়া।

আজে-মৌজে আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, এই ছিল তখনকার দিনের শিক্ষার মূল সূত্র। এইবার আমাদের দেখা দরকার যে ঐ সূত্রের সঙ্গে আমাদের প্রশ্নগুলির কোন সামঞ্জস্য থাকে কি না ?

গ্রন্থকার মাত্রেরই উদ্দেশ্য থাকে প্রচলিত সমাজের শ্রেষ্ঠতম ভাব ধারা গুলিকে চরিত্রাংশে ফুটিয়ে তোলা ; সেই নিয়মেই আমরাও ধ'রে নিতে পারি যে, মহাভারতকারেরও উদ্দেশ্য ছিল যে তদানীন্তনকালে মানব চরিত্রের ও বুদ্ধির বা জ্ঞানের যে উৎকর্ষতা লাভ ক'রেছিল সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে ফুটিয়ে তোলা ; উপলক্ষ,—সে সময়ের যিনি শ্রেষ্ঠ মনিষী ছিলেন তাঁর প্রমুখাৎ মূল-সূত্রগুলিকে বলিয়ে নিয়ে চরিত্রাংশে সেগুলিকে আরোপিত ক'রে ফুটিয়ে তোলা।

এখানে কেউ যেন আবার মনে না করেন যে আমরা মহাভারতের ঐতিহাসিক সত্যকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে ব'সেছি! সে উদ্দেশ্য ত মোটেই নয়, বরং সত্যতা সম্বন্ধেই বিশ্বাসটা প্রবল; তা না হ'লে মহাভারতের চরিত্র সমালোচনা করবার কোন সার্থকতাই থাকেনা। তবে এও ঠিক্, এদেশের ভিখারী থেকে রাজা মহারাজা অবধি, যা সব নামের ছটা ও ঘটা,—অত কথা কি, তাদের মুখবিবর-নিঃসৃত যে কোন শব্দকে "অক্ষরের" ফাঁদে টেনে নিয়ে আসতে পারলে, সে আর যায় কোথা! তা সে এখনকার দিনেরই বা কি, আর তখনকার দিনেরই বা কি ? যে কোন একটী লোকের বা কোন বস্তুর বা বিষয় নিয়ে সত্যিকার ইতিবৃত্ত লিখে যাও, পরে তাকে "অক্ষরের" প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে দেখ, দেখবে সেগুলি নিছক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিষয় হ'য়ে দাড়িয়েছে; বরং সত্যিকার ঘটনায় অনেক অসামঞ্জস্য থাকা সম্ভব, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখার সময় সে সবের কোন খোঁচই থাকে না। কারণ এ দেশের ভাষা-সংস্কারকদের কল্যাণে কথাগুলির মানে হয় অক্ষরের মানে নিয়ে। আর অক্ষর বল্‌তে, সব অক্ষরই, অক্ষর কথার সার্থকতা নিয়েই অক্ষর হ'য়েছে। কাজেই কোন ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে সে দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করলে, তুমি আমিও জলজ্যান্ত বেঁচে থাকৃতে থাকৃতেই উবে যেতে পারি, তার আর কোন ভুল হবে না।

তা ছাড়া আরও একটা কারণ, আমাদের নড়া-চড়া, বলা-কওয়া থেকে সব কিছুই,—অত কথা কি, জীব-জন্তু ত দূরের কথা, গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সকলেই যখন একই রাজার প্রজা, একই আইন মেনে চ'লতে হয়, তখন সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করায় কোন দোষই হ'তে পারে না: তারও কারণ আজ যেটা কল্পনার বস্তু

ব'লে, মানুষ ধারণা ক'রে ব'সে থাকে, সেই কল্পনাই আবার একজন মনিষীর কাছে ধরা প'ড়লে, তার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যা কিছু কল্পিত হ'য়েছে বা হবে, তার বিকাশও তেম্নি হয়ত কোথাও হ'য়ে গেছে বা হবে, তা স্থির নিশ্চয়। ভাবের মধ্যে যে একবার ধরা দিয়েছে তার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। তবে একথাও ঠিক্, এমন কিছু কল্পনায় আনা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যা পৃথিবীর গণ্ডীর বাহিরে; তবে নূতন কিছু কল্পনায় আন্তে হ'লে এইটুকু নতুনত্ব হ'তে পারে যে, হাতী দেখেছি,—ঘোড়াও দেখেছি,—অতএব হয় হাতীমুখো ঘোড়া, আর না হয় ঘোড়া মুখো হাতীর কল্পনা ক'রে নতুনত্ব জাহির কর্ত্তে পারি!—মানুষের বুদ্ধি তার বেশী আর দৌড়ুতে পারে না। তবে যা আছে তার অধিকার করা হ'চ্চে আলাদা কথা।

পৃথিবীর গণ্ডীর বাহিরের কোন কিছু কল্পনায় না নিয়ে আসতে পারার আর একটা কারণ যে, আমরা যার শরীরান্তর্গত জীবাণুমাত্র, যার ভাবস্পন্দন নিয়ে আমরা অনুপ্রাণিত, আর আজ এই জগৎ-প্রপঞ্চ আমাদের কাছে সত্যের মতই প্রতীয়মান হ'য়ে রয়েছে (যার অভাবে হয়ত এই জগতটা আমাদের কাছে মাত্র স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হ'য়ে থাকতো) তার ভাবের বাহিরে সত্য-মিথ্যা কোন কিছুই কল্পনায় আনা সম্ভব নয়। যেমন তোমার কি আমার শরীরের কোন একটী কোষের পক্ষে, অন্য কোন জীবদেহের ভাবধারাকে কল্পনায় আনা সম্ভব নয়, মাত্র সে তোমার কি আমার ভাবকেই অনুসরণ কর্ত্তে পারে তার বেশী আশা করা চলে না; আমাদেরও সেই অবস্থা।

এখন হয়ত প্রশ্ন উঠবে যে, পৃথিবীর ভাব দিয়েই যে আমরা ভাবি বা দেখি এ দেখা যে আমাদের নিজস্ব নয় তার প্রমাণ কি? অবশ্য এ

সবের ঠিক্ ঠিক্ কৈফিয়ৎ না থাক্‌লেও, ব্যাপারটা হ'চ্চে অনুবোধ্য ; তবে এ সম্বন্ধে একটা ছোট খাট গল্পের অবতারণা করা যেতে পারে, যা থেকে অন্ততঃ কতকটা হদিস্ পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, তাঁর "গীতার ঈশ্বরবাদ" নামক একখানা বইয়ে কি একটা দার্শনিক মীমাংসা করবার জন্যে "লণ্ডন টাইমস্" নামক একখানা বিলাতী খবরের কাগজ থেকে একটা সত্যি ঘটনা উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছিলেন। ব্যাপার হ'চ্চে এই যে একসময়ে দুইজন বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী শিকার উপলক্ষে আসামের কোন পার্ব্বত্য-অঞ্চলে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে বিদেশীয়দের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এদেশটা সাধু সন্ন্যাসী নামক ঐন্দ্রজালিক-বহুল দেশ। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে কৌতূহল মেটাবার জন্যে দু'একটা নাগা-সন্ন্যাসীর সন্ধানেও রইলেন। অবশেষে এক ফকিরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে তাঁদের অভিপ্রায় জানালেন ; তাতে সে অস্বীকার করলে যে "ওসব বুজরুকি দেখান আমাদের কাজ নয়, ও 'থাক্' আলাদা আছে,—তোমরা এগিয়ে দেখ।"

ব্যাচারারা হতাশ হ'য়ে কতকটা দূর যেতে না যেতে দ্যাখে যে, একজন ফকির, সে তার স্ত্রী, পুত্র নিয়ে সেই দিকেই আস্‌ছে ; তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে স্বীকৃত হ'ল যে সে কিছু দেখাবে। তার পরেই সে তার ঝুলি থেকে একনুটি গুলিসুতো আর একটা ঘটী বার ক'রে,—ঘটীর গলায় সুতোটা বেঁধে সেটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে। ঘটীটা নিক্ষিপ্ত হ'য়ে সড়্ সড়্ ক'রে উপর দিকে উঠতে লাগল, ক্রমশঃ ঘটীটা মেঘের অন্তরালে গিয়ে যেন কোন এক জায়গায় আট্‌কে গেল। তারপর ফকিরটা তার ঝুলি থেকে একটা কাস্তে বার

ক'রে তার ছেলের হাতে দিয়ে, কি একটা অজুহাতে ছেলেকে স্বর্গে উঠে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ব'ল্লে, ঐ সুতো ধ'রে। ফকিরের ছেলেটীও বাপের কথামত সেই সুতো ধ'রে সড়্‌সড়্‌ ক'রে স্বর্গে উঠে গেল। খানিক পরে দেখা গেল যে, সেই ফকিরের ছেলেটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হ'য়ে নীচে তার বাপ, মা ও দর্শকদের সামনে রক্তাপ্লুত হ'য়ে এসে প'ড়তে লাগল'। তাই না দেখে ফকির ত' রেগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে দর্শকদের শুনিয়ে ব'ল্লে যে, ছেলেমানুষ পেয়ে ব্যাটা ইন্দ্র যখন আমার ছেলেকে হত্যা ক'রেছে, তখন আর তার নিস্তার নেই, আমি এখনি গিয়ে তাকে নিপাত ক'রে আসচি ; দর্শকদের বোধ হয় সম্বোধন ক'রে ব'লে গেল যে আমার স্ত্রী এখানে একলা রইলো, আপনারা আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু দেখবেন। এই রকম কিছু ব'লেই ফকির ত রাগের মাথায় ইন্দ্রকে বধ কর্‌তে সেই সুতো ধরে স্বর্গে উঠে গেল।

ফকির চ'লে যাবার পর,—ঐ দর্শক-সাহেবদের মধ্যে একজন বুঝি ছিলেন "সিভিল সার্জ্জন", তিনি তাড়াতাড়ি ফকিরের ছেলের একটা কাটা হাত কি পা নিয়ে, শব-ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখতে লাগলেন যে সেই অঙ্গগুলি প্রকৃত শরীর-তত্ত্ব অনুযায়ী কি না ? ফলে দেখলেন যে সে বিষয়ে এক চুলও ক্রটী-বিচ্যুতি নেই, সবই ঠিক্ ঠাক্ বিজ্ঞানানুমোদিত। অথচ এই ভুতুড়ে কাণ্ডকে বাস্তব বলে ধারণা কর্ত্তেও দর্শকদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্‌ছিল,—তবে কি এ ?

এদিকে ফকির-পত্নী, সে তার পালা সুরু ক'রে দিয়েছিল যে, সাহেবদের খুসী কর্ত্তে গিয়ে তার স্বামীর বুদ্ধির দোষে আজ তার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল ! ছেলেত' গেছেই, স্বামীরও যে কি হয় না হয় তারও কিছু ঠিক্ নেই ইত্যাদি। তার কাঁদুনিতে সহৃদয় সাহেবরা কেউ টাকা, কেউ

ঘড়ি চেন, কেউবা আংটী ইত্যাদি দিয়ে সান্ত্বনা দিতে কৃপণতা করলেন না। ইত্যবসরে দেখা গেল যে মানব শরীরের মতই গঠন অথচ স্বচ্ছ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কয়েকটী মাটীতে এসে পড়তে লাগ্‌লো। তখন ফকিরের স্ত্রী কতকটা উল্লাসিত হ'য়ে বলতে লাগলো যে, এইবার ব্যাটা ইন্দ্র আমার ছেলেকে মারার প্রতিফল পেয়েছে, আমার স্বামী তাকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছে। এমন সময় আকাশ থেকে লটকান সুতোটা কেঁপে উঠলো, পরেই দেখা গেল যে ফকির অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তিতে কাস্তে মুখে ক'রে সুতো ধ'রে নেমে আসছে। তার তখনকার বিভীষণ-মূর্ত্তি দেখে কারো কোনো কথা বলার সাহস হ'লনা, এদিকে ফকির নেবেই তাড়াতাড়ি ছেলের কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে কুড়িয়ে ঝোলার মধ্যে পুরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিদে রাস্তা ধ'রে চ'লে গেল।

দর্শকেরা হাঁ ক'রে তাদের দিকে চেয়ে রইলো, ইতিমধ্যে দেখলে যে, ফকিরের দল খানিকটা পথ যেতে না যেতেই ছেলেটার কাটা শরীর জোড়া লেগে গেছে. বাপের কাঁধের ঝুলির মধ্যে থেকে সে লাফিয়ে মাটীতে প'ড়েই বাপ মার সঙ্গে হাঁটা সুরু ক'রে দিয়েছে।

ফকিরের দল দৃষ্টির অন্তরাল হ'তেই তখন দর্শকদের হুঁস হ'ল যে তারা ঐ ফকিরের দল, তাদের ভোগা দেখিয়ে অনেক কিছুই আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে চ'লে গেছে। তারপর অনুসন্ধানের ফল, কে কার কড়ি ধারে ; যাই হোক এই রকম একটা ব্যাপার।

এ থেকে এই বুঝতে হবে যে. যখন একটা দৃঢ়সঙ্কল্প-লোকের সংস্পর্শে থাকার দরুণ অত সব বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজ তল হ'য়ে গিয়েছিল, অন্ততঃ তখনকার মত দর্শকদের ঐ ফকিরের ভাবটাকেই মেনে নিতে বাধ্য হ'তে হ'য়েছিল, তখন আর বড় চুম্বকের কাছে, ছোট ছোট চুম্বকাণুদের যে ঐ

একই গতি তার আর ভুল কি? অন্ততঃ চুম্বকের আইনও ত তাই বলে, চুম্বকের সংস্পর্শ পেয়ে ছোট ছোট লৌহখণ্ড চুম্বকের ভাবেই প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে! এও তাই নয় কি?

সে ত' যা হয় হ'ল,—এদিকে পাশ কথার ঠেলায়, সিধে রাস্তায় চলাই দায় হ'য়ে উঠেছে। কোথায় আমরা এতক্ষণ মহাভারতের যুগের হস্তিনাপুরে রাজা রাজড়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্ব্বো, তা না হ'য়ে কোথায় আজকালের দিনের আসামের জঙ্গলে ঐন্দ্রজালিকদের ভাঁওতায় প'ড়ে এতটা সময় বৃথাই নষ্ট ক'রলুম। যা হবার হয়েচে, বারদিগর আর যাতে না হয় তার জন্যে বরং সচেষ্ট থাকা যাবে।

আমাদের কথা হচ্ছিল মহাভারতের যুগ নিয়ে যে, সে সময়ের জ্ঞানের উৎকর্ষতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের উপর তার প্রভাব কি রকম ফুটে উঠেছিল তাই দেখা।

মহাভারতের প্রধান প্রধান চরিত্র, যথা,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন আদি ক'রে একদিকে, আর অপরদিকে যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুনাদির চরিত্র-গুলিকে আমাদের এখনকার দিনের বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে ইতরবিশেষ নির্ণয় কর্ত্তে যাই, (অবশ্য সে ক্ষেত্রে আগে আমাদের গ্রন্থকার-নির্দ্দেশিত চরিত্রের পর্য্যায়গুলি মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে) সেই ছোট বড় নির্ণয় কর্ত্তে গিয়ে দেখবো যে আমাদের কারো মতের সঙ্গে কারো মতের মিল হ'চ্চে না। কেউ বলবো অমুক বড়, আর একজন হয়তো তার প্রতিবাদ ক'রে অন্যকে সেই জায়গায় বসাতে চাইবে। কারণ তখনকার দিনে যার ওপর ভিত্তি ক'রে ছোট, বড়'র পর্য্যায় গ'ড়ে উঠতো, সেটা আমরা ঠিক্ ঠিক্ জানি না ব'লে। যেমন গ্রন্থকার নির্দ্দেশিত সব চেয়ে যেটী হীন-চরিত্র রাজা দুর্য্যোধন, তার চরিত্র নিয়ে যদি আজ আমরা সমালোচনা কর্ত্তে

যাই, (গ্রন্থকারের অভিমত বাদ দিয়ে) তা হ'লে দেখবো যে, তার ওপর দোষারোপ করা ত' দূরের কথা, বরং অতবড় চরিত্রবান্, অতবড় ধার্ম্মিক, অতবড় বীর, অতবড় রাজনীতিবিদ্, অতবড় প্রজাবৎসল, অত কথা কি একাধারে যত কিছু গুণের সমাবেশ করা যেতে পারে, সবই তাতে ছিল; এখনকার দিনে যা কারো থাকলে হয় তাকে একটা বড় অবতার, অন্ততঃ পক্ষে পূর্ণ-মানব ব'লে স্তুতিবাদ ক'রে বেড়াতাম; কিন্তু মহাভারতকারের হাতে প'ড়ে লোক-সমাজে বেচারাকে চির কলঙ্কিত হ'য়ে থাকৃতে হ'য়েছে, অথচ কেউ জিজ্ঞাসা ক'রলে তার কারণ খুঁজে পাইনা যে, কেন তাকে হীন বলি।

তবে আমরা ইতিপূর্ব্বে তাদের তখনকার দিনের যে শিক্ষা ও রীতি নীতির সমালোচনা ক'রে এসেছি, সেই আলো দিয়ে দেখ্‌লে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে যে ব্যক্তি যতটা বদ্ধ-সংস্কারের হাত এড়িয়ে নিজেকে মুক্ত ক'রে রাখতে পারতো, সে ততখানি শক্তিশালী বা শ্রেষ্ঠ ব'লে অভিহিত হ'ত; আর যে যতখানি বদ্ধ-সংস্কারে নিমজ্জিত থাকৃতো সে ততখানি দুর্ব্বল বা হীন সাব্যস্ত হ'ত। ঐ আলোটুকু নিয়ে এখন যদি আমরা চরিত্রগুলির সমালোচনা ক'রে দেখি, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবো—যে কেন তখনকার দিনের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, চিরকুমার ভীষ্ম, অর্জ্জুনের হাতে নিহত হ'য়েছিলেন; অস্ত্রগুরু দ্রোণ, শিষ্যের হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন; বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণেরও সেই গতি হ'য়েছিল; এই কর্ণ-বধের সময়েই গ্রন্থকার, অর্জ্জুনের যতটুকু অহমিকা ছিল সেটুকুকেও প্রশমিত ক'রে নেবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখাৎ ঐ নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। অর্থাৎ যে যতবড়ই বীর হোক্, সে যদি কোন একটা সংস্কারের (তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক) বশীভূত হ'ত' সেইটুকুই হ'ত ছিদ্র, সেই দুর্ব্বলতার অবকাশটুকু

নিয়ে অপ্রমত্তচেতা প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের কাজ হাঁসিল ক'রে নিত। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়, যে যতটা নিজেকে সহজ ক'রে নিতে পার্ত্তো লোকের বৃথা ভালমন্দ বলার অপেক্ষা না ক'রে, দুর্ব্বলতার আকর আত্মগোপন, আত্মপ্রতারণা বা আত্মহত্যারূপ হীন-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হ'তে পারতো সেই হ'ত সমাজের পূজনীয়—তা সে যে কেউ হোক্ ; তাই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে সমাজের শ্রেষ্ঠপদ "বেদ-ব্যাসে"র পদবীতে দেখতে পাই, কর্ণকেও আভিজাত্যাভিমানীদের মধ্যে আসীন দেখ্তে পাই। এম্নিতর যে কোন দিক দিয়েই তখনকার দিনের যে কোন বিষয়কে নিয়ে সমালোচনা ক'রে দেখি না কেন, প্রায় সবই ঐ একই আলো দিয়ে অতীতের অন্ধকারে ঘেরা অতীতের অনুশীলনকে প্রকাশিত ক'রে নিতে পারা যায়, তাতে বিশেষ কোন গর্মিলের সম্ভাবনাও থাকে না।

মানব-চরিত্রের মধ্যে ঐরূপ মুক্তভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে তখনকার তাদের প্রাথমিক শিক্ষাই ছিল যে, ঐ পথের পথিকদের পথিমধ্যে প্রধান প্রধান অন্তরায় কি তাই জানা,—শুধু জানা নয়, অন্তরায়গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় ক'রে নেওয়া। এই যে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় মানুষের এগোবার পথে, এর নাম দিয়েছিল রিপু, অর্থাৎ মানুষের গন্তব্যস্থানে পৌঁছানর বাধারূপী শত্রু। এই রিপুরা হ'চ্চে সংখ্যায় ছয় জন মাত্র, যথা ;—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। এরা বা এদের মধ্যে যে কোন একটী যদি একবার কোন রকমে কারো ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে নিতে পারে, তা হ'লে তার অবস্থা হয় হাতীর কাঁধে মানুষ না ব'সে মানুষের ঘাড়ে হাতী চড়ার মতই বিষম মনোরম অর্থাৎ মানুষটীকে আর দেখা যায় না, হাতীকেই চলা-ফেরা কোর্ত্তে দেখি,—যা আমাদের অবস্থা আর কি ?

কিন্তু যদি কোন কৌশলে একবার ওদের চিনে নিতে পারা যায়, আর চোখে চোখে রাখা যায়, তা হ'লে ওরা আর কর্ত্তার ওপর কর্ত্তাত্বি জাহির কর্ত্তে ভরসা করেনা, আর তখন ওরাই আবার নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে এবং পরে বহিঃশত্রুকে সায়েস্তা করবার একমাত্র শাণিত অস্ত্র হ'য়ে দাঁড়ায় ঐ কর্ত্তার হাতে। এমন কি স্থিরলক্ষ্য অস্ত্রবেত্তাদ্বারা প্রযুক্ত হ'লে পর ওরা ব্রহ্মপদকেও বেঁধে এনে দিতে পারে। কিন্তু কথা কি! বলে "স্বভাব যায় না ম'লে আর ইল্লত যায় না ধুলে", এদের স্বভাবও ঠিক তাই। যদি একবার কোন কারণে চোখের আড়াল ক'রেছ ওরা যদি কোন ফাঁকে একবার নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষণিকেরও অবকাশ পায় তখনই কর্ত্তাকে সাতঘাটের জল খাইয়ে ছাড়বে।

এই ত' গেল প্রথম পাঠ। তারপর ওদের হাত এড়িয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলির কর্ত্তাত্বির ওপর একহাত নোবার পালা, বা দ্বিতীয় পাঠ যে, আমার বিনা অনুমতিতে যাকে তাকে তোমরা অন্দরে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না, তা হ'লে কয়েদ খাটতে হবে। আর এরা এতই ছ্যাঁচড়া যে অনেক ক্ষেত্রে দু'-একবার কয়েদ না খাটা পর্য্যন্ত ঠিক সায়েস্তাও হয় না। এদের সায়েস্তা ক'রে নিতে পারলেই কর্ত্তাটী রথা ব'লে খ্যাত হ'ত,—তা সে কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে। তা হ'তে আরো যারা এগিয়ে যেত' অর্থাৎ যারা লজ্জা ভয়, হিংসা, দ্বেষাদি রহিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'রতে শিখতো তারা হ'ত মহারথী; ততোধিক আবার যারা নিজেদের "নিমিত্ত-মাত্র" জেনে অর্থাৎ যিনি "ব্রহ্মবেত্তা" হ'তেন, বা যিনি শত্রু-মিত্রবোধ কিম্বা হত্যাকারী বা হত হওয়া রূপ দ্বন্দ্ববুদ্ধিকে অতিক্রম করার সন্ধান পরিজ্ঞাত হ'তেন, তিনিই ব্রহ্মাস্ত্র লাভ ক'রে সর্ব্বজন পূজিত, বরেণ্য ও রথীন্দ্র পদারূঢ় হ'তেন।

মোটের উপর এটা বেশ বোঝা যায় যে, তখনকার যুগে লোক শিক্ষার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্যই ছিল, সর্ব্বপ্রকার বদ্ধ-সংস্কারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে নেওয়া—যাতে কেউ কারো প্ররোচনায় প'ড়ে আত্মহারা হ'য়ে স্বধর্ম্ম হারিয়ে না বসে, বা নিজের নিজের লক্ষ্য না ভুলে যায়; যা হ'চ্চে পার্থিব ব্যাপারে মানবের সাধারণ দুর্ব্বলতা, যা বা যে দুর্ব্বলতা মানুষকে একবার পেয়ে ব'সলে দড়িটাও সাপ হ'য়ে মানুষকে ভয় দেখায়।

কেন্দ্রে নিজেকে স্থির রাখ্‌তে হ'লে কল্পিত সত্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে সহজ ও সরল সত্যকে অনুসরণ করাই হ'চ্চে শ্রেষ্ঠ উপায়, তাও আবার শুধুই আচার-ব্যবহার বা বাক্য দিয়ে পালন করায় কোন সার্থকতা নেই, যার অন্তরের স্বচ্ছতার অভাব থেকে যায়। তাই তখনকার সমাজ তাকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মেনে নিত'; যে যতটা অন্তরের দিক্ থেকে সহজ ও সরল সত্যের অনুসরণ ক'রে অন্তর্নিহিত শক্তিকে উজ্জীবিত ক'রে রাখ্‌তে জানতো,—আর সেইটাই ছিল তখনকার দিনের মর্য্যাদা দান বা গ্রহণের মাপকাটী। তারা এও জানতো যে কোন কিছু গোপন করার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে তখনই ফুটে ওঠে, যখন সে অসত্যকে অনুসরণ কর্ত্তে গিয়ে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বসে, তা সে যতই সুন্দর বা কুৎসিত হোক না কেন? তাই তারা ব্যবহারিক মর্য্যাদাকে বড় ক'রে স্থান না দিয়ে আত্মশক্তির মর্য্যাদাকে শ্রেষ্ঠাসন দিত। এই রকম আত্মহত্যার হাত থেকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-শক্তিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাই ছিল তখনকার সমাজ-অনুশাসনের ধারা বা রাজনীতির মূল নীতি।

যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা এতটা বেড়ে এসেছি, এর মধ্যে এমন অনেক কিছুই হয়ত' বলা হ'য়েছে, যার জন্যে অনেকেরই গায়ে ঝাল লাগতে

পারে, বেশীটা হ'বে আমাদের বলার দোষে,—তার জন্যে হয়ত' বা অনেকেই ক্ষমা-ঘেন্নাও ক'রে নিতে পারেন ; কিন্তু এমনও অনেকে থাকতে পারেন যাঁরা রেহাই দেবার পাত্র নন, হয়ত' প্রমাণাদির দাবী দাওয়া ক'রে ব'সবেন, তাঁদের জন্যে শুধু এইটুকু কৈফিয়ৎ এখানে দেওয়া রইলো যে তাঁরা পরের মুখের ঝাল খাওয়ার আস্বাদ নিয়ে ঝগড়া না ক'রে, নিজেরা একটা আধটা লঙ্কা চিবিয়ে না আসা পর্য্যন্ত, প্রমাণাদি ত' দূরের কথা, কোন আলোচনাই হ'তে পারেনা। তারপর তাঁরা ঘরে ব'সে যদি রাজার মাকে ডান বলেন তাতে রাজার মার গায়ে ফোস্কাও প'ড়বে না বা ফাঁসিও হ'বে না, অতএব আমাদেরও কোন আপত্তি নেই।

আরো হ'য়ে পড়েছে কি,—তখনকার তাদের চলবার ধারা ছিল ভিতরের অনুশাসনকে মেনে, তাদের বুদ্ধি পাহারা দিত কেন্দ্রাভিসারি দৃষ্টির পেছনে,— আর আমাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চল্‌ছে কেন্দ্রাপসারিবুদ্ধিকে আরো সজাগ ক'রে তুল্‌তে। তাদের সমাজ ছিল—ভাবের আদান-প্রদানকে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, ধর্ম্ম ছিল—মানবত্বকে আদর্শে বজায় রাখার জন্য, শিক্ষা ছিল—আত্মোৎকর্ষের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমাদের এখনকার সমাজ হ'য়েছে কাড়া-বেকৃড়ার জন্যে, ধর্ম্ম হ'য়েছে আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য, আর তেম্নি শিক্ষার নামে হ'চ্চে আত্মহত্যার ব্যবস্থা! কারণ হ'য়েছে কি ? মাথার মাথা-ব্যথা প'ড়ে গেছে যে, পাছে পা বলে যে, মাথা এইবার তুমি হাঁটো আমি থাকবো উপরে, এ সেই "পেট বসে খায়" এর গল্পই এসে পড়ে ;—পেট ব্যাচারার তবুও কিছু বুদ্ধি ছিল বল্‌তে হবে যে, সে জানতো, আজ ওরা ধর্ম্মঘট ক'রলেও কাল তারা বাধ্য হবে পেটের সঙ্গে আপোষ কর্ত্তে। কিন্তু,

নিরেট মাথার সে বুদ্ধি আর আজও যুগিয়ে উঠল' না। তাই না এত দুর্বিপাকের সৃষ্টি ?

এতদূর পথ চলে এসে, এইবার হয়ত' বা এতক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি এসে প'ড়েছে, কারণ যা নিয়ে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ "মানবত্ব" কি ? কথাটার এখনও সুস্পষ্ট ক'রে কোন কিছুই বলা হয় নি। অবশ্য যা হয়ত অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে, একবার ছেড়ে কয়েকবারই বলা হ'য়ে গেছে ; ঝোপ-ঝাপের আড়াল পড়াতেই হয়ত সকলের দৃষ্টি সেদিকে পড়ার তেমন অবকাশ পায়নি। যা হ'য়ে গেছে তার আর চারা নেই ; এইবার একটা কৈফিয়ৎ টানবার চেষ্টা করা যাক্, দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় মরে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেশ, কাল, ও পাত্রের সমালোচনা কর্ত্তে গিয়ে মোটামুটি ভাবে দেখেছি যে, তাবৎ চরাচর বিশ্ব এক "অন্তর" শক্তির বহুধা-স্ফুরণ মাত্র। যেমন তোমাকে কেন্দ্র ক'রে তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন, ঘর, বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, অনেক কিছুরই সমাবেশ হ'য়ে থাকে, অবশ্য এখানে আর উল্লেখ ক'রে দিতে হ'বে না যে, এ তুমি,—তোমার জড় দেহটা মাত্র নয়, কারণ যাদের নিয়ে সম্পর্কের কথা বলা হ'ল তারা আসল "তুমি"র অভাবে ওই জড় দেহটাকে মোটেই আমোল দেয়না, সেটা জানা কথা ; বা যেমন ধরা যেতে পারে যে, যদি আমাদের কোন কিছু করবার দরকার হয়, তখন বিষটীকে নিয়ে প্রথমতঃ এমন একটী কেন্দ্রে তাকে নিয়ে যেতে হয় যে কেন্দ্রকে, কখনও হয়ত' মন, কখনও হয়ত' বুদ্ধি ব'লে থাকি—যার পরশ্ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এই প্রত্যক্ষ গোচর কর্ত্তৃত্বাভিমানী কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বা তদনুপূরক জ্ঞানেন্দ্রিয় গণের কোন কিছুই করণীয় থাকে না অর্থাৎ বিষয়ের বিকাশ ত' দূরের

কথা, গ্রহণই কর্ত্তে পারে না ; যা আমরা ইতি-পূর্ব্বেই একবার আলোচনা ক'রে এসেছি, এ তারি পুনরোক্তি মাত্র। তা ছাড়া, ধর ঐ যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি, যা নিয়ে আমাদের অভিমান আর ধরে না, তাদের শক্তিই বা কতটুকু, আর কতই না অসম্পূর্ণ, যার সাহায্যে আসলের কথা চুলোয় যাক্, নকলগুলিকেই ঠিক্ ঠিক্ ধর্‌তে ছুঁতে পারিনা। উদাহরণ-স্বরূপ আমাদের এই জলজ্যান্ত নিরেট্ শরীরটাকেই যদি চোখের সামনে দাঁড় করাই তখন তার মধ্যে যে কোনখানে এতটুকু আকাশের অবকাশ আছে, তা আর এ চোখ বাবাজী দেখ্‌তে পান না ; কিন্তু এমন উচ্চশক্তি সম্পন্ন জড় দৃষ্টিও থাক্‌তে পারে, যেদৃষ্টির সামনে প'ড়্‌লে আমাদের চোখের এই নিরেট দেহটা উবে গিয়ে আকাশে পর্য্যবসিত হ'য়ে যেতে পারে, যেমন "রঞ্জন রশ্মিরূপ" দৃষ্টির সামনে আমাদের শরীরের অবস্থা দাঁড়ায়। তা ছাড়া অনেক জীবজন্তুই আছে, যাদের কোন না কোন ইন্দ্রিয় আমাদের চেয়ে শতগুণে তীক্ষ্ণতর।

এইরূপ পর্য্যালোচনা ক'রে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ে এত মানাভিমান তারা নেহাৎই হীনশক্তিসম্পন্ন, কাজেই তাদের মারফৎ নির্দ্দেশগুলিও সম্পূর্ণ হয় না ব'লে আমাদের বার কর্ত্তে হয় আর একটা চোখ্ দেখার জন্যে, এ কাণ মনের কথা শুন্‌তে পায়না ব'লে আমাদের দরকার হয় আর একজোড়া কাণের, ঠিক তেমনিটী দরকার হ'য়ে পড়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতিভূ, অন্তর্জগতের কার্য্যনির্ব্বাহ করবার জন্যে,—যে দিকটা সাধারণতঃ আমরা খেয়ালেই আনিনা। এই গেল একটা ব্যাপার।

ইতি পূর্ব্বে আমরা আরো আলোচনা ক'রে এসেছি যে, যে মাটীকে আমাদের যথা সর্ব্বস্ব জেনে সারমেয়ের মত তাই কাম্‌ড়ে প'ড়ে আছি,

সেই মাটীতে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে আমরা কি দেখেছি? যে—সে জল অবলীলাক্রমে মাটীর মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে, তাতে তখন আমরা এইটুকু বুঝেছিলাম যে মাটীর মধ্যে জল চলাচলের রাস্তা আছে বা অবকাশ আছে। আর জল যেখানে যাতায়াতের রাস্তা পেয়েছে,—ততোধিক সূক্ষ্ম "তেজের" গতিবিধি সেখানে অনিবার্য্য বা জলের সঙ্গেই রয়েছে, আবার তেজের গতিবিধি সেখানে প্রমাণিত হ'চ্চে, সেখানে বায়ুর চলাচল আমরা মেনে নিতে বাধ্য; আবার বায়ুর আকাশ ছাড়া অন্য আশ্রয় না থাকাতে শেষে সেই আকাশই প্রবল হ'য়ে যায়। ও দিকে আমাদের শরীরটাকে শক্তি-সম্পন্ন দৃষ্টির সামনে দেখেছি যে, আকাশে মিলিয়ে যায়, আবার এখানে যার আশ্রয়ে থেকে আমাদের যত কিছু আস্ফালন, তারও অবস্থা শেষে তাই দাঁড়ায়। এখন "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"। গ্রহ-নক্ষত্রগণ কোটী কোটী বৎসর ধ'রে দৌড়াদৌড়ি ক'রেও যে মহাশূন্যের সীমা-নিমার নির্দ্দেশ পেলেনা, আজ অনুশীলন কর্ত্তে গিয়ে কি শেষে সেই অথৈ শূন্যে ভেসে বেড়াতে হবে?

মাভৈঃ! হতাশ হবার কিছুই নেই! ওটা ত' আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিকের মধ্যে একটা। আমরা লক্ষ্য ক'রে থাকি আর নাই থাকি, ঘুমের কোলে আশ্রয় নেওয়ার মানেই তাই। ঘুমন্ত অবস্থার কথা ছেড়ে দিয়ে জাগন্ত অবস্থার কথাই ধরা যাক্, অন্ধকার ঘরের মধ্যে থাকবার সময় যখন আমাদের এই পার্থিব শরীরটাকে আঁধার এসে গ্রাস ক'রে ফেলে, যেচোখ দিয়ে না দেখা পর্য্যন্ত আমরা কোন কিছুকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনা, যখন সেই বিশ্বাসী চোখ দিয়েও দেহের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না, আর না পাওয়া গেলেও আমিত্বের বিন্দুমাত্রও কোন অভাব বা অসুবিধা থাকে না, সেই সে অন্ধকার ঘরে শুধু যে তোমার আমার

পার্থিব শরীরটা লুপ্ত হ'য়ে যায় তা নয়, তখন সেই ঘরের ও বাহিরের যত কিছু অবলম্বন,—আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, ঘর, বাড়ী, এমন কি আসল ভিত্তি পৃথিবীটা পর্য্যন্ত তিমির গ্রাসিত হ'য়ে, সব কিছুরই একান্ত অভাব হ'য়ে পড়ে,—তখন আমাদের সেই অবস্থাটা কি অবস্থা ? সেই নিরালম্ব অবস্থায় থাকার সময় তোমার বা আমার কি কোন ভয় ভাবনার উদ্রেক হয় ? ঐ সব অভাবের কথা ছেড়ে দিয়ে, যারা অতি আপনার সেই ইন্দ্রিয়গণ নিরাবলম্বনে থাকা সত্ত্বেও যখন "আমি" কোন কিছুরই অভাব বোধ করেনা বা ভীতও হয় না, বরং সে "স্ব"ভাবেই তার অভাব পূরণ ক'রে নেয়, তখন সবই যদি সত্যি আকাশে পরিণত হ'য়ে যায়, তাতে ভয় পাবার মত তখন যেমন ছিলনা, এখনও থাকবে না ; রাত্রি প্রভাতে আবার তারা তোমার হ'য়ে "স্ব"ভাবের অভাব ঘটিয়ে দেবেই, যা নিয়ে আমরা থাক্‌তে চাই। তবে একথাও ঠিক্ যে, ও অন্ধকারটুকু না থাক্‌লেও আমাদের কোন কিছু ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয় না। যত কিছু গড়ার বস্তু সে সব-কিছুকেই আগে খোদাই ক'রে নিতে হয় ঐ অন্ধকার ঘরে, যেখানে পার্থিব আলোকের প্রবেশ সে দেশের রাজ-আইনে একান্তই নিষিদ্ধ।

তবে এখানে একথাও বলি, ঐ অন্ধকারকে চিনি আর নাই চিনি, একবার ঐ অন্ধকার ঘরের নিরাবলম্বনে অবস্থিত "আমি"র সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে রাখাটা আমাদের উচিত নয় কি ?—সে কে ? কেন সে পেছু পেছু ঘোরে ?—তার স্বরূপই বা কি ? তার দেশ কোথায় ? আর নিরাবলম্বনে সে থাকেই বা কি ক'রে ?—ইত্যাদি। একবার দেখতে দোষ কি ? তাতে ত' আর জাতঃপাত হবার কোন ভয় নেই ? তা ছাড়া ডুবে জল খাওয়া অভ্যাসে ত' আমরা সকলেই সিদ্ধ হস্ত, শিবের বাবাও

টের পাবেনা। অথচ মাঝে থেকে এমন একজনের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে থাক্‌বে, যে মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার আমার সঙ্গ ছাড়েনা, এই রকম একটা নিমকের চাকরকে হত শ্রদ্ধা করা, সে যে আজকালের সভ্যতাতেও বাধে।

অবশ্য ঐ অন্ধকার ঘরের আমির সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হ'লে বা তাকে দেখ্‌তে হ'লে,—আমাদের এই চামড়ার চোখ দু'টো দিয়ে দেখা সম্ভবপর হয় না; তাতে দরকার হয় সেই চোখ—যে চোখ দিয়ে তুমি তোমার অতীতের স্মৃতিকে আকাশের বুক চিরে খুঁজে বার কর—যে চোখ দিয়ে কবির কল্পলোকের ছবিকে দেখ'—যে চোখ দিয়ে তুমি তোমার ভবিষ্য বিলাসের সামগ্রীগুলিকে রূপের আলোয় ছুবিয়ে নাও, এ সেই চোখ! এ সেই চোখ—যে চোখ বুজ্‌লে, সব কিছু থেকেও কোন কিছুই থাকে না।

এমন অনেক কিছুই সে চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হয়; সে চোখ যেমন তোমার 'তোমা'কে কেন্দ্র ক'রে তোমার সম্মুখে সাকারকে ফুটিয়ে তোলে, তেম্‌নি তোমার পেছনে যে নিরাকার বিরাজিত, তাকেও অবলম্বন ক'রে থাকে,—তেম্‌নি আলো-আঁধার, ব্যক্ত-অব্যক্ত, অতীত-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি, কেবল তুমি বর্ত্তমান র'য়েছ ব'লেই, এই তাবৎ চরাচর, তোমার "আমি"কে কেন্দ্র ক'রে তোমার চোখের সাম্‌নে ফুটে র'য়েছে—"তোমার আমিময় মণ্ডল মধ্যে"! যেমন সূর্য্যপ্রাণ গ্রহগণ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে! অতএব একবার সেই "আমি"র সঙ্গে আলাপ ক'রে নেওয়াটায় আপত্তি কি? যাকে নিয়ে সদা সর্ব্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে থাক্‌তে হ'চ্চে, যে অযাচিতভাবে তোমার খিদ্‌মৎ খেটে বেড়ায়, তার শুধু বারটুকু নিয়ে নাড়া-চাড়া না ক'রে, তার অন্তরের দিক্‌টাও দেখা দরকার নয় কি?

অনেকের ঐ সব ব্যাখ্যা শোনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, এগুতে চায়না এইজন্যে যে, পাছে তাদের সাধের তরী অরূপের হাওয়া লেগে বান্‌-চাল্‌ হ'য়ে যায় ; সে ক্ষেত্রে এ অভয়টুকু এখানে দেওয়া যেতে পারে যে, যা নিয়ে আমরা র'য়েছি তার কণামাত্রও কাউকে ছাড়্‌তে হ'বে না, কারণ যা আছে তা আবহমানকাল পর্য্যন্তই থাকে ও থাক্‌বে ; কেউই তাকে ছাড়তে বা ছেড়ে যেতে পারে না, যদি না সে নিজেই একপাশে হ'য়ে পড়ে ;—যেমন রসায়নবিদ্‌রা জলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে ব'লে, জল ত্যাগ ক'রে ব'সে থাকে না, বরং জলকেই নানারকমে খাটিয়ে নেয়, এ ক্ষেত্রেও তেম্‌নি লাভের সম্ভাবনাটা থাকে বেশী—প্রচেষ্টার অনুপাতে।

আর কিছু হ'ক্‌ আর নাই হোক্‌, মোটের উপর মানুষ হ'তে হ'লে আমাদের জান্‌তে হবে অপর দিকটাও, যা বা যে দিক্‌টা অব্যবহৃত থাকার দরুণ, সবতাতেই দড়িকে সাপ মনে করার মত, ভ্রম-প্রমাদের সৃষ্টি ক'রচে ! অমৃতের পুত্রেরা আজ কি না স্বেচ্ছায়, মৃত্যু নামক রাক্ষসকে সৃষ্টি ক'রে তারি কবলে আত্ম বিসর্জ্জন করচে—বা মোহকে প্রশ্রয় দিয়ে চ'লেছে। যে ভ্রমের বশে আজ আমরা পশুসুলভ প্রবৃত্তির তাড়নায়, হিংসা-দ্বেষাদির বশীভূত হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে নিগৃহীত করার ছলে, আত্মনিগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছি—বিকার-গ্রস্ত রোগীর মতই।

ওদিকে আমরা আকাশ অবধি এসে, পাত্রের আরো তিনটী অবস্থাকে যে উহ্য রেখে এসেছি, সেটা এক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ না ক'রলেও চলে, কারণ ও তিনের যে কোন একটী অবস্থাকে চিনে নিতে পারলেই কাজ হাঁসিল্‌ ক'রে নেওয়া যায়। তার পরেও যদি কারো কিছু জানবার

থাকে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় ; তবে এটা ঠিক্, এদের জেনে নিতে পার্‌লে পরের অবস্থা জানবার জন্য আলাদা মাথা ঘামাবার দরকার কোন দিনই হয় না, হয়ও নি।

অবশেষে মানবত্ব ব'ল্‌তে আমরা এইখানে এটুকুই বুঝবো যে, যিনি অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হ'য়ে "স্বতঃমুক্ত" কেন্দ্রটীকে একপেশে অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে "স্বভাব-মুক্ত" অবস্থায় পর্য্যবসিত কর্ত্তে পারেন, অর্থাৎ যতকিছু দ্বিভাবব্যঞ্জক বুদ্ধি সেগুলিকে পৃথকবোধে না দেখে তারা যে একেরই দুই বাহু, উহাদের কোন একটীর অভাবে যে অন্যটীও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে, উহারা উভয়েরই যে একই কেন্দ্রীয় শরীরের তুল্য-মূল্য অঙ্গও উভয়ে মিলিত হ'য়ে কেন্দ্রীয় শরীরকে রক্ষণা-বেক্ষণ ক'রে থাকে ও এতদুভয় হস্তের কোন একটীকে অব্যবহৃত রাখার দরুণ সে যেমন শীর্ণতা দোষ প্রাপ্ত হ'য়ে কেন্দ্রীয় শরীরের অঙ্গহানি ঘটায়—এই সবগুলি জেনে উভয় হস্তকে যিনি সমানভাবে ক্রিয়াম্বিত ক'রে তুলতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানব। মহাভারতকারের ইনিই হ'লেন "নর" বা সব্যসাচী (অর্জ্জুন) তা ছাড়াও ঐ "নর"টীকে সাকুল্যে দশটী 'পাস্' দিতে হ'য়েছিল ঐ নরত্বলাভের জন্য। এর পরেও আর একটী পদের সন্ধান শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন, সেটী হ'ল মানবের "নারায়ণত্ব"। কথাটা হয়ত অনেকেরই মনঃপুত হবে না, কিন্তু যেটা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব'লে গেছেন, অপরের মনঃপূত না হ'লেও বলায় বিশেষ কোন দোষ দেখিনা, আর আমাদের বুদ্ধি সেটা স্বীকার কর্ত্তে না চাইলেও তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ধুরন্ধরকে তা স্বীকার ক'রে নিতে হ'য়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্যে যখন রাজা দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই গিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করবার জন্য—তখন তিনি উভয়কেই জানান যে, তোমরা উভয়েই

আমার সমান আত্মীয়, উভয়কেই সমান সাহায্য করা আমার একান্ত দরকার, অথচ আমি একলা. এক্ষেত্রে আমি তোমাদের উভয়কে কি সাহায্য কর্ত্তে পারি। তবে এক উপায় আছে, আমার একঅক্ষৌহিণী "নারায়ণী" সেনা আছে, তারা প্রত্যেকেই জনে জনে আমার মত সুরবীর, আমার অনুরূপ শস্ত্রবেত্তা, আমার অনুরূপ জ্ঞানী, এক কথায় উহাদের প্রত্যেকেই আমার চেয়ে কোন অংশে ন্যূন বা হীন নহে, সকলেই আমার সদৃশ ; আর সেকথা তীক্ষ্ণধী রাজা দুর্য্যোধনকে মেনে নিতে হ'য়েছিল ; আর তিনি তাই একটা 'কৃষ্ণকে' না নিয়ে, ঐ অক্ষৌহিণী "কৃষ্ণ"দের নিয়েছিলেন, আর বোকা অর্জ্জুন নিয়েছিল একটা কৃষ্ণকে। হয়ত অনেকেই এখানে প্রশ্ন ক'রবেন, তাহ'লে এ কি রকম "নারায়ণত্ব" যারা অর্জ্জুনের হাতে নিহত হ'ল। প্রকৃতপক্ষে তারা অর্জ্জুনের অবধ্য ছিল। তাদের মেরেছিল ঐ ঘর শত্রু বিভীষণ ঐ শ্রীকৃষ্ণই ;—যার কাছে তার হাতে গড়া কৃষ্ণদের কোন অলি-গলিই অজানা ছিল না। আর কোন কিছুর আবিষ্কর্ত্তার 'ধী'শক্তির সঙ্গে তদ্ তদ্ বিষয়ের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিষ্যবৃন্দের 'ধী'শক্তিকে সমতুল মনে করাও চলে না। অবশ্য এ কথা বল্‌ছিনা যে গুরুর চেয়ে শিষ্যরা কখনও বড় হয় না। খোদ আবিষ্কারকের কাছ থেকে কোন বিষয় যে সব শিষ্যেরা প্রথম সংগ্রহ করে, তারা সেটা নিয়ে হজম কর্ত্তে ও সাধারণে প্রচার কর্ত্তেই তাদের দিন কেটে যায়, উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা আর তাদের দ্বারা সম্ভবপর হয় না; পরবর্ত্তী প্রশিষ্যদের পক্ষে বরং সেটা সম্ভবপর, যদি কেউ তেমন অনুসন্ধিৎসু বৃত্তি নিয়ে তদ্ তদ্ বিষয়ের অনুশীলন করে। মোট কথা, অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতরূপ দুটী বিন্দু অবলম্বনে একটী সরলরেখা টানাই হ'চ্চে মানবত্বের পরিচায়ক বা চুম্বক আইন অনুসারে দু'টি প্রান্তের কোন একটী প্রান্তে বেশী ঝোঁক না দিয়ে

স্বভাবতঃই যে একটী মুক্ত 'কেন্দ্র' গ'ড়ে ওঠে, মানবের মধ্যে ঐ কেন্দ্রিয় শক্তির বিকাশের নামই "মানবত্বের বিকাশ।"

ঐ একই নিয়মে—'মুক্তকেন্দ্র' বেষ্টি অণুগুলি সম্মিলিত হ'য়ে, যেমন সমষ্টি শরীরকে মহা-প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে, সেই হ'ল মানব সভ্যতার পরিচায়ক মানব সমাজের পরিকল্পনা; সেই নিয়মেই মানব সমাজের সব কিছু গ'ড়ে তোলাই হ'চ্চে মানবত্বকে জাগিয়ে তোলার একমাত্র উপায়,—যাতে সমষ্ঠি শরীরান্তর্গত প্রত্যেক অণুটীই, কেন্দ্রীয় ভাবধারায় স্নাত হ'য়ে আত্মবান হ'য়ে ওঠে। আর তখনই মানব-সমাজে প্রকৃত সুখই বল, আনন্দই বল, শক্তির উন্মেষই বল আর সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ মানব সভ্যতার বিকাশই বল, সবই সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে; পেছনের বোঝা টেনে কোন কিছু গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টা, সম্পূর্ণই অলীক ও বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমাদের এত যে সব বলা কওয়া হ'ল, এ সবের মূলে কিন্তু আর একটী জিনিষ আমাদের জানবার আছে, সেই সর্ব্বমূলাধার বস্তু হ'চ্চে আমাদের 'ভাব' সম্পদ। সেই ভাব সম্বন্ধে মোটামুটীভাবে এখানে একটা আলোচনা থাকা দরকার ব'লে মনে হয়: তা না হ'লে এমন অনেক কিছুই হয়ত বাদ থেকে যাবে, যার অভাবে হয়ত সবকিছু বুঝেও অনেক কিছুই বোঝা হবে না, হয়ত বা ঐ বোঝাই শেষে 'বোঝা' হ'য়ে দাঁড়াবে।

আমরা শয়নে, স্বপনে বা জাগরণে, যখনি যা কিছু করি, সবেরই মূলে থাকে একটা ভাবের খেলা। ভাব না থাক্‌লে যে, এই এতশতর পরিণতি কি হ'ত তা কল্পনাও করা যায় না। প্রত্যেক খুঁটীনাটির মধ্যে দিয়ে, যে ভাব নিয়ে আমাদের ঘরকন্না, তার স্বরূপ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ থাক্‌লে, আমাদের যত কিছু অনুশীলন, আলোচনা, সব সেই

ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বেমালুম সরে পড়বে, এত যে আল্-আঁটন দেওয়া সবই হয়ত বৃথা হ'য়ে যাবে। কারণ এমন কতকগুলি ভাব চলৎ-চল্তি প্রথায় আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, যে তাদের প্রকৃত মূল্য জানা না থাক্‌লে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক্ ক'রে ওঠা শুধু দুরূহ ব্যাপার নয় বরং নিতান্তই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণচরিত্রে এরূপ বহু বিষয়ের সমাবেশ থাক্‌লেও আমরা তার মধ্যেকার একটা ঘটনার উল্লেখ ক'রে বিচার, আলোচনায় এনে দে'খতে চেষ্টা করবো যে তার মূল কোথায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম জীবনের লীলাখেলার রঙ্গভূমি হ'চ্চে ব্রজধাম, সেখানকার ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মর্দ্দ আদি ক'রে সকলেই কৃষ্ণকে যে যার প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাস্‌তো, শ্রীকৃষ্ণেরও সেদিক থেকে কোন দিনই কোনরূপ কৃপণতা ছিল না। দৈবাৎ একদিন এক অপরিচিত দূতের মুখে কৃষ্ণ খবর পেলে যে, তার কংসাবতী যাওয়া একান্ত দরকার,—আর এখনি। কৃষ্ণও কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে সরাসর গিয়ে সেই দূতের রথে চেপে বস্‌লেন; আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবদের সে খবরটা জানানো, কি একটা খবর দেওয়া, বা প্রিয়জনদের কাছে বিদায় নেওয়া,—তা ভব্যতার দিক্ থেকে না হ'ক, কর্ত্তব্যের খাতিরেও দরকার তা তার হাব-ভাবে এতটুকুও প্রকাশ পেলে না। এদিকে কিন্তু ব্রজবাসীরা সকলেই সেই মর্ম্মান্তিক সংবাদ পেয়ে, দলে দলে এসে রথের চতুর্দ্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কত কাকুতি মিনতি, কত কান্নাকাটী কর্ত্তে লাগ্‌লো যে,—হে কৃষ্ণ! তোমা বিহনে আমাদের যা অবস্থা হ'বে তা তো তুমি জান, সে যা হবার তা হবে; তার জন্য তোমাকে আটক কর্ত্তে চাইনা; উপস্থিত তুমি একবার থামো, অন্ততঃ তোমার কাছে বিদায় গ্রহণের মত একটু অবসর দাও, তারপর তুমি যথাকর্ত্তব্য কোরো! এরা ত' এইরকম কান্নাকাটী ক'র্ত্তে লাগলো,

কৃষ্ণের কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপের কোনরকম চিহ্নও ফুটে উঠ্‌লো না, বরং সেই সময়েই অক্রূরকে রথ চালাবার আদেশ দিতে লাগলো— সময়াতিবাহিত না হয়।

এদিকে ব্রজাঙ্গনারা অনন্যোপায় হ'য়ে, কেউ ঘোড়ার বল্গা ধ'রতে গিয়ে, কেউ রথে উঠতে গিয়ে, নিষ্পিষ্ট হ'তে লাগ্‌লো! তাতেও কৃষ্ণের পাষাণ-হৃদয় ব্যথিত হওয়া দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও নড়্‌চড়্‌ হ'লনা,— মাত্র হয়তো মুখের দু'একটা লাল্‌-মাখানো কথা উপহার। এত হৃদয় দ্রবকারী ঘটনাতেও সে পাষাণের মতই নিশ্চল হ'য়ে রইলো, যেন কোন ঘটনাই তার সাম্‌নে সংঘটন হয়নি; বরং নিঃসম্পর্কিত দূত অক্রূরাদির মন চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগ্‌লো, তবুও সে পাষাণের মধ্যে কোন ভাব বৈলক্ষণ্যের উদ্রেকই দেখা গেলনা।

এখন বলত' ঐ কৃষ্ণ কতখানি অন্যায় আর সভ্যজন-বিগর্হিত কাজ ক'রেছিল, আমাদের সভ্যসমাজ কেউ তাকে ক্ষমা ক'রতে পারে কি? বোধ হয়—না, কেউই আমরা তা পারিনা। সেটা কেন বলি? না—আমরা কতকগুলি ভাবকে, যেমন,—স্নেহ, দয়া, মায়া, করুণা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্ষমা ইত্যাদি ইত্যাদি আর মন্দের দিক্ থেকে ঐরূপ আরো কতকগুলি ভাবকে আমরা চলৎ-চল্‌তি প্রথার ভিতর দিয়ে এসে, এমন ভাবেই ঐ ভাবসমষ্টির সঙ্গে নিজেদের ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে নিয়েছি যে, তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লেই ভালমন্দের স্বরূপ বিচার করবার অবকাশ থাকে না, অভ্যস্ত স্বভাবই প্রবল হ'য়ে একটা কিছু বেছে নেয়। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের ব্যাপারেও ঠিক্ তাই দাঁড়াচ্ছে যে, আমরা ভাল বল্‌তে পারিনা এই জন্যে যে, কেন সে আমাদের ধরা বাঁধা দাম দিয়ে ঐ ভাবগুলোর দাম ধরেনি! আমরা যখন সকলেই বেঁড়ে, সে ল্যাজ রাখলে কেন? এই

জন্যেই আমরা তার কার্য্যকে সমর্থন কর্ত্তে পারিনা তা সে যতই আর যত রকমেরই অজুহাত দেখাক্।

এদিকে শক্তের ভক্ত আবার সকলেই, কাজেই কৃষ্ণের বেলায় ও গুলোকে ধরা হ'লো "লীলা খেলা"! যেমন একই ডাকাতি রাজারাও করে, আবার ডাকাতেরাও করে; আমাদের কাছে সে দুটোর কত পার্থক্য!—একই খুন রাজাও করে আর আরএকজনও করে, কিন্তু অভ্যাসের গুণে তুমি আমি সে অত্যাচারকে কতটা পৃথক্ ক'রেই না দেখি! একই হত্যাকাণ্ডকে কখনও নৃশংসতার আলো দিয়ে দেখি, অন্যত্র সেই হত্যাকেই আবার বীরত্বের ছোপ ধরিয়ে নিয়ে কত বড়াই না ক'রে বেড়াই! তা হ'লে দেখা যাচ্চে, একই বিষয়ের মূল্য, ক্ষেত্র বিশেষে কতখানিই না তফাৎ হ'য়ে প'ড়চে! অতএব এর মধ্যে অনেকখানিই আবার নিজেদের মনগড়া ব্যাপারও আছে, তবে অভ্যাসের গুণে সেগুলো আমাদের চরিত্রগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে ঠিক্ ঠিক্ চিনে নেওয়া যায় না। যেমন একই ভালবাসা,—বাপ, মা, ভাই, বোন্, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোথাও ভক্তি, কোথাও প্রেম, কোথাও বাৎসল্য, আবার কোথাও বা প্রীতিরূপে দেখা দেয়, অথচ ও সবেরই মূল হ'চ্চে ঐ এক ভালবাসা-ভাব-অনুস্যূত। আর ঐ একই ভালবাসার যে বিভিন্ন প্রকার রূপ আমরা উপভোগ ক'রচি, সেটা যখন কাম-অনুস্যূত হ'য়ে কোন একটী পাত্রের উপর আরোপিত হয়, তখনই অন্য পাত্রগুলির ওপর যে ভালবাসা—তার ভাটা পড়্তে থাকে। এই গুলোই হ'চ্চে আমাদের গ'ড়ে নেওয়া,—কামের তৃপ্তির পর্য্যায় অনুসারে।

"ভাব" জিনিষটা হ'চ্চে অন্তরের বস্তু, যা নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাঙ্গা গড়া চ'লেছে। আর আমরা সাধারণতঃ যে সব ভাবগুলিকে নিয়ে

নাড়াচাড়া করি বা কচ্চি', সেগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ ভাবই হ'চ্চে আমাদের মুখস্থ করা, বা তাকে অভ্যাসগত ভাবও বলা যেতে পারে,—যা আমাদের অন্তঃস্থল স্পর্শ করার অবকাশ পায়না। ওগুলি সাধারণতঃ স্ফুরিত হ'য়ে থাকে—বাহ্য বস্তু বা বিষয়ের সংযোগ বিয়োগের ক্রম অনুসারে. এইরূপ বাহ্য বস্তু বা বিষয়জাত যে "ভাব" এই ভাবগুলিকে সাধারণ কথায় আমরা দক্ষিণাপথাবলম্বী ভাব বা কেন্দ্রাপসারী ভাব ব'লে আখ্যা দিয়ে নিতে পারি। আর ঐ বাহ্য বস্তু বা বিষয় সংগৃহীত হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মারফত; যথা,—জিহ্বার দ্বারা ষড়রস, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, আর ত্বক দ্বারা স্পর্শ মূলক ভাবের উদ্রেক হ'য়ে থাকে।

ঐরূপ বিষয় বা বস্তু, জাত হোক আর স্বতঃ উদ্‌বুদ্ধ হোক্, ঐ অভ্যস্ত ভাবের মধ্যেই আবার এমন কতকগুলি ভাব থাকে যে গুলিকে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য উত্তরপথাবলম্বী বা কেন্দ্রাভিসারী ভাব ব'লে আখ্যা দিয়ে নিতে পারি,—সাধারণতঃ যাকে আমরা মৌলিক ভাব ব'লে থাকি।

ঐ বিভিন্নপন্থি ভাবদ্বয়ের একটী হ'চ্চে ভাঙ্গার জন্য অপরটী হ'চ্চে গড়ার জন্য। কেন্দ্রাপসারী বুদ্ধির সাহায্যে যে ভাবগুলি কার্য্য করে, তাদের যতই গঠনোপযোগী ক'রে নিয়ে কার্য্যে লাগান যাক্ না কেন, আখেরে গিয়ে দেখা যাবে যে, যে দশে মিলে কাজ সুরু করা হ'য়েছিল, সেই দশই ছিন্নভিন্ন হ য়ে যে যার সে তার হ'য়ে গেছে, অর্থাৎ স্বার্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন। আর যে ভাবগুলি উত্তরপথাবলম্বী. সেগুলি ঐ ছিন্ন ভিন্ন অনুগুলিকে একত্রিত ক'রে কোন কিছুকে গ'ড়ে তুলেছে, অর্থাৎ পরার্থ বুদ্ধিসম্পন্ন।

এখন জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ বিষয় বা বস্তুর সংযোগ বিয়োগে ভাবের যে আনাগোনা চলে তার প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা না ক'রে,—ওদের মধ্যে যে কোন একটীকে আসরে নাবিয়ে দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে গেলেই, অন্ততঃ কতকটা আমরা ধারণা ক'রে নিতে পারবো, যে কিরূপে ওরা বাহিরে বাহিরে আনাগোনা করে। আবার কখনও বা বাহির থেকে অন্দরে প্রবেশ করে।

এ ক্ষেত্রে অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বাদ দিয়ে কাণকেই আসরে নামান সাব্যস্ত করা গেল, আমাদের পর্য্যবেক্ষণের লক্ষ্যস্থল ক'রে। কারণ ছেলেবেলায় গুরুমহাশয় কাণ ধরেই ভুল সংশোধন ক'রে দিতেন; তা ছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠদেরও যত আক্রোশ ছিল এই কাণের উপর, তা কারণে কে জানে, আর অকারণে কে জানে। আজকাল আর সেদিন কাল নেই, কাজেই পরের কাণের উপর আর নজর দেওয়া চল্‌বে না, আবার অন্যদিকে বর্ত্তমানকে টেনে নিয়ে গিয়ে অতীতে স্থাপন করাও চল্‌বে না, তারও ফল হয় উল্টো;—অথচ কাণকে যখন একান্ত দরকার প'ড়েছে, তখন যে যার সে তার কাণ ধরাই সাব্যস্ত করা গেল।

ধরা যাক্ আমরা কাণকে নিয়ে কোথাও থিয়েটার দেখতে—থুড়ি—শুন্‌তে গেছি, এখানে একটা অসুবিধা আমাদের ভোগ ক'রতে হবে যে, চোখ্ থাক্‌তে কাণা সাজতে হবে, অর্থাৎ চোখ মারফৎ যে সব হাব ভাব ও দৃশ্য দেখে, আমাদের যা যা ভাবের বিকাশ হয় সেগুলিকে আমোল দেওয়া চলবে না; তবে লুকিয়ে চুরিয়ে মিট্ মিট্ ক'রে দেখে নিতে কোন দোষ নেই।

যা হোক্, রঙ্গমঞ্চে কে এলো গেলো তা আর দেখা হ'ল না, তবে অভিনয়ের আগাগোড়া শ্রবণ-বিবর দিয়া যা মরমে পশিল,—তাতে মাঝে

মাঝে কখনও হাস্যরসের, কখনো প্রেমের, কখনো ভক্তির, কখনো বা বীররসের ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকমের ভাব উথ্‌লে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে প্রবেশ ক'রে তার দু'কূল ছাপিয়ে যেতে লাগলো, কখনো হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হাস্যরোলের মধ্যে দিয়ে, কখনও দরবিগলিত ধারার মধ্যে দিয়ে, কখনো—সাবাস্ বীর, কখনও কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, এই রকম সব ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে হঠাৎ এক সময় আমাদের যবনিকার পারে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল।

মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তোমার আমার বা তার ভিতর যে ভাবগুলি খেলে গেল, যার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে, তুমিও জান মিছে, আমিও জানি মিছে, আর যারা অভিনয় ক'ল্লে—তারাও জানে যে তাদেরটাও মিছে; অথচ এতগুলো মিছেতে মিলে,—তোমার আমার উপর এতক্ষণ যাবৎ আধিপত্য খাটিয়ে নিলে কি ক'রে? কি ক'রে অবাস্তবে বাস্তবের আধ্যাস এনে আমাদের বিহ্বল ক'রে তুলেছিল? কৈ এখন ত আর তেমনটী কিছু হ'চ্চে না? মাত্র তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু যা প'ড়ে আছে। কেন এমন হ'লো?

কেউ হয়ত' বল্‌বেন, বাক্যবিন্যাসের কুশলতাই এর মূল কারণ! কিন্তু তা যে নয়, সেটা আমরা দু'একটা ব্যাপার লক্ষ্য ক'রলেই বেশ বুঝতে পারি। যেমন ধরা যাক্, আমরা সেদিন থিয়েটারে যে পালা শুনে এলুম, সেই পালাই হয়তো সেই সব লোকেরাই আর এক আসরে গাওনাকি ক'রলে,—সবই সেই, অথচ তেমনটী আর জম্‌লো না। ঐ একই পালা, ছায়া চিত্রে দেখা গেল, সেখানে দৃশ্য দেখিয়ে ভাবান্তর কতকটা জাগিয়ে তুল্লে বটে, কিন্তু এখানেও আর সেরূপ মরমে পশিল না; এখানে যাওবা কতকটা টানা-হেঁচড়ার মতই ভাবের আনাগোনা টের পাওয়া

গিয়েছিল ;—'কলের গানে' যখন সেই একই পালা, বাক্যবিন্যাসের সমগ্র মাধুর্য্যটুকু নিছক্ নকল ক'রে গেয়ে গেল,—তা শুনে মোটেই আর ভাবের উন্মেষই হ'ল না।

তা হ'লে বাক্যই যে আমাদের ভাবোন্মেষের সবটুকু কারণ নয়, তা বেশ বোঝা গেল ; আর বাক্যই যদি ভাবের মূল কারণ হ'ত, তা হ'লে যে কোন "ভাষা ভাষীর" ভাষা বুঝতে পরস্পরে আটকাতো না, বা সব ভাষাই এক হ'ত। অথচ যাদের ভাষার বিন্দু-বিসর্গ ও বুঝিনা, বা যাদের ভাষাই নেই, বা ভাষা দিয়ে বোঝাবার ক্ষমতাও নেই—তাদের হাসি, কান্না, রাগ, দ্বেষাদি ভাবগুলো মাত্র অব্যক্ত শব্দের মারফতই বুঝে নিতে পারি (চেষ্টা ক'রলে হয়ত' অনেক কিছুই বোঝা যেতে পারে) কি ক'রে ? তাই ভাষা, ভাব প্রকাশের সুশাণিত অস্ত্র হ'লেও মূল কারণ নয়। আর তাই যদি হ'ত, একই কথা একটু নরম গরম ক'রে বলার দরুণ বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হ'ত না।

তারপর ঐ নাটকের মধ্যেই দেখা যায় যে, এমন অনেক অভিনেতা থাকে, যারা বাস্তবকে অবিকল নকল ক'রে নিয়ে ছবি আঁকতে পারে! তাতে কিন্তু যতটা ভাবের উন্মেষ না হয়, কিন্তু হঠাৎ একদিন একজন নগণ্য অভিনেতায় (যে তখনও নকল কর্ত্তে ঠিক শেখেনি) অভিনয় কর্ত্তে কর্ত্তে তার মধ্যে ভাবাবেশ হ'ল! তখন সেই তার অভিনয় নকলকে ছাপিয়ে গিয়ে দর্শকের প্রাণটুকুকে নিয়ে টানা টানি কর্ত্তে থাকে, আর সেই অবসরে অপরাপর জাঁহাবাজ অভিনেতাদেরও সেই স্রোতে টেনে নিয়ে গিয়ে, সমগ্র অভিনয়টাকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলে।

মোটের মাথায় শেষে আমরা দেখতে পাই, "ভাষা" ভাবকে অনুসরণ ক'রে চলে। অতএব যারা ভাষার মারফত আসল কিছু পেতে চায়,

তারা যদি ভাষা নিয়ে তূলো ধোনার মতই ধুনে ফেলে তা হলেও কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই। তবে ভাষার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যে সব ভাবের দল উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে, তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি ওদের যে কোন একটীকে নিজস্ব ক'রে নিতে পারে (তা সে ভাবের বিষয়টী আমাদের হিসাবে যত ভাল আর যত মন্দই হোক্ না কেন?) আর তার অনুশীলনে তন্ময়ত্ব এসে যায়, তা হ'লেই তার কেল্লা ফতে, সে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছুবেই; আর সঙ্গেও নেবে অনেককে, যারা হয়ত' আমাদেরই দৃষ্টিতে অন্তজ হ'য়ে প'ড়েছিল।

এখন ঐ থিয়েটার দেখতে গিয়ে বা আমাদের দৈনন্দিন থিয়েটার থেকে যে সব ভাবগুলি আমাদের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বিদ্যুৎ হানার মত ছুটে চলে যেতে থাকে তার মধ্যে থেকে যদি কোন একটী কারো মধ্যে ধরা পড়ে যায়, সেইটী হ'ল কেন্দ্রাভিসারী ভাব আর বাকিগুলি কেন্দ্রাপসারী;—অর্থাৎ যে ভাবগুলি অভ্যস্ত ভাবের চাপে মাথা তোলবার অবসর না পেয়ে দিগন্তে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সে যাই হোক্, আসলে ভাব বস্তুটী যে কি—তা এখনও আমাদের জানা হয়নি; তার রূপের ব্যাখ্যাতেই এতটা সময় গেল। আমরা থিয়েটার শুন্‌তে গিয়ে যে সব ভাব গ্রহণ ক'রেছিলাম সেগুলি যে আমাদের মর্ম্মস্পর্শ ক'রেছিল স্পান্দনিক স্রোতের আকারে; তার আর সন্দেহ কি? অতএব যে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফতই কোন ভাবের উন্মেষ হ'তে দেখি সেগুলিও ঐ স্পান্দনিক-ক্রম হিসাবেই আসে। অবশ্য যারা যেভাবে ভাবে ভাবুক, আমরা উপস্থিত যা পাচ্চি তা থেকে এইটুকুই ধারণা ক'রে নেওয়া যায় যে স্পান্দনিক ক্রমই হ'চ্চে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের মূল কারণ। তা সে অভিনেতার মারফতই হোক্ আর যন্ত্র সাহায্যেই হোক্ কিম্বা

কোন মানব-যন্ত্রের একাগ্রতার অবকাশে স্বতঃই স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক, যখনই ঠিক্ ঠিক্ ভাবজ্ঞাপক স্পন্দন-ক্রমটী একটা ধারাবাহিক গতি নিয়ে চ'লতে থাকে, স্বতঃই তা থেকে একটা রূপেরও স্ফূরণ হয়।

আর স্পান্দনিক ক্রমদ্বারাই যে ভাবের স্ফুরণ হয় তার কতকটা প্রমাণ আমরা বাদ্য যন্ত্রাদি থেকেও বুঝতে পারি। কোন একটী সুরের যন্ত্র, যে মোটেই কথার ধার ধারেনা, তার হয়ত সম্বল মাত্র সাতটী পর্দা ; যখন সেই সাতটি পর্দা কোন একটী বিশিষ্ট গতিকে অনুসরণ না ক'রে যে যার পৃথক্ পৃথক্ নিজস্ব সুরে বাজতে থাকে তখন তা থেকে তোমার আমার মনে কোন একটা ভাবের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরদাই, যখনই কোন ভাবুকের হাতে প'ড়ে ভাবানুমোদিত গুরু লঘু আঘাতজনিত স্পন্দনরূপ গুঞ্জন তুলে, পরদা কয়টী পরস্পর সুর বিনিময় দ্বারা ধারাবাহিক গতিতে চ'লতে থাকে, তখন আর সাতের কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না ; অথচ ঐ সাতে জমাট বেঁধে কত অজানা ভাবকেই না জাগিয়ে তোলে, কত অপূর্ব্ব রাগেরই না সৃষ্টি করে ; এমন কি অত ক্রুর, অত খল যে সর্প সেও আত্মহারা হ'য়ে যায়। যন্ত্রের কোন ভাষা না থাক্‌লেও, শুধু ঐ স্পন্দন-স্রোত তোমার আমার মধ্যে কত অজানা ভাবেরই না পরশ এনে দেয় ; পরদা থাকে সেই সাতটীই, অথচ বিনিময় কৌশলে কত ভাষাহীন ভাবের পরশ এনে দেয়। তবে ঐ সাতটিকে যদি কেউ একই সঙ্গে বাজাবার মতলব করে, তবে তার যা অভিব্যক্তি হবে, তা আর এ যুগে কাউকে ব্যাখ্যা ক'রে বলবার দরকার নেই, কারণ সেটা ত' হ'ল আজকালকার যুগের যুগভাব।

যে কোন ভাবই হোক্, অভাবই হোক্, সবই সেই স্পন্দনের ক্রমান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ স্পন্দন-স্রোত যে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফত

তোমার আমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে যেমন আমাদের অভিভূত ক'রে ফেলে, আবার সেই মুহূর্ত্তেই তোমার আমার কেন্দ্র থেকে আর একটী স্রোত স্বতঃই উৎপন্ন হ'য়ে ছুটে যায় প্রয়োগকারীর দিকে, তাকে জানাতে যে, প্রয়োগকারীকে তুমি কি ভাবে গ্রহণ ক'রেছ,—তা সে শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই হো'ক আর নিঃশব্দেই হোক্। তাই আমরা কখনও শব্দপ্রয়োগ দ্বারা আর কখনও বা শুধু ঐকান্তিকতার মারফত স্পন্দন-স্রোতকে অপর কেন্দ্রে প্রেরণ ক'রে, ভাব দৃঢ়তার পর্য্যায় অনুযায়ী অপরকে অভিভূত ক'রে ফেলতে পারি বা নিজেও হ'তে পারি ও তার প্রতিদান বা প্রতিগ্রহের জন্য দায়ী হ'য়ে থাকি। তাই সাধারণতঃ আমরা দেখ্তে পাই, যে কেউ হয়তো কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে একাদিক্রমে ঐকান্তিকতার সহিত চিন্তা করার ফলে, ভাব যখন জমাট বেঁধে ওঠে, তখন সে সেই স্পন্দন স্রোতকে ইচ্ছামত্ প্রয়োগ বা নিয়োগ দ্বারা বিষয়টীকে মূর্ত্ত ক'রে তোলারও সামর্থ্য পায় বা অপরের গ্রাহ্যনীয় হয়।

এখন ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমাদি উপাদানগুলিকে দেখেছি বহির্জ্জগতের উপাদান হিসাবে, তেমনি সৃষ্টির কারণ স্বরূপ,—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি সূক্ষ্মতর উপাদানগুলিকে যা দেখে এসেছি, তারাও ঐ ভাবের ফাঁদে ধরা প'ড়ে আজ তাদেরও কর্ম্মকে বরণ ক'রে নিতে হ'য়েছে অন্তর্জ্জগতকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে। অতএব "অহং" ও "ক্ষিতি"নামক প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শুধু ঐ উপাদানগুলি ব'লে নয়, তন্মধ্যস্থ ভাব, অভাবজাত যত কিছু ভাব, ঐ সবেরই মূল হ'চ্চে স্পান্দনিকক্রমের ইতরবিশেষ।

হয়ত' প্রশ্ন হ'বে, একই স্পন্দনের তারতম্যেই যদি এত কিছু, তা হ'লে এত বৈষম্যতা কেন? তার উত্তর হ'চ্চে যে স্রোত থাকলেই তার

বিষমতা আছে, শুধু যে জলস্রোতেই ঢেউ ওঠে তা নয়, সে আগুনে, বাতাসে, আকাশে, ভাবে, অভাবে, এককথায় সবেতেই ঢেউ ওঠে ; অত কথা কি, যে স্পন্দনটীকে মূল কারণ ব'লে এখন ধরা হ'চ্চে,—তাতেই ঢেউ উঠে র'য়েছে। আর তাতে ঢেউ আছে ব'লেই, তদ্‌জাত সব কিছুরই গতি ঐ ঢেউয়ের অনুকরণে হ'য়ে থাকে। তা সে তোমার আমার গতিভঙ্গিও তা থেকে বাদ পড়ে না।

সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউয়ে, কোন পার্থক্য না থাক্‌লেও আমরা অভ্যাসের দোষে সমুদ্রের তীরে গিয়ে যেমন ঢেউই গুণতে থাকি, আর ভয়ে ভয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করি, পাছে সে হঠাৎ লাফিয়ে এসে, যেন না আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় ;—আর সেই আতঙ্কে, কি সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, কি তার অপরিসীমত্ব, কি তার মহান সৌন্দর্য্য, কিছুই আর দেখার সাধ থাকে না, ঢেউ গুণেই কোন রকমে পালিয়ে বাঁচি—এখানেও আমাদের ঠিক্ সেই দশা। ভবের ঢেউ গুণছি আর তার হিসাব নিকাশ ক'রে বড়াই ক'রে বেড়াচ্চি যে, এই ত' সমুদ্র দেখে এলাম, এমন কি তার বাহাদুরী, তার তীরের বাসিন্দাদের ছোট ছোট ছেলেগুলোও হেলায় সাঁতরে বেড়াচ্চে ওটা অভ্যাস ক'রলেই হয়। বলি ভায়া হে! অভ্যাস ক'রলেই যে হয় তাতো সকলেই জানে, কিন্তু ঐ কিনারায় নেমে, ঢেউ দেখে "দে পিট্টান" ব্যবস্থা করলে কোন দিন কি অভ্যাস হবে ?

তবে হ্যাঁ, সকলেই যে আমাদের মত বীরপুরুষ, তা নয়। অমন নষ্ট ছেলেও অনেক আছে, যারা "কুছ্ পরোয়া নেই" ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রের বুকে। তখন তারা বুঝতে পারে যে, খানা ডোবায় সাঁতরাবার চেয়ে অথৈ জলে সাঁতার দেওয়া কত সহজ, কত মনোমদ, আর কত

মহীয়সী-গাথা-সমন্বিত। তারাই ঐ অথৈ জলের ঢেউয়ের স্বরূপ কি, তা ঠিক্ ঠিক্ জানে বা বোঝে। তারাই খবর রাখে যে, দুটো ঢেউয়ের মাঝে, একটা খালপড়া অবস্থার উদ্ভব হয়, যার ওপর ভিত্তি ক'রে ঢেউগুলো ঠেলে ওঠে উপরের দিকে, তারপরেই আবার তার নেমে যাওয়ার পালা সুরু হয় ঐ খালপড়া অবস্থা প্রাপ্তির জন্য, অন্য একটী ঢেউকে গ'ড়ে তোলবার জন্য,—কামনারূপ বায়ুর সাহায্যে। এই হ'ল ঢেউযের গতির চিরন্তন স্বভাব। আর ঐ একই ঢেউয়ের দু'পিঠে দু' রকমের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকাতেই বিষমতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। তাই সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ একই বস্তু হ'লেও, ঢেউগুলোই আগের ভাগে আমাদের চোখে পড়ে, যা দেখে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

তারপর পুরুযোত্তমে এসে, সমুদ্রের ঢেউ খাওয়া যখন একটা প্রথা আবহমানকাল থেকে চ'লে আস্‌চে, তখন নাচার হ'য়ে সকলকেই একবার যেতে হয় ঢেউ খেতে; তার মধ্যে যারা থাকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও অনভিজ্ঞ, ঢেউ তাদের নিয়ে কত নাচনই না নাচায়, তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অপরকে ব'লে বোঝান চলে না। তা ছাড়া আরও একটা আতঙ্কের কথা, ঐ সব সন্ত্রস্ত স্নানার্থীদের মধ্যে কারোরি' হয়ত জানা থাকে না যে ঐ অচলায়তন ঢেউগুলো বেলা ভূমিতে এসে আছড়ে পড়ার পর আবার তারা লোকচক্ষুর অন্তরাল দিয়ে (অন্তঃশীলা) ফিরে যায় তাদের অনন্ত আবাসে। সেই টানে যারা পড়ে, তাদের খেলা হ'য়ে যায় সাঙ্গ। তখন সেই "শব"টাকে সমুদ্র আর নিতে চায় না তার অনন্ত আবাসে,—ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় ঐ তীরগামী ঢেউয়ের মুখে, বেলাভূমিতে ফেলে দিয়ে আসবার জন্যে।

এদিকে ধর, পৃথিবী যেমন তার পোষ্যবর্গ,—ভূচর, খেচর, জলচর ও

উদ্ভিদাদিকে একই ক্ষীরধারা প্রত্যেকটীকে সরবরাহ ক'রে থাকে, অথচ প্রত্যেক জাতীয় জীব ও উদ্ভিদ, জগতে প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষলতাদি, যে যার স্বভাব অনুযায়ী, অম্ল, মধুর, কটু, তিক্ত ও কষায়াদি যে যার বিভিন্ন রকমের রস সংগ্রহ ক'রে নেয় তার নিজের জন্য, ঐ একই ক্ষীরধারার মধ্যে থেকে—তেম্নি ঐ স্পন্দনও যে যেভাবের অনুধ্যায়ী, তার কাছে মাত্র ততটুকুই ধরা দেয়। তবে, কথা হচ্চে কি ? এই এত যে বৈষম্য, এর মধ্যেও একটা যে মিলনসূত্র আছে, সেইটেকে খুঁজে বার করাই হ'চ্চে কাজ। ততটা এগুতে না পারলেও যে ঐক্যতানিক অভিব্যক্তিটুকু র'য়েছে, কারণ সবেরই মূলে যখন ঐ সাতটী পর্দ্দাই সম্বল, সুরজ্ঞেরা যে সূত্রটুকু ধ'রে বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন সুরের যন্ত্রকে, তাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব সুরকে বজায় রেখেও ঐক্যতানের অভিনবত্ব দ্বারা শ্রোতাদের বিমোহিত ক'রে তোলে, আর তখন সেই যন্ত্রগুলির মধ্যে কোনটীকেই ছোট বড় ব'লে নির্দ্দেশ করা যায় না, বরং বাদ দিলে অঙ্গহানি হয়; তেম্নি স্পান্দনিক বিশেষজ্ঞেরা কোনটাতেই নিজে অভিভূত না হ'য়ে, প্রত্যেকটীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জাগতিক ঐক্যতানকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকেন। এ সব ব্যাপারে যারা সম্যকদর্শী নন—তাঁদের উচিত হয় না ঐক্যতানিক ব্যাপারে নিজেদের পুরোভাগে স্থাপন ক'রে ব্যাপারটাকে হাস্যকর ক'রে তোলা। তার ফলে হয় কি ? যিনি প্রত্যেক যন্ত্রটীর 'জান'এর খবর রাখেন না, অথচ সব কয়টীকে একই "গ্রাম"এ বাঁধতে চান, যার ফলে অর্থাৎ বাঁধতে গিয়ে অনেক যন্ত্রই যায় বিকল হ'য়ে, আর যেগুলি প্রভুর মান রাখতে কোন রকমে সুরবাঁধার সময় অবধি টিঁকেছিল, কাজের সময় তারা কেউ হয়তো বেসুরো বলে আর না হয় অর্দ্ধপথেই তার পরিসমাপ্তি হয়। আহা!—যে বেচারারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

রোজগারের পয়সা দু' একটী ক'রে জমিয়ে যন্ত্রটী নিজস্ব ক'রে নিয়েছিল তাদের তখন কতখানি মনোবেদনা পেতে হয়।

ঐ ঐক্যতানিক্ দলের যন্ত্রীরা সকলেই সুরের সাধক হ'তে পারে, তবে তাদের অভিজ্ঞতা ঐ বাঁধা-ধরা সাতটী পরদায়। তদূর্দ্ধে কারো বা অর্দ্ধান্তর পর্য্যন্তই সমাপ্তি। কিন্তু যারা বিশেষজ্ঞ তাদের ঐ বাঁধা-ধরা পর্দ্দা কয়টী ছাড়াও, অতি-কোমল পরদাগুলিরও সন্ধান জান্‌তে হয়, তা ছাড়াও তাদের জান্‌তে হয় ঐ দু'টো ঢেউয়ের মধ্যে যে খালপড়া অবস্থা তার সন্ধান,—যাকে ওরা "লয়" ব'লে, অর্থাৎ যা দিয়ে সুরের গতিকে এলোমেলো ভাবে চল্‌তে না দিয়ে সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে, এ তারি ব্যবস্থা।

তরঙ্গায়িত স্পান্দনিক স্রোতের মধ্যে থেকে যে অতি সূক্ষ্ম লয়যুক্ত শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হ'য়ে নিরবচ্ছিন্ন সুরের মত শ্রুত হ'তে থাকে, সুর সাধকেরা তারি উপর ভিত্তি ক'রে, সুরের পরিকল্পনা বা ভাবসাধনা ক'রে থাকেন, তাই তাঁরা সুরকে "সুরব্রহ্ম" ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। অবশ্য আজকালকার দিনে প্রকৃত ভাবসাধকদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না; না গেলেও তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ঐ সুরব্রহ্মই হ'চ্চে বেদান্তের স্পন্দন গর্ভ প্রণব বা "ওঁ"কার, তার কোন ভুল নেই। ঐ সুরব্রহ্মের বা ওঁকারের —মাত্র শব্দরূপটা আমরা কতকটা আন্দাজ ক'রে নিতে পারি আজকাল-কার রেডিও (RADIO) যন্ত্রের মারফৎ। রেডিওতে অনুক্ষণ সানাইয়ের 'পোঁ' ধরার মত যে মৃদু ভ্রমর-গুঞ্জনের মত একটা শব্দ শোনা যায়, সেটা ঐ ওঁকার বা সুরব্রহ্মের গুঞ্জনধ্বনির কতকটা অনুরূপ (আর বস্তুতই ওটা সূক্ষ্ম বায়ুস্তর বা সমবায়ুস্তর থেকে উত্থিত হ'য়ে থাকে)। রেডিওতে যে গুঞ্জন শব্দটুকু আমরা পাই, তার চেয়েও সূক্ষ্মতর একটা গুঞ্জন

শব্দ আমরা যে যার নিজ নিজ কেন্দ্রেই শুনে নিতে পারি,—কাণকে চেপে ধ'রে বাহিরের শব্দতরঙ্গকে আটক্ ক'রলেই কতকটা সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ঐ শব্দকে অনুসরণ ক'রে গেলে (দু'চার দিন অভ্যাসের পর) পরে ঐ মোটা গুঞ্জনটার মধ্যেই (ঐ মোটা গুঞ্জনটা হ'চ্চে রেডিওর গুঞ্জনের চেয়ে আর একটু সূক্ষ্ম ; অতএব যারা বিনা তারে পার্থিব ভাবের আদান-প্রদান চালাতে চায়, তারা কিছুদিন যাবৎ অভ্যাস ক'রে, যে যার নিজের নিজের বেতার কেন্দ্রটীকে ঝালিয়ে নিলেই পারে, যা আমরা কথার মারফৎ সদা-সর্ব্বদাই ক'রে আস্‌চি, এ তারি সূক্ষ্মতর অবস্থা মাত্র) আর একটা মধুরতর গুঞ্জনের সন্ধান পাওয়া যায় সেইটীই হ'চ্চে ওঁকারের বা প্রণবের ধ্বনি—যা একবার শ্রুত হ'লে পর মানুষের মন অনুক্ষণ সেই দিকেই ধাওয়া কর্ত্তে থাকে—অভূতপূর্ব্ব বিশ্রামের আশায়। তবে কথা হ'চ্চে কি,—বিষয়জ্ঞান নিয়ে ওকে ঠিক্ ঠিক্ ধরা যায় না। ওইটুকু জানার পর, যে ওরই পায়ে নিজেকে বিলিয়ে না দেয় সেই হয় মানবত্বের অধিকারী—ভাব সাধনার দিক্ দিয়ে। কর্ম্মীরাও ঐখানে গিয়ে পৌঁছায় আরো আগে, বিজ্ঞানের সাহায্যে, এই মাত্র তফাৎ।

ঐ স্পন্দনগর্ভ অবস্থাই হ'চ্চে বৈচিত্র্যময় জগতের মূল কারণ, আর ঐ বিশিষ্ট অবস্থায় যাঁরা বিশেষজ্ঞ হ'তেন, তাঁদেরই বৈজ্ঞানিক ব'লে অভিহিত করা হ'ত। ঐ বিশিষ্ট অবস্থাই যেমন ছিল বৈজ্ঞানিকের 'বিজ্ঞান', ভাব সাধকের 'ভাব', সুরজ্ঞের 'সুর', বস্তু-তান্ত্রিকের 'বস্তু', ইত্যাদি ইত্যাদি এক কথায় সবেরই মূলতত্ত্ব সেই একই সুরে বাঁধা যন্ত্রের মত, কোন একটীতে ঝঙ্কার উঠ্‌লে যেমন অন্যগুলিও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ঠিক সেই আইনেই আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাব বা কথা নিতে দিতে পারি। বস্তুতান্ত্রিকের বেতার-যন্ত্রে যে সঙ্কেতের আনাগোনা, সেও ঐ একই

আইনে হ'য়ে থাকে ; তবে তার সম্বল হ'চ্চে মাত্র বায়ুস্তরস্থিত মোটা স্পন্দনটুকু নিয়ে। তবে এ কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঐ যে স্পন্দনগর্ভ বা সবেরই মূল সূত্রটী, ওটী কিন্তু এক মানবরূপ বেতার যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ধরার সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না, তাও আবার 'অভ্যস্ত' ঝড়-ঝাপ্‌টার হাত এড়াতে পারলে তখনই সম্ভব। তবে একবার সন্ধান পেলে, হাওয়া প্রাণ আমাদের হাওয়াকে ভুল হ'তে পারে, তবু সে অপরূপের রূপের মোহ তখন এড়ান যায় না ! !

এই স্পান্দনিক ব্যাপার নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে হয়ত অনেক মতদ্বৈধতা থাকতে পারে, বিশেষ ক'রে আকাশতত্ত্ব থেকে অহংতত্ত্ব অবধি—যে সব স্পন্দন ক্রমকে যন্ত্র সাহায্যে ঠিক্ ঠিক্ ধরা যেতে পারেনা ব'লেই মনে হয় ; কারণ সেগুলি মাত্র ভাব-মূলক স্পন্দন,—জড় রূপ তখনও তাদের ফোটেনি ব'লেই জড়-যন্ত্রের সাহায্যে ধরা সম্ভবপর হবে কিনা ?—একটা সন্দেহ জেগে ওঠে। কারণ মনের সংকল্প ও বিকল্পের পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আদি-ভূত আকাশের যে সঙ্কোচন ও বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে তাকে অঙ্ক-শাস্ত্র মারফৎ না পাকৃড়াও করা পর্য্যন্ত কতদূর কি হবে না হবে বলা যায় না।

সে যাই হোক্, যন্ত্র সাহায্যে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক,—তা নিয়ে কথা হ'চ্চে না বা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবারও কিছু নেই, বরং তাঁদের নির্দ্দেশই সকলের আগে মেনে নেওয়া দরকার, কারণ তাঁরাই হ'চ্চেন এ যুগের দ্রষ্টা-পুরুষ ; তা ছাড়া আরও একটা কথা, বিজ্ঞানকে এগুতে হ'লে কোন ভেদ-বুদ্ধি না রেখে, বা কারো মুখে ঝাল না খেয়ে তার নিজস্ব রাস্তাতেই এগোনা ভাল, তা হ'লে

একদিন না একদিন মানবরূপ বেতার-যন্ত্রে আসল খবর ধরা দেবেই দেবে। তবে একথাও ঠিক্, বিজ্ঞান যতটা এগিয়ে এসে থম্‌কে গেছে, তারপর যাঁরা এগিয়ে যেতে চান, তাঁদের মধ্যে কোনরূপ দৈন্যতা, কোন রকম ভেদাভেদ, কোনরূপ মাৎসর্য্য ইত্যাদি থাক্‌তে আর কেউ যে ধরা দেবে ব'লে মনে হয় না, কারণ অতীব দৃঢ়চেতা বিশ্বামিত্রের বহুতপস্যাসঞ্চিত "পদার্থ বিজ্ঞান" মাত্র ক্ষণিকের ক্রোধের স্ফুরণ হওয়াতেই অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছিল, তা এ গল্পই হোক্ আর যাই হোক্, কার্য্যতঃ কিন্তু ওইটাই যে ঘট্‌বে তার আর সন্দেহ নেই।

হয়ত অনেকের মতে এতদূর পর্য্যন্ত আমরা যা কিছু আলোচনা ক'রে এসেছি, সেগুলিকে ইংরাজীতে যাকে "Phylosophy" বলে তাই ভেবে নেবেন, কিন্তু "দর্শন" বল্‌তে ঠিক্ তা নয়, কারণ দর্শন মানেই হ'চ্চে যা প্রত্যক্ষ করা হ'য়েছে তাই; আজকাল যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি, তারি নাম ছিল দর্শন, শুধু বিচার-বিবেচনার বস্তু নয়। আর আমরা যাদের বৈজ্ঞানিক বলি ঐ সব দার্শনিকরা ছিলেন তখনকার দিনের সেই বৈজ্ঞানিক, যাদের আমরা ঋষি বলি। তারপর যাঁরা পদার্থ-বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে উঠে ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পেতেন তাঁদের আর দার্শনিক ব'লতো না "ব্রাহ্মণ" বলা হ'ত, অবশ্য জাতব্রাহ্মণ নয়। অতএব আমরা যা নিয়ে আলোচনা ক'রে এসেছি, সে সবটাই হ'চ্চে তখনকার দিনের বিজ্ঞান। তবে ইংরাজিতে Phylosophy ব'লতে কি বোঝায় সেটা ভাষাবিদ্‌রা ব'লে দিতে পারেন।

এত যে আমাদের মাথা ব্যথা, সেটা আর কারো জন্যে হোক্ আর নাই হোক্, অন্তত যারা মানববাহিনীর পরিচালনার ভার হাতে নিয়ে জঙ্গল কেটে চ'লেছেন, যদি কোনদিক্ থেকে তাদের কোন সুবিধা হয়

এইটাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য; তারপর যে যা ভাবে ভাবুক, তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

মানবত্বের ব্যাখ্যা কর্ত্তে গিয়ে আমরা যা যা পেয়েছি, তার কতকগুলি বিষয় সংগৃহীত হ'য়েছে সেকালের সাহিত্যিকদের অনুগ্রহে, আর কতকগুলি হ'চ্চে, একালের সাহিত্যিক আর সাংবাদিকদের সৌজন্যে। সেকাল নিয়ে যা বা যতটুকু বলা হ'য়েছে সেইটুকুই যথেষ্ট, তার বেশী হয়ত' ধাতে সইবে না; আর একালের আমাদের যা আছে না আছে, সে ত আমরা নিজেরাই জানি, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে আর লাভ কি? তবে একালের মানবগোষ্ঠীর সাধারণ স্বাস্থ্য হিসাবে যতটুকু খবরাখবর পাওয়া যাচ্চে, বা যার জন্য আজ আমরা সেকাল, একাল নিয়ে সমালোচনা কর্ত্তে ব'সেছি, সব দেখে শুনে যা মনে হয়, যে আমাদের মানবের গোষ্ঠীকে গোষ্ঠীটাই আজ রোগগ্রস্ত,—তা কেউ অতিভোজনের দোষে, কেউ হয়ত' অনাহারের দরুণ, কেউ বা অনাচার অত্যাচারের দায়ে,—কারো হ'য়েছে ক্ষয়, কারো বা বিকার, কারো পক্ষাঘাত,—এই রকম নানা রোগ, যার নাম গুণে শেষ করা যায় না; তার ওপর দিনকে দিন নতুনের আমদানি, —সেত' বিরাম-হীন গতিতে বেড়েই চ'লেছে।

কথায় বলে "যার বে' তার মনে নেই, পাড়া পড়সির ঘুম নেই" হঠাৎ একদিন দেখা গেল, যে প্রবচনটা সত্যে পরিণত হ'য়েচে;—অর্থাৎ যাদের রোগ-নাড়া, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রলে তারা বলে, বেশ ভালই আছি— সুখেই আছি—কষ্ট যাকিছু শুধু অন্ন-বস্ত্রের। এদিকে কিন্তু একজনকে দেখা গেল, এই সব আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থা দেখে, তিনি হাপুস্-নয়নে কেঁদেই সারা, বলে—কিসে এদের রোগ শান্তি হ'বে? আসলে কিন্তু বোঝা গেলনা যে, রোগটা সত্যি কার?—তার আত্মীয় স্বজনদের, না

তার নিজের ? অতগুলো লোকের না তার নিজের অবস্থা তাই ? তা ছাড়া, শোনা যাচ্ছে যে, আজকাল নাকি কাঁদুনে-গ্যাসের চোরাগোপ্তা ব্যবসাও চলেছে। অতএব অবস্থার প্রগতি যে কোন্ দিকে তা ঠিক্ বোঝা গেলনা।

যাই হোক্, ঐ ভাল'র নেশাখোর মানুষটীর অবস্থা দেখে মনে হ'ল যে, 'সয়তান' যেমন মন্দের প্রতিভূ হ'য়ে মানুষকে দিয়ে যা তা করিয়ে নেয়, তেম্‌নি তার সতাতো ভাই 'বিবেক'ও সে বিষয়ে বড় কম যান না; তিনিও ভাল'র প্রতিভূ হ'য়ে মানুষকে ততোধিক নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান।

যে জন্যেই হোক্, বিবেকের পাল্লায় প'ড়ে ও ব্যাচারা ত' অনেক খোঁজ খবর, চেষ্টা-চরিত্র কর্ত্তে লাগল'—যদি কোন একজন পাশকরা চিকিৎসক কেউ দয়া পরবশ হ'য়ে চিকিৎসার ভারটা নেয়। অবশেষে তার জ্ঞান হ'ল যে, সকলেই যে শয়তানের সতাতো ভা'য়ের তাঁবেদার তা মোটেই নয়, এমন কি পরামর্শ নিতে গেলেও ট্যাঁকে থাকা চাই পয়সা, তবে তারা চেয়ে দেখ্‌বে। নিজের ট্যাঁকের খোঁজ-খবর নিয়ে যখন দেখ্‌লে যে, রাধাকে নাচাবার সম্ভাবনা মূলেই নেই, কারণ সাতমণ তেল সংগ্রহ করা তার জীবন-ভোর প্রচেষ্টাতেও কোনদিন সফল হবে না, তখন অগত্যা হাতুড়ের খোঁজ-খবর কর্ত্তে লাগলো, তাও তার ট্যাঁকের কাছে দরবারে বাতিল হ'য়ে গেল। অবশেষে হতাশ হ'য়ে ঘুরতে ঘুর্‌তে পড়্ ত' পড়্ এক নাগার পাল্লায়, সেও তাকে প্রাণ ভ'রে তত্ত্ব কথা শুনিয়ে দিলে। তখন ও ব্যাচারা অর্থাৎ বিবেকের চেলা গেছে খেপে, সে তখন আর আত্মসম্বরণ কর্ত্তে না পেরে নাগার কুলের খবর গাইতে লাগ্‌ল, শেষটা উপসংহারে যখন চেপে ধরলে, বল্লে—বলি নাগা ঠাকুর, সবটাই যদি তাঁর

ইচ্ছে ব'লেই জান, তবে ওহে খোদাই খিদমৎগার, তখন আমার কথাটাকে উপেক্ষা ক'রে নিজের ইচ্ছে জাহির করচো কেন? ধর, আমি এখন তোমার সেই তাঁর "প্রতিভূ", এ তাঁর ইচ্ছা, মাত্র আমার মারফৎ পাচ্চো, তা না হ'লে আমার এত মাথাব্যথাই বা কিসের? সম্পর্ক হিসেবে তাঁরা তোমারও যা, আমারও তাই, নয় কি? তাতেও যদি তোমার হুঁস্ না হয়, জানবো যে তোমরাও সাধুর খোলসপরা পরস্বাপহারী চোর, ডাকাত; তখন এই সব মুখোসপরা দলের কোন সাহায্য ভিক্ষা না ক'রে বরং তাদের কাছে চাইব, যারা নিজেদের অবস্থা বা পেশা, লোকের কাছে স্পষ্ট ভাষায় ব'লতে বা স্বীকার কর্ত্তে কুণ্ঠা বোধ করে না; সেখানে আর কিছু পাই না পাই অন্ততঃ সহানুভূতিটার অভাব হবে না, তা সে তারা লোকচ'ক্ষে যত হীন আর যত নীচই হোক্। তা ছাড়া আর একটা কথা, তোমাদের এই সব ধর্ম্মধ্বজিরা যাদের মানামানির উপর নির্ভর ক'রে এতটা বেড়ে উঠেছে, তাদের অবস্থা দেখেও এ সব আড়ম্বরের ইচ্ছা আসে কি ক'রে, তাদের এখন মতি বুদ্ধির স্থৈর্য্য কতটুকু তা কি জান না? আজ তারা যাকে মাথায় তুলে নাচ্‌চে দেখ্‌চো খেয়াল বশে, কাল হয়ত তাকেই পায়ের নীচে ফেলে দল্‌তে দেখ্‌তে পাবে। এদের নির্দ্দিষ্ট ভাল-মন্দের উপর যারা আস্থা রাখে, তাদের অবস্থাও যে ঠিক তাদেরই মত, তাও কি ব'লে বোঝাতে হবে? অতএব ব্যবসার খাতিরে যদি সত্যিই তাদের মানামানির একটা মূল্য ধ'রে নিতে চাও, তবে আগে তাদের বুঝতে দাও, তাদের অবস্থা প্রকৃতিস্থ হোক্, তারপর যে যত পার সিন্নি খেও। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কি আর বাহাদুরিটা নেবে বাবা?—এস',—ওঠ,—চল।

নাগা বেচারা অবশেষে বোধ হয় বুঝলে যে, কথার প্যাঁচে তাকে বড়

বেকায়দা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে, বেশী ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এখন সুবিধা হবে না, তাই ভেবেই হোক্ বা যে কোন কারণেই হোক্ 'মৌনি বাবা' বনে গেলেন। তখন তাকে উল্টো সুরে একটু খোসামোদ টোসামোদ ক'রে, পাষান্ ভাঙ্গার ব্যবস্থা কর্ত্তে লাগ্‌ল',—বল্লে, দেখ ঠাকুর যারা আজকাল ঐ সব কাজ হাতে নিয়েছে, হয় তারা ভুঁইফোড়, নয় জুয়াচ্চোর। তাইতেই তাদের দেমাক কত, পড়তা চ'লেচে ব'লে—ধরাকে তারা সরা জ্ঞান করে, ভেত'রে সম্বল কিছু থাক্ আর নাই থাক্। সে তখন পরে বুঝে নোওয়া যাবে কার দৌড় কত দূর? কারণ সকলেরই যখন একদিন দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ কর্ত্তেই হবে।

তাতেও নাগার কোন বোল্ ফুট্‌ল' না, আর কি ভাবে যে আগের কথাগুলো বা পরের কথাগুলো হজম ক'রলে, তার হাবভাব থেকে কোন কিছু আন্দাজ কর্ত্তে না পেরে বিবেকের শিষ্য-বেচারা যেন একটু হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো; তবে ঝড় ওঠ্‌বার যে আর দেরী নেই—ভিতরে যে তার কিছু একটা গোম্‌রাচ্চে তা কতকটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে অপেক্ষায় রইল যে—ঝড় কোন দিক্ থেকে ওঠে তাই দেখবার জন্যে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর নাগাঠাকুর জলদ্‌গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করলেন যে, দেখ বাপু দরদি! ঔষধ দেওয়াটা একটা বড় ব্যাপার নয়, তাতে মাত্র রোগের চতুর্থাংশের একাংশ মাত্র সারে, আর তিনভাগ সারে পরিচর্য্যার গুণে। সে দিক থেকে যদি কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা না থাকে, তবে আপত্তিকর আর কিছুই নাই। তবে কথা হ'চ্চে কি? যার বা যাদের হাতে রোগের ঐ তৃতীয়াংশ সারাবার ভার বা পরিচর্য্যার ভার থাকে তারা মাত্র ঔষধির সম্বন্ধে অজ্ঞ থাক্‌তে পারে, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাক্‌লে চলে না। লুপ্ত

চিকিৎসা বিদ্যায়, আমি নিজেই এখনও শিক্ষানবিশীর দলভুক্ত; তা হ'লেও যতটা যা জানি, আমি তা যথাযথ ব'লে যাচ্চি, শোন আর বোঝ, কতটা কি কর্ত্তে পারবে—কি পারবে না, তারপর ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ রোগগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, এক—গ্রহ-বৈগুণ্যজনিত, আর দ্বিতীয়টী হচ্চে নিজেদের অনবধানতাবশতঃ। গ্রহ-বৈগুণ্যজনিত যে সব রোগ উৎপন্ন হয়, এ ক্ষেত্রে তার সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, আর সেগুলি নিরাময় করা বিশিষ্ট চিকিৎসক ব্যতীত সম্ভবপরও নয়। সে যাই হোক্, উপস্থিতক্ষেত্রে আমরা যা নিয়ে ভুগছি, যেগুলি নিজেদের অনবধানতাবশতঃ উৎপন্ন হয়, সেগুলি আমাদের শারিরীক, মানসিক ও নৈতিক বিপর্য্যয়সঞ্জাত। উহাদের মধ্যে যে কোন একটী অবস্থাকে আশ্রয় ক'রে, তদ্‌তদ্‌ বস্তু বা বিষয়ের সংযোগ বা বিয়োগজনিত যে সকল বিষমতার সৃষ্টি হয়, আর সেই বিষমতা যখন মনকে অধিকার করে বা মনের স্বাভাবিক স্থৈর্য্যকে নষ্ট ক'রে বিকৃতি এনে দেয়, আর মনের বৈষম্যতার সঙ্গে ঐ অবস্থাত্রয়ই যে বিকলতা প্রাপ্ত হয় সেই সেই অবস্থাকেই আমরা রোগ বলি। ধর শারিরীক অবস্থার বস্তু বা বিষয়ের সংযোগ-বিয়োগ ব'ল্‌তে বুঝে নিতে হবে, যেমন বস্তু হিসাবে কোন মাদক-দ্রব্যের সংযোগে অবস্থাত্রয়েরই বিকলতা দোষ জন্মে, আবার তেম্‌নি নিয়মিত ভাবে যে কোন বস্তু পান ভোজনাদি দ্বারা গ্রহণ করি তার অভাবজনিত একটা বিকার উৎপন্ন হ'য়ে ঐ অবস্থাত্রয়কেই চঞ্চল ক'রে তোলে;—এই হ'ল বস্তুর সংযোগ বিয়োগজনিত শরীরে যে রোগাদি আশ্রয় করে তার উদাহরণ। তেম্নি শরীরের বিষয়জনিত সংযোগ-বিয়োগ ব'লতে, যে গুলি দেহের ক্লান্তি অপনোদনের বিষয়, যেমন, নিদ্রা, ব্যায়াম, স্নান ইত্যাদি, ঐ গুলির

নিয়মাতিরিক্ত সংযোগ-বিয়োগেও তেম্নি শারিরীক স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। ঠিক্ ঐরূপেই মন যখন কোন একটী রিপুগ্রাসিত হ'য়ে থাকে, (আজকাল আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন একটী রিপুর বশীভূত), সেই রিপুর কাম্য বস্তু বা বিষয়ের সংযোগ-বিয়োগে মনের সন্তাপ বা সম্ভোগজনিত যে বিপর্য্যয়, তাহাও ঐ অবস্থাত্রয়ের বৈষম্যের কারণ হয়। আর নৈতিক বিপর্য্যয় বল্‌তে, আমরা ব্যবহারিক জগতে অভ্যাসের গুণে যার প্রকৃত কোন মূল্য নাই অথচ একটা মূল্য ধ'রে নিয়ে তাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিয়েছি, সেই সেই বস্তু বা বিষয়জাত নৈতিক ব্যতিক্রম দ্বারাও স্বাভাবিক অবস্থার বিকলতা উৎপাদন করে। যেমন ধর, স্বামী-স্ত্রীসম্পর্কজনিত আমাদের যে বাঁধা-ধরা একটা কাটামো খাড়া করা আছে, সেই গণ্ডীর বাহিরে উভয়ের মধ্যে যদি কারো কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি হয়, তার ফলে খুন-খারাপি থেকে পাগল পর্য্যন্ত হ'য়ে যায়, আবার অতিরিক্ত সংযোগ ফলে "কূয়োর ব্যাঙ্‌" হ'তে হয়। মোটের উপর, অবস্থাত্রয়ের যে কোনটীকে উপলক্ষ ক'রেই রোগের উৎপত্তি হোক্, সব ক্ষেত্রেই মন আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রোগের অস্তিত্ব বিকাশ পায় না।

বিষয় থেকেই হোক্ আর বস্তু থেকেই হোক্, উভয়েরই ক্রিয়াস্থল হ'চ্ছে মন; এখানে মনের স্বরূপ হ'চ্চে যে, মাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পান্দনিক ক্রম গ্রহণ উপযোগী ক্ষেত্র, সংকল্পাত্মক্ ক্রম নয়। বিষয় বা বস্তু দ্বারা মন সংক্রামিত হবার একমাত্র কারণ হ'চ্চে যে সেই সেই বিষয় বা বস্তু মনেরই কোন না কোন একটী অবস্থা সঞ্জাত, তাই ঐ সব বিষয় বা বস্তু জাগ্রত-কেন্দ্রের পরশ পাওয়া মাত্রেই নিরুদ্ধ স্পন্দনক্রমগুলি স্বাভাবিক নিয়মে কেন্দ্রাভিসারী হ'য়ে থাকে। ঐ বাহ্যিক স্পান্দনিক

ক্রমশক্তি যদি বিশিষ্ট কেন্দ্রের ক্রম অপেক্ষা বেশী হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কেন্দ্রটী ধ্বংস হ'য়ে যায়, আর যদি সমশক্তি সম্পন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে,—কেন্দ্রীয় শক্তির বৈশিষ্ট কিছুদিন যাবৎ বোঝা যায় না, পরে এতদুভয়ের যে কোন একটী ক্রম জয়ী হ'তে পারে। আর যে বাহ্যক্রমগুলি কেন্দ্রীয় শক্তি অপেক্ষা হীন শক্তিশালী তাহারা মাত্র কিছুক্ষণ যাবৎ কেন্দ্রকে ভাবাবিষ্ট রেখে নিজেই অপসারিত হ'য়ে থাকে। যা হোক্, আমাদের হাসি কান্নাদি বিকারগুলি, একটী দ্বারা সংক্রামিত হ'য়ে অন্যটীর দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব বিষয় বা বস্তুদ্বারা মন সংক্রামিত হবার কারণই হ'চ্চে, বিষয় বা বস্তুর স্পান্দনিক ক্রম তা ছাড়া অন্য গুণাগুণ কিছুই নেই।

তাহ'লে এখন দেখ চিকিৎসকের বা শুশ্রূষাকারীর কোন্ কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার? প্রথমতঃ তাদের জানা দরকার যে, রোগ্টী কোন জাতীয়,—অর্থাৎ কোন অবস্থার, বিষয় বা বস্তুর সংযোগ বিয়োগজাত। তারপর জানা দরকার প্রয়োগ উপযোগী বস্তু বা বিষয়ের স্পান্দনিক ক্রম। তদতিরিক্ত আরো জানা দরকার হয় গ্রহাদির প্রভাব, তা সে রোগীর ওপরও বটে, ভেষজাদির ওপরও বটে; যেমন আমরা সাধারণতঃ দেখ্তে পাই, অমাবস্যা, পূর্ণিমাদিতে রোগীর রোগ বৃদ্ধি;—তেমনি ভেষজাদির উপরও দেখা যায় যে কোন কোন বৃক্ষলতা সূর্য্যোদয়ে বীর্য্যবান্, আবার কতকগুলি হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়ে, আবার চন্দ্রোদয়ে সেই ভেষজগুলির উল্টা প্রকৃতি দেখা যায়। অতএব তা থেকে জেনে রাখতে হবে যে, যে সময় যে ভেষজটী বীর্য্যবান থাকে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার প্রয়োগ বিধেয়, নতুবা কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তেম্নি শুশ্রূষাকারীদেরও

জানা দরকার কোন্ সময়ে কোন্ কোন্টী পথ্য আর কোন্ সময়ে কোন্ কোন্টী অপথ্য ; তদতিরিক্ত আরো তাদের জান্তে হয় যে রোগীর রোগ হিসাবে, তার কাছ থেকে কোন্ বিষয় বা বস্তুগুলি অপসারিত বা কোনগুলিকে সম্মুখে রাখা দরকার। যতদিন না এই সব বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিদ্যা হাতুড়ে বিদ্যাতেই পর্য্যবসিত থাক্‌বে।

যেমন ধর আজকাল আমরা কত রকমারি চিকিৎসাই না প্রচলিত দেখ্‌চি,—এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদী, হকিমী ইত্যাদি, তারপর জলপড়া, তেলপড়া আছে ; অবধৌতিক আছে, আরো কত কি! তা ছাড়া এমনও ত্যাখা গেছে যে কোন কিছু ঔষধপত্র ব্যবস্থা না ক'রে, শুধু গায়ে হাতটি বুলিয়েই রোগ সারালে, যা হয়ত' অন্যান্য চিকিৎসায় সারে নি। এর কারণ কি ? যদিও ওরা প্রত্যেকেই প্রত্যেক প্রণালীটীকে ছোট ক'রে দিতে চায়, আর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ছিদ্রান্বেষী অথচ কোনটীকেই একেবারে কিছু নয় ব'লে অবহেলাও কর্ত্তে পারি না ; কারণ অনেক সময় হাতে-নাতে ফল পাই ব'লে। এতরকম যে বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা, যাদের উদ্দেশ্য হ'চ্চে রোগ নিরাময় করা, কোনটীই যদি কিছু না হয়, তা হ'লে রোগ সারে কি ক'রে !' তা হ'লে তার সাধারণ ক্ষেত্রটী কি ?

শেষের ঐ ঐন্দ্রজালিকের রোগ নিরাময়ের কথা বাদ দিয়ে যদি অন্য যে কোন একটী "প্যাথির" চিকিৎসক ধুরন্ধরদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে ওষধি প্রয়োগে রোগ সারে কেন ? উত্তর হবে মানব শরীরে কতকগুলি কীটাণু পরিবর্দ্ধিত হওয়ার দরুণ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সেই কীটাণুগুলি ঔষধ প্রয়োগে ধ্বংস করাই হ'চ্চে চিকিৎসার মুখ্য

উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় যে ঐ কীটাণুগুলি জন্মায় কেন?— তখন আবোল তাবোল বলা ছাড়া ঠিক উত্তর কেউই দেবে না,—অথচ যতদিন না সে টুকুর সন্ধান পাওয়া যায় ততদিন তা সে যে কোন চিকিৎসাই হোক, আর নিজেদের যত বড় ব'লেই জাহির করুক, তারা হাতুড়ে ছাড়া তখনও বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসক ব'লে গণ্য হ'তে পারে না।

তারা যা করে করুক, আমরা এখন প্রাকৃতিক আইন অনুসারে, কীটাণুগুলির পরিবর্দ্ধিত হবার কারণ কি, খুঁজ্‌তে গেলে দেখ্‌তে পাই যে,—কোন কিছু যদি তার গতিকে কোন কারণে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে ফেলে আর তার জন্যে ক্রমশঃ আশ-পাশের আওতা বেড়ে উঠে তাকে উন্মুক্ত রোদ, হাওয়ার সম্পর্ক থেকেও বঞ্চিত ক'রে দেয়, তখনি সেখানে নানা রকম অন্তজ কীটাদি উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। আমাদের শরীরের মধ্যেও ঠিক সেই সেই আইন অনুসারে কীটাণুগুলির উদ্ভব হ'য়ে থাকে। এখন ঐ গতি নিরুদ্ধ হয় কেন? গতি নিরুদ্ধ হবার একমাত্র কারণ, যন্ত্রের পরিচালকের অনবধানতা, তা সে নেশা ক'রেও হ'তে পারে নিদ্রাবশীভূত হ'লেও হ'তে পারে। অতএব অবশেষে সেই একই যায়গায় এসে পৌঁছুতে হয় অর্থাৎ মনের কাছে। মন যদি চাঙ্গা থাকে তা হ'লে আর কোন বিপৎপাতই হয় না, কিন্তু তার অনবধানতা দোষে যন্ত্রপাতি বিকল হ'য়ে পড়ে। অতএব জীবাণু বা কীটাণু ধ্বংস করাই চিকিৎসা নয়, রুদ্ধ গতিকে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াই হ'চ্চে চিকিৎসার মূলতত্ত্ব।

ওষধি প্রয়োগ ছাড়া রোগ নিরাময়ের আর একটী উপায় হ'চ্চে রোগাক্রান্ত কেন্দ্রে, বাহিরের কোন একটা জীবন্ত বা কৃত্রিম কেন্দ্রের

মারফত ব্যতিক্রম অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট স্পান্দনিক স্রোত প্রয়োগ ও গ্রহণ দ্বারা অবরুদ্ধ গতিপথ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া। তবে এখানেও প্রথম প্রথম কতকগুলি অসুবিধা আছে; সেগুলি হ'চ্চে মানব শরীরস্থ উত্তর ও দক্ষিণমেরু সঞ্জাত স্পন্দন প্রবাহ যে দশটী নাড়ীকে আশ্রয় ক'রে ক্রিয়মান থাকে তাদের অর্থাৎ ঐ দশটী নাড়ীর গতিবিধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা। এখানে হয়ত' মানব শরীরে দশটি নাড়ীর কথা শুনে আধুনিক চিকিৎসক মহলে একটা হাসির গর্‌রা ছুটবে, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁদের অধোবদন হওয়াই উচিত। কারণ দশটী নাড়ী ব'লতে ধমনী প্রবাহকে যে বোঝায় না, তা তাঁদের বহুপূর্ব্বেই জানা উচিত ছিল। ঐ দশটী নাড়ীর অবস্থিতি হ'চ্চে মেরুদণ্ডের মধ্যে,—আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদরা যেগুলিকে Tracts বলেন। ঐ নয়টী Tracts বা নাড়ীর মধ্যস্থলে, রবারের মধ্যে সুঁচ্ দিয়া ছিদ্র করার পর ঐ সুঁচ্‌টী খুলে নিলে পর যেমন রবারটী সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ ঐ ছিদ্র পথের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না অথচ ছিদ্রটী ঠিকই বর্ত্তমান থাকে, ঠিক সেইরূপ একটী ছিদ্রপথ ঐ নয়টী Tracts এর মধ্যস্থলে বর্ত্তমান আছে ঐটীকে আমাদের ঋষিরা আর একটী নাড়ীর সামিল ধরে নিয়েছিলেন। অতএব সর্ব্বসমেত দশটী নাড়ীই বজায় থাকে।

তারপর ঐ দশটী নাড়ীর ক্রিয়া;—দশটীর মধ্যে পাঁচটী দক্ষিণমেরু সঞ্জাত স্পন্দনস্রোত বহন করে বা কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে, আর বাকি পাঁচটীর মধ্যে চারটী উত্তরমেরুর প্রবাহ বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে; বক্রীটী অর্থাৎ সুষুম্না নামক ছিদ্রপথটী 'মন' নামক বস্তুবিশেষের যাওয়া আসার রাস্তা বা বিচরণক্ষেত্র বলা যেতে পারে। তার অর্থ হ'চ্চে যে Thermometer যেমন তাপের তারতম্য

অনুযায়ী Thermometer এর মধ্যস্থ ছিদ্রপথে ওঠানামা করে, মানুষের মনও তাপের অনুপাতে (ঐকান্তিকতার অনুপাতে) মূলাধারক্ষেত্র (Coxical region) থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র (ceribrum) পর্য্যন্ত ওঠানামা কর্ত্তে থাকে।

স্পন্দনস্রোত প্রয়োগকারীকে আরো জান্‌তে হয় যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিটীর মনের সাধারণক্ষেত্র কোথায়? সাধারণ মানবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র হ'চ্চে মূলাধার কেন্দ্র, যারা মাত্র অভ্যস্ত বিষয় নিয়েই জীবনাতিপাত করে বা যাকে জৈবীভাব বলা হয়। তা থেকে যারা একটু আবার ভেবে-চিন্তে কিছু ক'রে তাদের ঐ সুষুম্না ছিদ্রপথটী মণিপুর (Lumber) অবধি উন্মুক্ত হ'য়ে থাকে। তদূর্দ্ধে যে হৃদিপদ্ম নামক চক্র বর্ত্তমান (Dorsal region) যাঁরা কোন বৈজ্ঞানিক কি ভগবৎ বিষয়ক বা যে কোন সুক্ষ্ম তত্ত্ব মীমাংসার জন্য ধ্যানস্থ থাকেন তাঁদের ঐ হৃদিপদ্ম অবধি উন্মুক্ত হ'য়ে থাকে। এইরূপ আরো যে তিনটী চক্র বর্ত্তমান, ঐকান্তিকতার চাপে তত্ত্বান্বেষীরা না কি ঐ তিনটী চক্রকেও অতিক্রম করার পর ব্রহ্মপদ প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন, যাকে 'হঠযোগী'রা ষড়চক্র ভেদ করা ব'লে থাকে বা যাকে সপ্ত স্বর্গ ব'লেও উল্লেখ ক'রে থাকে। এক্ষেত্রে সে সব বিশেষ অবস্থা উল্লেখ করার কোন আবশ্যক নেই, কারণ হৃদপদ্মের উর্দ্ধে অবস্থিত 'মন' রোগশোকাদি বিকার বহির্ভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেই দরকার হ'লে চিকিৎসকদের বরং সে সব জায়গায় গিয়ে নেবার মত অনেক কিছুই থাকে, দেবার পুঁজিতে কুলোয় না।

অতএব স্পন্দনপ্রবাহ প্রয়োগের সময়, রোগীর যার যেখানে (বা যে চক্রে) মনের অধিষ্ঠানক্ষেত্র, সেই সেই কেন্দ্রে নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনস্রোত

পরিচালনা করা দরকার ও তন্নিম্নবর্ত্তী চক্রে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তদূর্দ্ধে বিপরীত প্রবাহ গ্রহণোপযোগী ব্যবস্থার দরকার হয়। তার কারণ যার মনের যেখানটীতে অধিষ্ঠান ভূমি বা কেন্দ্র, "হেড্ অফিসের" আদেশ-নির্দ্দেশ মনের অধিষ্ঠান কেন্দ্র অবধিই আসে, তন্নিম্নে মানুষের অভ্যাসজনিত স্বভাব বিরাজ করে। তাই যেখানে শুধু স্বভাবজাত কোন কিছুর ব্যতিক্রমে রোগোৎপত্তি হয়ে থাকে সেখানে উপরে উত্তরমেরু-সঞ্জাত স্পন্দনের নাম মাত্র স্পর্শ রেখে ব্যবহারিক বিষয়ের সংযোগ বা বিয়োগ জনিত দক্ষিণমেরুসঞ্জাত প্রবাহ প্রয়োগে রোগোপশান্তি হ'য়ে থাকে। এখন কথা হ'চ্চে, কি ক'রে স্পন্দনের ক্রম নির্দ্দেশ করা যায় ? সে ক্ষেত্রে এইটুকু বলবার আছে যে যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে শত শত রকমের সূক্ষ্মতত্ত্বের মীমাংসা ক'রে বেড়াচ্চেন, তাঁদের পক্ষে মাত্র ষোলশত রকমের স্পন্দনক্রম (অর্থাৎ ষোলশত রকমের ভাব নিয়ে মানবদেহ) ঠিক্ ক'রে নেওয়া এমন কিছু মহামারী ব্যাপার নয়। আর তা না হ'লে অন্ততঃ ভৈষজ্যবিজ্ঞান ব্যাপারে এটুকুও জানা দরকার যে বিষমাত্রায় কোন ঔষধি প্রয়োগে মনের কিরূপ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়, যেটী ব্যবহারে যেরূপ বৈলক্ষণ্যের সঞ্চার হয় তাহারি সূক্ষ্মমাত্রা প্রয়োগে রোগ নিরাময় হ'য়ে থাকে। কিন্তু জড়শক্তি (দক্ষিণাপথবাহী) প্রয়োগে অর্থাৎ বিষমাত্রা প্রয়োগে রোগ নিরাময়ের ফল হয় শরীরকে আরো বিকল ক'রে তোলা।

আর এক উপায় হ'চ্চে বাক্যরূপ স্পন্দনস্রোতের প্রবাহ প্রয়োগদ্বারা রোগ নিরাময় করা, অর্থাৎ ভাবসিদ্ধির দ্বারা নিজের মধ্যে স্পন্দন ক্রমগুলিকে জাগিয়ে তুলে বাক্‌যন্ত্র মারফত তাহার প্রয়োগ ব্যবস্থা, যেমন কেহ কাঁদবার অভিনয় কর্ত্তে কর্ত্তে ভাবসিদ্ধি হ'লে পর, তখন সে

যেমন নিজে নিজেই কাঁদ্‌তে থাকে আর নিজে কেঁদে পরকেও কাঁদিয়ে দেয় বা হেসে হাসিয়ে দেয়,—এ সবও ঠিক্ তাই; তবে আজ সেগুলি নিয়ে কেউ আর নাড়াচাড়া করে না ব'লে,—যেন কিরকম কিরকম ঠেকে, আর বর্ব্বরোচিৎ ব'লে মনে হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ওষধি পর্ব্বের এই অবধিই থাক্! তারপর খাদ্যাখাদ্য পর্ব্ব;—এগুলিও ওষধি; তবে কি না, নিত্য ব্যবহার্য্য ব'লেই হঠাৎ তার গুণাগুণ ধরা পড়ে না—যখন খুব বেশী অপব্যবহার হ'য়ে পড়ে, তখনই সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর তার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই খাদ্যাখাদ্যের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে, প্রথমেই হয়ত দোষী হ'য়ে পড়ে জিহ্বা বেচারা, কিন্তু প্রকৃত সেটা কোন কাজের কথা নয়, সে মাত্র সমগ্র শরীরের ভাব অনুযায়ী রসের চাহিদাটুকু প্রকাশ ক'রে থাকে, আর সংগ্রহ ক'রে বেড়ায় হাত পা, তারপর ভোগবার সময় সকলে মিলেই ভোগে, তা সে ভোগ্‌টা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। তবে সবার উপর একটা কথা,—"যার মন চাঙ্গা, তার কটোরাতেই গঙ্গা", অর্থাৎ যে তার নিজের স্বভাবকে চিনে নিয়েছে, সে যাই থাক্ না কেন, সে তাই থেকে তার নিজের স্বভাবানুরূপ রসটুকুই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে থাকে। যেমন একই মাটীতে নানা রসের সমাবেশ থাক্‌লেও, বিভিন্ন গাছ তার স্বভাবানুরূপ রসটুকুই টেনে নেয়। অতএব একথাও ঠিক্ যে চোরে দুধ ঘি খেলেই যে সাধু হবে তা যেমন নয়, আর সাধুরা মাছ খেলেই যে হিংস্র হ'য়ে উঠবে সেটাও কোন কাজের কথা নয়; সে যে যার মন অনুযায়ী ধন সংগ্রহ ক'রে নেয়। তবে কথা কি, যাদের মনও নেই, ধনও নেই, তাদের জন্যেই না যত পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা বন্দোবস্তের দরকার!

অতএব হে নরকুলের হিতৈষী নরপুঙ্গব! চিকিৎসা বিদ্যায় চার ভাগের তিনভাগ যারা সারাবে, আর তাদের যা যা জানা দরকার, তা তো একরকম এক নিঃশ্বাসে সবটাই ব'লে ফেলা হ'য়েচে। যদি সত্যিই তোমার প্রাণ কেঁদে থাকে, তা হ'লে আগে রোগীর ঘরখানা পরিষ্কার ক'রে ফেল। যা যা গ্রহণ ক'রলে মনের ও দেহের পুষ্টিসাধন না হ'য়ে বরং রোগকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে আনা হয়, সেই সব বস্তু বা বিষয়-গুলিকে আগে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা কর, আর সেই সব জায়গার অর্থাৎ বিকারের পরিপোষক আবর্জ্জনার জায়গায়, বিকারের উপশম-কারক আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে দাও গে, তা না হ'লে অর্থাৎ কুপথ্যের ধরাকাট না ক'রে শুধু ঔষধ প্রয়োগে রোগ নিরাময় কোন দিনই সম্ভব হবে না। তা যদি কোনদিন সম্ভব ক'রে তুল্‌তে পার, তা হ'লে কোন দিনই সুচিকিৎসকের অভাব হয় না বা হবে না; প্রাকৃতিক বিধানে প্রত্যেক কেন্দ্রেই তাঁরা নিত্য বিদ্যমান ও জাগরুক। তবে একটা কথা,—এ যুগের ব্যবহারিক প্রথা হ'চ্চে, যার মাথা ফাটে তাকেই চুণ খুঁজে নিতে হয়। তারপর মৌখিক আহা—উহু করার দলেরা যথাসময়ে এসে দেখা দেবে; তার অভাব বড় একটা হবে না। তবে কোন সাহায্যের দরকার বুঝলেই, তারা তোমাকে রেহাই দিয়ে স'রে দাঁড়াতে কৃপণতা—ক'রবে না। হে হিতৈষী! এখন তা হ'লে আসি, আমি এই কাছেই রইলুম,—আসি,—নমস্কার।

হিতৈষী বন্ধুটীকে এই রকমে কৃত কৃতার্থ ক'রে বিনা পয়সার হাম বড়া চিকিৎসকটী ত' গা ঢাকা দিলেন, লাভে হ'তে বেচারার ঘুরপাক খাওয়াটাই গেল বেড়ে, শেষে স্বশ্বাসে একবার ব'ল্লে, বা রে দুনিয়া! সাবাস্ তোর চাল্! তারপর থেকে বেচারার আর পায়ের কামাই নেই।

দেখে শুনে মনে হয় এখনকার যা অবস্থা, এ সব জাল কেটে বেরুতে হ'লে মানুষের চার পাটী দাঁত থাকা দরকার। মা বাপের আশীর্ব্বাদের জোরেই হ'ক, আর জন্মগত অধিকার হিসাবেই হ'ক, আমাদের "দু পাটী" পাবার কোন বালাই নেই। উপরন্তু আরো যে দু'পাটী দাঁতের কথা বা কিম্বদন্তী আছে, (যার জন্যে শক্তি পরিচয়ের সময় 'চারপাটী' দাঁতের কথা ওঠে) সে দুপাটী দাঁত নাকি তখনকার মানুষদের দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণের সময় (দ্বিজাতিত্ব লাভের পর) পেয়ে থাকৃতো। না জানি চারপাটী দাঁতযুক্ত বদনখানি দেখতে অদ্ভুত দেখাত' ব'লে তাই বোধ হয় কোন সময়, কোন 'দন্ত বিদ্যা বিশারদ' বা 'দন্ত নিরোধ সমিতি'র প্রচেষ্টায় দন্ত বিকাশকারীদের ঐ অদ্ভুত দু'পাটী দাঁত আর গজাতে পায় নি। তা সে যাই থাক্ আর যাই হোক্, কথাটা ব'লে ফেলায়, কেউ যেন না আবার ভেবে নেন, যে, আধুনিক শিক্ষাকে আক্রমণ করা হ'ল। সে ইচ্ছা মোটেই নেই, বরং একথা বড় গলা ক'রে ব'লতে পারি যে একজনরা যারা নিজেদের 'প্রথম সভ্য' ব'লে জাঁক ক'রতো, তাদের বংশধররা যখন নিজেদের সবজান্তা জেনে, প্রথম জন্মগত অধিকারটাকে বাপকেলে সম্পত্তি ভেবে, তার জন্যে বিশেষ কোন তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা না করেই টংয়ে উঠে (অর্থাৎ দ্বিজাতি ব'নে গিয়ে), নাসিকাধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ক'রেছিলেন, এদিকে তত্ত্বাবধানের অভাবে সে টংয়ের খুঁটী ক্রমশঃ গণদেবের চেলাদের অনুগ্রহে ধরাশয্যা গ্রহণের জন্য তাড়াতাড়ি গোপ্তা খেয়ে নেমে চ'লেছিল, সেই পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে ঐ জড়ের সংস্পর্শে বা ঠেক্ পেয়ে। তবে কথার পিঠে, কথার ছলে একথাও ব'লতে পারা যায় যে, সে এদিকেই হ'ক আর ওদিকেই হ'ক, কোন একটা দিকে বেশী ঝোঁক দিয়ে থাকাটা কারো পক্ষেই ভাল

কথা নয় ;—অন্যমনস্ক হ'লেই একেবারে নীচে গিয়ে প'ড়তে হয়,—তা সে যতক্ষণ না কোন কিছুতে ঠেক খায়। আর পৃথক ক'রে আজকালের দিনের,—এদেশের শিক্ষার ব্যাপারেও আমাদের বিশেষ কিছুই বলবার নেই, কারণ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব শিক্ষা বিতরণ হয়, তা থেকে দিনকেদিন এদেশে স্মৃতিধর ও শ্রুতিধরের সংখ্যা বেড়েই চ'লেছে ; —যে স্মৃতিধর বা শ্রুতিধরদের আগের দিনে রত্ন ব'লেই ধরা হ'ত! অতএব ঘরে ঘরে রত্নের প্রাচুর্য্য হ'তে থাক্‌লে, ভাল বই মন্দ বলবার কি আছে। তবে আবার ঘর ঘর বিক্রমাদিত্য না জন্মালে, এত সব রত্নদের আদর করে কে ?—সেইটাই বরং এযুগে ভাববার কথা ;—কারণ স্মৃতিধর বা শ্রুতিধর হ'তে গেলে, মাথার দরকারটাই হয় বেশী, সেইজন্যই হোক কিম্বা পদমর্য্যাদার খাতিরেই হোক্ এরা এমন ভাবে পদ্‌হীন হ'য়ে প'ড়েছে যে, কারো ঘাড়ে ভর না করা পর্য্যন্ত উপায়ান্তর নাই দেখে, দরখাস্ত হাতে ঐ ওঁরা সকলেই আজ পদপ্রার্থী, এখন এত হাত পা এদের যোগায় কে ? তাই কথার কথা বল্‌ছিলাম যে বিক্রমাদিত্যের মত শক্ত ঘাড় অন্ততঃ গোটাকতক ঘরে ঘরে না জন্মালে ত, এদের আর গতিমুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

তবে একথাও ঠিক্ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি বিদ্যার 'ষোল কলা' দিয়েও সাজান যায়, তা হ'লেও মানবের মানবত্ব বিকাশের যে গোড়ায় গলদ তার কোন কিনারা হ'বে ব'লে মনে হয় না'—দু'চারজন হওয়া না হওয়া সে সমান কথাই, এখনও তার যে একান্ত অভাব আছে তা কে বল্‌তে পারে, সেটাকে ত' বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরামতি ব'লে বলা চলে না, সে বিশ্ববিদ্যালয় না থাক্‌লেও, তাদের স্ফুরণে কেউই বাধা দিতে পারে না।

মানুষকে মানুষ হ'তে হ'লে, মাতৃগর্ভে প্রথম জন্মগ্রহণের পর, শিক্ষা দীক্ষার মারফত আর একটা যে জন্মের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে, সে শিক্ষা ঠিক্ আজকালের এ শিক্ষা যে নয় তা আর ব'লে বোঝাবার দরকার হ'বে না,—আর তার জন্যে শিক্ষার যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন দরকার হ'য়ে প'ড়েছে সে কথা শুধু জননায়কেরা কেন—তুমি আমিও বুঝতে পারি। তবে সেটা কি রকম হবে সেইটেই বিবেচ্য। যদি ঠিক্ ঠিক্ শিক্ষার প্রবর্ত্তনও হয়, তাতেও যে কার্য্যসিদ্ধি হবে বলে মনে হয় না;—কারণ পাকা-বাঁশকে ব্যাঁকাতে গেলে, অনেক কাট-খড়ের দরকার হয়, তাও সবগুলো কার্য্যোপযোগী হয় না।

তারপর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বাহ্নেই যেটুকু দরকার হয়, অর্থাৎ,—যখন শিশু মায়ের কোলে ব'সে তার নমনীয় ও স্ফুরণোন্মুখ চিত্তবৃত্তিগুলি নিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে থাকে, এটা কি? ওটা কি? তখন সেই বুভুক্ষু হৃদয়কে আমরা ছাই পাঁশ কতকগুলো এগিয়ে দিই,—যথা,—লেখা পড়া শেখে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে" ইত্যাদি অর্থাৎ আমরা তখন তাকে প্রকৃত আলোকে আলোকিত করার চেষ্টা না ক'রে, মাত্র কতকগুলি নিজেদের মনগড়া কুসংস্কারের আওতায় আওতায় রেখে দিয়ে ইহজন্মের শোধ তাদের মুক্ত আবহাওয়ায় মাথা তুলে দাঁড়াবার পরকাল খেয়ে দিই। পরবর্ত্তী কালে যদি সে বুঝতেও পারে যে, যে আলো সে উপভোগ করচে এটা আওতার আলো,—তখন কিন্তু তার সূর্য্যের খোলা তাপ সহ্য করবার মত শক্তির একান্ত অভাব হ'য়ে পড়ে, বা কোন কিছুতে কোন একটা রংয়ের পাকা ছোপ ধরে গেলে, তখন তার ওপর যে কোন রং ধরান হোক্ না কেন, ভেতরকার রংয়ের ছায়াপাত তাতে হবেই। তেমনি আমাদের শৈশবের জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম, বংশ, ব্যবহারগত অনেক কিছু

মৌলিক শিক্ষাই এমন পাকা পোক্ত ভাবে ভিত গেড়ে ব'সে থাকে যে, পরবর্ত্তীকালের যত কিছু শিক্ষা-দীক্ষা সবটাই গড়ে ওঠে সেই ভিত্তির অনুরূপে। আর যেটা আমাদের সাধারণ শিক্ষা, সেও ত' বেশীর ভাগ আমরা গস্ত করি ওই কোন একজন শ্রুতিধর বা স্মৃতিধরের কাছ থেকে; নেহাৎ যদি ওরি মধ্যে ভাল গুরুমহাশয় ভাগ্যে কারো জুটলো, তিনি লাভ লোকসান খতিয়ে যতটুকু না দিলে নয় দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেন। কাজেই সে শিক্ষার ফল হ'চ্চে পাখীর মত কপ্‌চাতে শেখা—আর গাছের পাতার আওতায় ব'সে কিচির মিচির শব্দ ক'রে, আত্মপ্রসাদ লাভ করা, তার বেশী আশা করাই ভুল।

তাই যখনি কোন স্থলে জান্তেই হোক্, অজান্তেই হোক্, একটা সত্যি কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, আর তখন যদি কেউ তার প্রতিবাদ ক'রে বসে,—তখন নিজের ওপর আর নির্ভর করা চলে না,—নজীর দাখিল কর্ত্তে হয়, কোন একজন বড়লোকের অর্থাৎ পরের উপলব্ধিকৃত সত্যকে শুধু নিজের ব'লে বুঝতে শিখেছি বলেই সে সত্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারি না, কাজেই সে বস্তুটা পোষাকি, গায়ে প'রে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকৃতে হয়; কাজ করা চলে না। সেই রকম পরের বলা ভালকে ভাল, পরের বলা কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য, পরের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি যত কিছুকে নিজের ব'লে জাহির ক'রে বেড়ালেও, প্রকৃত দরকারের সময় কোনটীরই মর্য্যাদা দিতে পারি না।

তারপর এদেশের কথা নিয়ে এইটুকু বলবার আছে, যে এদেশের সুধীরা,—ভাষার এই জন্যে সংস্কার ক'রেছিলেন যাতে, ভাষার মারফত মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খোলবার অবকাশ পায়; সেই অনুপাতে অক্ষর যোজনা ক'রে শব্দের সৃষ্টি ক'রেছিলেন, যা দিয়ে ভাবের দুয়ারে আঘাত

করা যায়। এখন আমরা সেই সেই বাক্যগুলির ভাবার্থ জানার যে একটা দরকার আছে তাই বুঝি না। যেমন ধরা যেতে পারে,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হরি, হর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গণদেব, মহাদেব ইত্যাদি ইত্যাদি যা আমরা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার করি, দরকার হ'লে আমরা এদের বাপ পিতামহ থেকে চৌদ্দপুরুষের খবর ব'লে দিতে পারি; কিন্তু যদি কেউ তার অর্থ জিজ্ঞাসা করে তা হ'লে হয় তাকে বাপন্ত ক'রে থাকি আর বলি দেবতার আবার অর্থ কি? না হয় বিজ্ঞের মত উত্তর দিই যে ও-সব কিছুই নয়, ভাবুকদের ভাব বিলাসের কল্পনা-প্রসূত শব্দ মূর্ত্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, প্রাকৃত আইনের অনেক কিছুই যে ওরি মধ্যে নিহিত আছে সে সন্ধান হয়ত' কেউ জেনেও জানি না—বা জানতে চাই না,—ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকরী নয় ভেবে আবার কেউ বা মোটেই খবর রাখি না। তাতেও কিছু আসতো যেতো না, যদি অন্ততঃ ভাবটুকুও থাক্‌তো, অর্থাৎ জিজ্ঞাসুবুদ্ধি সজাগ থাক্‌তো, যে বুদ্ধি নিয়ে জড়-বিজ্ঞান এগিয়ে চল্‌ছিলো অপরাপর দেশে। অতএব এ-দেশের এখন যা প্রকৃত অবস্থা তা হ'চ্চে এই যে, সে তার ভাষা হারিয়ে যেমন ভেসে উঠেছে, তেম্নি ভাবের ঘরে চুরি ক'রে ক'রে সেটাকেও হারিয়ে ফেলেছে; এখন জিজ্ঞাস্য, যাদের ভাবও নেই,—ভাষাও নেই, তারা কি পদার্থ?—শুধু ঐ একটা বিষয়েই নয় সব তাতেই আমাদের ঐ একই দুর্দ্দশা; পরের মুখে ঝাল খেয়ে আহা—উহু ক'রে বেড়ান আর চোখের জলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখা।

সে যাক, এখন এই যে সব অন্তরায় এর প্রতিকার কি? শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা না হয় হ'ল,—কিন্তু তারও পুর্ব্বাহ্নে যেটার দরকার তার ব্যবস্থা কি হবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় বল্‌তে হ'লে, ব'লতে হয়,—

"মা-ই বাপকে ঠিক্ ঠিক্ চিনিয়ে দিতে পারে"। কথাটার মানে যাই হোক্, আমরা এখানে ঘরোয়া মায়েদের কথাই ধরচি, আসলে মানবের মানবত্ব বিকাশের আসল ভিত্তি ভূমি হ'ল ঐখানে, যে গঠনের উপর ভিত্তি ক'রে শিশু মানবের পরবর্ত্তী জীবন গ'ড়ে ওঠে বা বিকশিত হয়। আর সাধারণতঃ আমরা দেখ্‌তেও পাই যে, যে সব সন্তানেরা মানব গোষ্টীর মধ্যে আদর্শ স্থানীয়, তাদের প্রত্যেকেরই "মা" ছিল "বড়",—তাই তারা বড় হবার অবকাশ পেয়েছিল।

এখন সত্যিই যদি মানব গোষ্টী চলার পথে ইস্তফা না দিয়ে, চলাটাই বাহাল রাখতে চায়, তা হ'লে সবার আগে দরকার মায়েদের মায়ের মত হবার অবকাশ ক'রে দেওয়া-যা তাদের স্বধর্ম্ম। তাও সে আজকালকার দিনে যেমন তেমন ব্যাপার নয়; এমন ভাবে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হওয়া দরকার যে, শিশুর উন্মেষোন্মুখ জিজ্ঞাসু বৃত্তি গুলিকে,—তা সে যে কোন প্রশ্নই হোক্, সেই সে শুভ মুহূর্ত্তে তাকে চাপা দেবার চেষ্টা না ক'রে বা কোনরূপ আওতার সৃষ্টি না ক'রে সহজ ও সরল শিশুভাষায় বিষয়টীকে ফুটিয়ে তুলে শিশুর নমনীত চিত্ত কোরকে সত্যের ছোপ ধরিয়ে দেওয়া বা ব্যবহারিক ভাষা, ব্যবহারের খাতিরে সমাজ কোন্‌টীর কি দাম ধরে নিয়েছে, কোন রং না দিয়ে সেই খোলা রূপটাই শিশু-চিত্তে এঁকে দেওয়া দরকার। তা না হ'লে, পরে তাকে একটী একটী ক'রে শোধরাণ অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়।

মোটের মাথায় মাতৃহৃদয়ে প্রত্যেক বিষয়েরই বীজটুকু থাকা একান্ত দরকার, অর্থাৎ যে কোন বিদ্যা বা বিষয় হোক্—তার উৎপত্তি ও লয়ের কারণ যে একই আর প্রত্যেকটীর অধিষ্ঠানও যে সেই একেতেই, সে সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার—যেমন প্রত্যেক নদীটি বিভিন্ন হ্রদ

বা উৎস থেকে উৎপন্ন হ'লে ও, প্রত্যেকটীরই উৎপত্তি ও লয়ের স্থান হ'চ্চে মহাসমুদ্র আর তাদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হ'চ্চে পৃথিবী। মাতৃ-হৃদয়ে প্রত্যেক বিষয়েরই ঠিক্ ততখানি অভিজ্ঞতা বা মূল সূত্রটুকু জানা থাকা দরকার যে, যে ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হ'য়ে থাক্, তাদের প্রত্যেকেরই উৎস সেই এক, লয় ও তাতেই; তবে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রত্যেকটীর উৎস ও লয়ের কেন্দ্র এক হ'লেও, তাদের সব ক'টীকে টেনে এনে একই প্রণালীর মধ্য দিয়ে বহান চ'লবে না, প্রত্যেকটীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই তাদের চিনে নিতে হবে, এই ত' ব্যাপার!

বলি,—মায়েদের খবর কিগো? এত যে হল্লা করা গেল, তার রেশ্ তোমাদের কানে কিছু পৌঁছুল না কি? না,—তোমরা সব কান ভারি ক'রে ব'সে আছ যে, ছোট কথা কানে নেবে না? বলি,—রাগ ক'রেই হোক্, আর বিরক্ত হ'য়েই হোক্,—একবার "হুঁ"টা দিয়ে ফেলনা গো! —তারপর তোমরা শোন আর না শোন,—তাতে বিশেষ কিছু যাবে আসবে না,—আমরা বুঝ্‌বো যে শ্রোতা হাজির আছে,—অতএব ঠিক্ আগের মতই এই শেষের গাওনাকিটাও মনের আনন্দে সেরে নিই।

অবশ্য এটা ঠিকই যে, শুধু কাগজ পেন্সিলের মুখে গলাবাজীর ঢেউ তুল্লে সরাসরি কারো কোনদিন সাড়া পাওয়া যায় না। তা হ'লেও আমারি বা উপায়ান্তর কি? নিজের বকা বাই নিবৃত্তির জন্যে মনে মনে ধরেই নেওয়া যাক্ যে, সেই তাঁদের "হুঁ" পাওয়া গেছে; তা না হ'লে যে শেষ বলাটুকু আর বলা হয় না!—আর বকা বাইটারও উপশান্তি হয় না!—

বলি! তোমাদের মতলবটা কি বল দেখিগো মা! ছেলে মেয়ে-গুলোকে আবার মানুষ ক'রে তুল্‌তে চাও? না যেমন তাদের মধ্যে

মাতলামীর নাচন কোঁদন চ'লেছে, তাই চ'লতে থাক্‌বে ?—তারপর আজকাল তোমাদের—ঐ যে কি বলে ?—পুরুষ—না—কিম্‌পুরুষ !—তাদের সঙ্গে বিনা দরকারে সমান তাল রেখে চলার ব্যাপারটা,—ও জায়গায় ঐ 'ওনাদের' অতটা প্রশ্রয় দেওয়াটা কি সমীচিন হ'চ্চে ? শক্তিটা কি এতই সস্তায় বিকুচ্চে না কি আজ:কাল ? খোঁটা আল্গা হ'লে ওই 'ওনাদের' যা অবস্থা হয় তা কি একেবারেই ভুলে গেছ ? না নিজেরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছ ? আর ঐ যে যাদের কথা ব'লছিলুম, পুরুষ না—কি (?) ওদের কি সম্বল আছে যে ওদের সঙ্গে তাল ঠুক্‌তে যাবে,—যদি না আত্মবিস্মৃত হ'য়ে থাক' ?—ওরা ত' এখন 'মরা'ই !—বলি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কি হবে মা ?—বেশ ত', লড়াই চাও,—সে ত' সৌভাগ্যের কথা !—আগে তৈরী ক'রে নাওনা ছেলেদের :—তারপর পাল্লা দিতে হয় তাদের সঙ্গে দিও !—তখন বুঝ্‌বো কেমন মা !—তখন কিন্তু ছেলের গর্ব্বে শুধু বুক ফুলিয়ে থাক্‌লে চলবেনা,—তখন—ওগো শক্তিময়ী ! ওগো শক্তি সাধিকে ! শক্তির অপব্যবহারের অছিলায় কৃপণতা ক'রলে চ'লবে না, কত শক্তিধর বুঝে নেওয়া যাবে। জান ত' নির্ভীক শক্তিধরদের কাণ্ড বলে কিনা—"দেখি মা হারে কি পুত্র হারে"। সমানে সমান না হ'লে শক্তি পরীক্ষা করে লাভ কি মা ?—তাই বলি, "আয় মা সাধন সমরে"। তাই জিজ্ঞাসা করি, 'কু' পুত্র হ'লেও 'কু' মাতা হওয়াটা কি উচিত হ'চ্চে ? আরো জিজ্ঞাস্য, মায়ের মর্য্যাদা মায়েরা ছাড়া আর কে বুঝবে বলত' ? তাই আবার ডাকি,—'মা' জগো !—ছেলেদের জাগাও ! আবার জগৎ সত্যানন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক !!—

আর এতো তোমাদের পক্ষে নূতন কথা কিছু নয় মা,—পরের ভাবকে

নিজের ক'রে নিয়ে তিতীক্ষা, ধৈর্য্য,—অতো কথা কি,—নিজের শরীরের মেদ-মজ্জা দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে, আর কেউ কোন দিন পেরেছে কি ? সত্যকে (আজকাল নাম বদ্‌লে যাকে আমরা ধর্ম্ম বলি) আর কে বা কারা, অতখানি শ্রদ্ধা দিয়ে আজো না থাকার মধ্যেই জাগিয়ে রেখেছে, —সে তোমরাই নয় কি ? যার প্রতীক ছিল সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, সীতা, গার্গী, সুমিত্রা, মদালসা, এমন কি এই সে সেদিনকার পদ্মিনী, সংযুক্তা (দুঃখের বিষয় অপরাপর দেশের চরিত্র জানা নেই) ইত্যাদি আর কত ব'লবো ! এদের যে কোন একটী চরিত্রের গল্পাংশের বাহাদুরিটা বাদ দিয়ে, চরিত্রের দিক থেকে খুঁজলে আমরা কি পাই ;— ধর সাবিত্রীর কথা,—সাবিত্রীর পাত্রস্থ হবার বয়েস হ'লে, সাবিত্রীর বাবা, —রাজা 'দ্যুমৎ সেন' উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে কত রাজা, মহারাজা, কত কুলশীলসম্পন্ন বিদ্বান্, কত জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী ইত্যাদির মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে, যখন কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলেন না, তখন তিনি সাবিত্রীকে ডেকে বল্লেন, মা সাবিত্রী ! আমি তোমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পাল্লুম না। স্ত্রীলোকের যে সমস্ত গুণে সমলঙ্কৃত হওয়া দরকার, তুমি তার পূর্ণ অধিকারিণী হ'য়েছ ; অতএব এখন তুমি নিজেই, তোমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করে নিয়ে আমাকে,—'কন্যাকে অপাত্রে দান করা রূপ মহাপাপ থেকে উদ্ধার কর'।

ধর, রাজা নিজেই পাত্রমিত্রসমেত কয়েক বৎসর যাবৎ খোঁজ খবর ক'রে যে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলেন না, সেখানে কি সাহসে তিনি তাঁর বয়স্থা কন্যা সাবিত্রীকে পাত্র খুঁজে নিতে ব'ল্লেন ?—যার সে বয়সে দুনিয়ার সবই সবুজ,—সেটা যে রাজা জানতো না, তাও নয়। তারপর তখনকার দিনে যা দেখে ভাল মন্দের বাছাই হ'ত (এখনকার দিনে যেমন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ) সেরূপ বহু রূপবান্, গুণবান্, স্বাস্থ্যবান্', বিদ্বান্, কুলশীলসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যবান্ ইত্যাদি যতকিছু গুণের সমাদর করা চলে, এরূপ এক বা একাধিক গুণসম্পন্ন বা একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্রেরা ত' নিজেরাই উপযাচক হ'য়ে এসেছিল সাবিত্রীর বাপের কাছে ; তা ছাড়াও যে কে কোথায় থাকতে পারে, সেই নিরুদ্দেশের পাত্রের সন্ধানে রাজা তাঁর বয়স্থা কন্যাকে মাত্র সারথিসমভিব্যাহারে ছেড়ে দিলেন। রাজা যে যৌবনসুলভ প্রলোভনাদির কথা একেবারে বুঝতেন না তা নয় ;— তা হ'লে কন্যার চরিত্রের দৃঢ়তার উপর কতখানি না আস্থা সম্পন্ন ছিলেন !

তারপর সাবিত্রীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই যে, যৌবনোচিত কতশত রকমের প্রলোভনের হাত এড়িয়ে, ততোধিক বৈধব্যের বিভীষণ চিন্তাকেও উপহাস ক'রে,—রাজ-কন্যা, শেষে এক অতি দরিদ্র কাঠুরিয়া সন্তানকে উপযুক্ত পাত্র বোধে বরণ ক'রে ব'সলেন,—সেখানে যে, কোন অনুরাগের ব্যাপার নিহিত ছিল তাও নয় ; এই ব্যাপার থেকে কি বুঝবো ? তাঁদের শিক্ষার মূলে কি সে বস্তুর সমুজ্জ্বলতা, পার্থিব প্রলোভনের বিষয়গুলিকেও হীনপ্রভ ক'রে রাখতো !—সে ঐ সত্যের আলো নয় কি ? এখানে প্রত্যেক চরিত্রের আর পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করার কোন মূল্য নেই ; মাত্র তাদের গল্পাংশকে ছেড়ে দিয়ে, সত্যনিষ্ঠাটুকু লক্ষ্য ক'রলেই ঠিক্ ঐ এক জিনিষ চোখে পড়েনা কি ? যার উপর নির্ভর ক'রে মদালসার মাতৃত্ব, গার্গীর তত্ত্বজ্ঞান, শৈব্যার আত্মত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বারা তখনকার সভ্যসমাজের বন্ধুর গন্তব্যপথকে বিমল আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে রাখতো ; এই না ? এই না—তোমাদের স্বরূপ ?— আর আজ ?—

তবে হ্যাঁ, একটা কথা !—লড্ডুয়ে ছেলে গ'ড়তে হবে ব'লে তোমাদের

যেমন ডাকা হ'য়েছে, যদি তাতে নারাজ থাক্' তাহ'লে ত' কথাই নেই; তবে যদি সত্যিই কারো খেয়াল চাপে. তাহ'লে আগে থাকতেই সাবধান ক'রে দিচ্চি যে, সবকিছু লড়াই-ই তাদের শেখাতে পার, হাতিয়ার ধ'রে লড়াইটা আর তাদের উপস্থিত শিখিও না; কারণ একে ত' এদেশে প্রচলিত হাতিয়ার আইনে বাধে, দ্বিতীয়তঃ অপাত্রের হাতে অস্ত্র থাক্‌লে, সে অস্ত্র অস্ত্রধারীকেই বিপন্ন ক'রে তোলে, যা আমরা চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্চি!—একটু চেয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে,—যাদের হাতে এযুগে হাতিয়ার র'য়েছে, তা সে ছোটই হোক, আর বড়ই হোক্, তারা সবাই আমাদের সেই মহাকবি, সরস্বতীর বরপুত্র কালীদাসের মাস্‌তুতো ভাই, কালীদাসের ওপর টেক্কা দেবে ব'লে, শুধু বস্‌বার ডালটা না কেটে এরা গোড়াই কেটে ফেল্‌তে চায়;—ফলে এই যে সব ক্ষুদ্রপ্রাণ পাখী-পক্ষীরা বাসা বেঁধে র'য়েছে, তাদের অবস্থার কথাও ত' একটু ভাবা দরকার; তাই বলছিলুম লড়ুয়ে হ'ক ক্ষতি নেই, হাতিয়ারটা আর এখন দিওনা। তারপর আরো একটা কথা, যার শরীর নিয়ে এরা শেয়াল কুকুরের মত ছেঁড়াছিঁড়ি ক'রছে, তারো যে একটা সুখ সোয়াস্তি আছে, তা কেউ বুঝ্‌বে না বা বুঝ্‌তে চায়ও না; ফলে বেশী অসোয়াস্তি হ'লে সেও ত' গা-টাকে একবার রগড়ে নিতে পারে;—ফলে যে "হা—হতোস্মি!" বল্‌বার সময়ও হ'বে না; কারণ এ সুখের চেয়ে যে সোয়াস্তি ভাল, সে তুমিও বোঝ.—আমিও বুঝি, অতএব সেও বোঝে;—তাই ও কথা ব'ল্‌ছিলাম। আর তা নাহ'লে এমন একজন অস্ত্র-চিকিৎসক তৈরী ক'রে দাও, যে ঐ গলিত ক্ষতের চার পাশ কেটে বাদ দিয়ে আসল শরীরটাকে সোয়াস্তি দিতে পারে, সমূলে যাওয়ার চেয়ে, সে বরং ভাল।

কথাটা বলা হয়ত' ভাল হ'ল না, হয়ত' বা দরকারও ছিল না,

কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে অতিগ্রাহিরা আপনা আপনিই পেট ফেটে মরে—তা সে ব্রনই হ'ক আর ফোড়াই হ'ক। তবে দেখে শুনে সন্দেহ হয় যে, হয়ত' বা কর্কট-রোগেই ধ'রেছে—সেই সন্দেহের উপরই বলা,—আর তার সঙ্গে গায়ের জ্বালার সম্পর্ক যে একেবারে নেই তাও শপথ ক'র্ত্তে পার্চ্ছি না ; যাই হোক, কর্ত্তব্য-হিসাবে ওসব কথার কোন মানে হয় না, বরং অবান্তরই হ'য়ে পড়ে ;—যেমন, জল ও আগুন পরস্পর পরস্পরকে যদি বলে যে, ওহে ওমুক, আমি যা কর্‌ছি এই হ'ল কর্ত্তব্য, অতএব তুমিও তাই কর ; তাতে যেমন কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, এও কতকটা তাই দাঁড়ায় ; তা' হ'লেও ব'লতে হ'ল এই জন্যে যে, এই নাকি আধুনিক প্রথা, বোঝ আর না বোঝ "ভোটাধিক্য" একান্ত দরকার, তা' সে গায়ের জোরেই হোক্, আর ঠোঁটের বলেই হোক্।

যাক্, ও অবান্তর কথা ছেড়ে দেওয়াই ভাল, সে তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা বুঝবে, আমরা কেবল কথার ফাঁকে দুটো কথা ব'লে নিলাম মাত্র।

তারপর ঐ যে শিশুশিক্ষার কথা হ'চ্ছিল যে,—"সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা বড় পাপ" বা "এইটে ভাল,—ওইটে মন্দ, এইটে সুখ—ওইটে দুঃখ, কি এইটে লাভ—ওইটা লোকসান,"—এই রকম যত সব প্যাঁচের ব্যাপার, সে সব ক্ষেত্রে তাদের অর্থাৎ শিশুদের শুধু পোষাকী প্যাঁচগুলি না শিখিয়ে,—শরীরটাকে সবল ক'রে তুলতে হ'লে যেসব প্রণালী মেনে চ'লতে হয়, এক্ষেত্রে ও অর্থাৎ মানসিক বল সংগ্রহ ব্যাপারেও সেই সব প্রণালীর অনুসরণ করা দরকার।

যেমন ধর যে, কারো দেখেই হোক্, আর যে জন্যেই হোক্, হঠাৎ

আমার শারীরিক বল সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌লো, কাছে ছিল কুস্তিগীর পালোয়ানদের আখড়া—সেখানে যাওয়া আসা সুরু করা গেল; কিন্তু তাদের ধুলো-কাদা মেখে কসরৎ করা দেখে আভিজাত্য-গৌরবান্বিত মনটা কেমন বিগড়ে গেল, ভাবলুম্ ওসব ইত্‌রোমোপনা না ক'রে প্যাঁচের কায়দা-টায়দাগুলো শিখে নিতে পারলেই কাজ হাসিল হ'য়ে যাবে; ক্রমশঃ রোজ রোজ পালোয়ান্‌দের মাটি লড়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছুদিনের মধ্যে তাদের প্রায় সব প্যাঁচই একরকম মেরে নেওয়া গেল, এমন কি খেলোয়াড়দের কার কি ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'ত তাও চোখ এড়াত না, তখন মনে হ'ল এ আর কি? এত' "মার দিয়া"—ঘরে এসে হাওয়ার সঙ্গে তার মহড়া দিয়ে রাখতুম্,—এই "এম্‌নি ক'রে ধ'রবো আর এম্‌নি করে টান্‌বো, ব্যাস্ একেবারে চিৎ, তখন যদি পাল্টা প্যাঁচ দিতে আসে এম্নি ক'রে কাটিয়ে নেব"। এই ক'রে হাওয়ার সঙ্গে ল'ড়ে প্যাঁচপোঁচ ত' সব শেখা গেল, কিন্তু ঐ ইতরগুলোর মাটি কাদা মেখে যেমন দিনকে দিন স্বাস্থ্যের একটা জোলুস ফুট্‌তে লাগ্‌লো,—আমার শরীরকে এত যত্নে, এত পারিপাট্যে, এত তোয়াজ ক'রেও শরীরের সুঠামত্ব কিছুতেই আর বাগে আনা গেল না; তখন মনে করা গেল যে, মাটির হয় ত' একটা গুণ থাকৃতে পারে, তাতেই হয় ত' ওদের জোলুষ খুলচে, অতএব দিনকতক না হয় মাটি ল'ড়েই দেখা যাক্ কি হয়, আর এখন আর আমার ভয় কি প্যাঁচগুলো ত' আয়ত্ত করাই আছে, তাতে চাইকি পরে ওস্তাদজির পদটাই মেরে নিতে পারা যাবে।

বলে "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"! যাই হোক্ ঐ সব ভেবে চিন্তে একদিন ত' মাটিতে নেমে পড়া গেল,—তারপর!—"ফলেন পরিচীয়তে"—নেমেই সেলামী দিতে গিয়ে যে আক্কেল সেলামী পাওয়া গেল সেই

প্রথম দফায় লাভের পরিমাণ হ'ল হাতের কব্জি ভঙ্গ, মানের দায়ে সেটা গায়ে না মেখে উল্টে প্যাঁচ মারতে গিয়ে লাভ হ'ল—নিজের প্যাঁচে নিজেই—"পপাত ধরণীতলে" ফলে, নাকে, মুখে, চোখে মাটী সেঁদিয়ে নাকেদম অর্থাৎ কুম্ভক অভ্যাস, এই হ'ল দ্বিতীয় দফা। তারপর তৃতীয় দফায় একটু দম না নিতে নিতে, প্রতিপক্ষের নেহাৎ অভদ্রের মত এক বিরাশী সিক্কা ওজনের রদ্দা ঘাড়ের সোঁটায়! ব্যাস্, একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে কিছুদিনের জন্য ঝোল ভাতের ব্যবস্থা। এত দিন আশে পাশে থেকে খুঁটি-নাটি বিচার ক'রে মুখস্থ করা বিদ্যা—এতদিন হাওয়ার সঙ্গে তাল ঠুকে আয়ত্ত করা প্যাঁচের কায়দা—সবই "বিফলে গেল"!! বরং মোটমাট লাভের অংশে দেখা গেল যে, হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' ব'নে গিয়ে অষ্টাবক্রত্ব প্রাপ্তি, আর অতীতের স্মৃতির পরিহাস। এই হ'ল মুখস্থ শক্তি সঞ্চয়ের শেষ পরিণতি।

মনের দিক দিয়েও ঠিক তাই; ঐ সব ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সত্য-মিথ্যা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি প্যাঁচগুলি শিশু মানবদের শুধু মুখস্থ না করিয়ে আর হাওয়ার সঙ্গে কস্‌রত্ ক'রতে না শিখিয়ে বা ভদ্রোচিত শুধু ওপরের প্যাঁচগুলিকে না শিখিয়ে যাতে ওপর নীচু সব রকম প্যাঁচগুলিই—হাতে নাতে ল'ড়ে—মনের ক্রিয়াম্বিত পেশীগুলিকে সবল ও স্বাস্থ্যবান্ ক'রে তুলতে পারে, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার, অর্থাৎ পরবর্ত্তী জীবনে সে যেকোন অবস্থাতেই পড়ুক না কেন সকল প্রকার অবস্থাকেই সে তার ক্রীড়ারই অঙ্গবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয় সেটা খেয়াল রাখতে পারে। মোটের উপর জয়-পরাজয়ে খেলোয়াড়ের সৎসাহস যা'তে না কলঙ্কিত হয় এমনিতর খেলোয়াড় তৈরী করাই হ'চ্ছে প্রথম কর্ত্তব্য। তার পর আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরশীলতাদি

যথাবিহিত শিক্ষাগুলি সম্বন্ধে ত' অনেক কথাই বলা হ'য়েছে, আর সে কথা জানেই না বা কে? অতএব এক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ ক'রে বাহুল্যতার আবশ্যক নেই। তবে সব শিক্ষারই মূলসূত্র যে—কেন্দ্রকে জানা—সেটা ভুলে গেলে চ'লবে না, এইটুকু মনে রাখা কি সত্যিই একটা কঠিন ব্যাপার হবে না কি? তা' ছাড়া আর যে কি উপায় হ'তে পারে সেটা যাদের কাজ তারাই বুঝুক! আমাদের ছুটী এইখানেই। বলে—"বেশী বাড় ভাল নয় ঝড়ে প'ড়ে যাবে"।

এইবার "অর্পণায়মস্তু"র পালা। এ দেশের প্রথা হ'চ্ছে সব কিছু করবার পর শেষ তারা সেই সব কিছু করার ফলটা কৃষ্ণকে ধ'রে দেয়—অন্ততঃ মুখে। দেশাচার হিসাবে আমারও তার ব্যতিক্রম করা উচিৎ নয়; তবে সে যুগের কৃষ্ণকে এ যুগে ডেকে আনার মত শক্তি আমার না থাকার দরুণ, তাঁর যে সব প্রতীক এ যুগে সশরীরে বর্ত্তমান রয়েছেন সেই 'কর্ম্মযোগী'দের হাতে তুলে দিলুম, অবশ্য এও সেই মুখে, কে জানে অন্তর কি বলে!

* * * * *

* * * * *

* * * * *

আর যাদের উৎপীড়নে এর উৎপত্তি তারা কোথায় গো? এইখানেই আমার গল্পটী ফুরুলো,—নাও ধর তোমাদের পৈঁতে, আমি চল্লুম ক্ষেতে—তারপর তখন "রায়ে"র খবরটা শুনিয়ো। আসি তবে,—কেমন?

ইতি—

তারিখ——— তোমাদেরই

১১ই আশ্বিন১৩৪০ শ্রী...... ....

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	৮	যে সম্বন্ধে	সে সম্বন্ধে
”	৯	তার সদরে	তার সদনে
”	১৯	তাবৎ চরাচর · ঔরসজাত,	তাবৎ চরাচর যার ঔরসজাত গ্রহপতি সূর্য্য থেকে পিঁপড়েটী পর্য্যন্ত।
৩৬	৩	কিছু বলা আমার সাজে না	কিছু বলা আমাদের সাজে না।
”	৪	যেগুলি নিছক	সেগুলি কেবল নিছক
৩৭	১২	প্রাকৃত্য, বিদ্যা,	প্রাকৃতবিদ্যা
৩৮	৭	(পরিশোধিত) পরিপুষ্ট মন্দ	পরিপোষিত মন্দ
”	১৩	রীতিনীতির বাঁধন···তারপর	রীতিনীতির বাঁধন, ধর্ম্মের বাঁধন, কর্ম্মের বাঁধন, তারপর
৪৩	২১	ওই জানা	ওই আইনটা জানা
”	২৩	নিয়মে আগুনের	নিয়মে যেমন আগুনের
৪৬	১	লেখ। হ’ল	লেখা হ’ল
৪৭	২১	তার	ধর
৪৯	১	যাওয়াতে পরস্পর	যাওয়াতে বেঙাচির মত পরস্পর
”	১৭	সহকার্য্যের	সাহচর্য্যের
৫০	১২	সহজবোধ্য দেবতারই	সহজবোধ্য পঞ্চদেবতারই
”	২০	স্থলে	হ’লেও

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	৪	পরিকল্পনা, উদাহরণ আরোও	পরিকল্পনা। এমনিতর রকমারি দিক থেকে রকমারি ভাবের কেন্দ্রীয় শক্তির পরিকল্পনার উদাহরণ আরও
৫৩	২	তৃপ্তি	তৃপ্ত
৫৪	৭	সমাজ শরীরের······প্রত্যেক	সমাজ শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই না ভাবতে পারে যে, সে কারও চেয়ে কোন অংশে হেয় বা অনাদৃত। এই কেন্দ্রীয় শক্তির পরি-চর্য্যায় যিনি পূজারী নিযুক্ত হ'লেন তিনি হ'লেন রাজা, আব যে নীতি অনুসরণে সমাজ শরীরের প্রত্যেক
৫৫	১২	বর্ব্বর জাত	বর্ব্বর যুগ
৫৮	৮	আর হাওয়ায়	আবহাওয়ায়
৬২	৭	কতকটা	কথাটা
৬৪	৩	পায়, পায়	পায়
৬৭	১৯	তার একটা	আর একটা
৬৮	২	শরীরে অস্তিত্বও	শরীরে আমাদের অস্তিত্বও
৭০	৩	তবে সঠিক	তবে কেন্দ্রে সঠিক
৭২	৩	নিরালম্বে	নিরাবলম্বে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	১৪	সুধু	সাধু
৭৬	২১	হয় না	হওয়া
৭৮	৬	অবসর গ্রহণে আবার	অবসর গ্রহণের আশায়
৭৯	২০	দুটার	ওটার
৮৩	১৬	মানবের···মানবের অভীষ্টকে	মানবের দুর্দ্দমনীয় অভিযানের ফলস্বরূপ। প্রবল আঘাতে প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারের আগল ভেঙ্গে—মানবের অভীষ্টকে
৮৭	৮	অবস্থিত আর	অবস্থিত, "শিবত্ব" বা "জীবত্ব"ও তেমনি মনকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিত ; আর
১০৮	৯	দৃশ্যাভিনয়ের বেশী যে	দৃশ্যাভিনয়ের সঙ্গে জগৎ দৃশ্যাভিনয়ের বেশী যে